সাইয়েদ কুতুব শহীদ

ইসলামী আন্দোলন

সংকট ও সম্ভাবনা

সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

ইসলামী আন্দোলন

সংকট ও সম্ভাবনা

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

ইসলামী আন্দোলন ঃ সংকট ও সম্ভাবনা

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রেজায়ী

ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ওয়ান আর ৮ কিউ ডি

ফোন ও ফ্যাক্স: ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪, ০২০ ৭২৭৪ ৭৪১৮ মোবাইল ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার

বাড়ি ১৬ রোড ৭ বারিধারা কূটনীতিক এলাকা, ঢাকা-১২১২

বিক্রয় কেন্দ্র: ৩৬২ ওয়্যারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (দোতলা), দোকান নং ২২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৯ ৩৬১৪, ৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল ০১৭১ ১১৬৯৫৮

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী ২০০৫ মাঘ ১৪১০ যিলহজ্জ ১৪২৫

স্বত্বঃ প্রকাশক

বিনিময়

একশত দশ টাকা মাত্র

❑❑

Islami Andolon : Songkot O Shombhabna

Syed Qutb Shaheed

Editor

Hafiz Munir Uddin Ahmed

Published by

Khadija Akhter Rezayee

Director Al Quran Academy London

Suite 501 International House 223 Regent Street, London W1R 8QD

Tel & Fax: 0044 020 7274 9164, 020 7274 7418 Mobile 07956 466 955

Bangladesh Centre

House 16 Road 7 Baridhara Diplomatic Zone, Dhaka 1212 Ph. 989 3614

Sales Centre: 362 Wireless Railgate, (Masjid Complex Ist Floor) Ph. 933 9615

38/3 Computer Market (Ist Floor) Stall No- 226 Bangla Bazar, Dhaka.

1st Edition

January 2005 Zilhajj 1425

Price Tk. 110 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.com website: www.alquranacademylondon.com

ISBN-984-8490-37-0

কিছু আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন বর্তমান বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের আসল সমস্যাটা কি? তাহলে আপনি কিন্তু সবার কাছ থেকে এই প্রশ্নের প্রায় একই ধরনের জবাব পাবেন। যাদের জিজ্ঞেস করবেন তারা যেখানেই থাকুন না কেন, প্রচলিত আন্দোলনসমূহের যেটির সাথেই তারা সম্পৃক্ত থাকুন না কেন, তাদের জবাবে খুব বেশী একটা গরমিল হবে না। তাদের একদল লোক তাদের আন্দোলনের বিপুল সম্ভাবনার কথা আপনাকে ঘটা করে শুনাবেন। শুনাবেন সারা দেশে তাদের জনবলের কথা। দেশের আপার চেম্বার, লোয়ার চেম্বার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকারখানাসমূহের সমিতি ও ইউনিয়নে তাদের কয়জন সদস্য রয়েছে, মাঠ পর্যায়ে কতোগুলো পরিষদ, কাউন্সিল ও পৌরসভা তাদের দখলে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার তারই পাশাপাশি আরেকটি দল রয়েছে, তাদের সাথে কথা বললে তারা আপনাকে তাদের আন্দোলনের শুধু সংকটের কথাই বলবেন– তাদের অর্জিত কিছু কিছু সফলতাকে কিভাবে পাশ্চাত্যের দানব ও তাদের দেশী তস্করবা ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে তার করুণ কাহিনী তারা আপনাকে বলবেন। আন্দোলনের এই শ্রেণীর লোকেরা কিন্তু বিগত অর্ধশতক ধরে পাশ্চাত্যের শেখানো বিভিন্ন তন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলো। এই স্বপ্নস্বাধ তাদের সেদিনই ভেংগে তছনছ হয়ে গেছে যেদিন তারা টের পেলো যে, যে তন্ত্রের ওপর ভর করে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো, নির্মমভাবে তাই তাদের পিঠে ছুরিকাঘাত বসিয়েছে। যাকে তারা বন্ধু ভেবেছিলো তা ছিলো পাশ্চাত্যেরই দুগ্ধপোষা এক বিষধর সাপ। সম্বিত ফিরে পাবার পর তারা টের পেলো এই তন্ত্রেরই বিষাক্ত ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে দশ লক্ষ আলজেরীয় মুসলমান ও লক্ষাধিক তুর্কী মুসলমানদের গণতন্ত্রের ওপর ভর করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নস্বাধ।

আমি জানি, এ পর্যন্ত পড়েই আপনি জানতে চাইবেন, বর্তমান বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের তাহলে মূল সমস্যাটা কি? সমস্যাটা যে আসলে কোথায় এটা আজ সবারই প্রশ্ন। অনেকেই বলেন, ইসলামী আন্দোলনের পথে বড়ো বাধা হচ্ছে পাশ্চাত্যের দস্যু সভ্যতা– যা মানুষদের মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তর থেকে এনে পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। কেউ বলেন, ইসলামী আন্দোলনের বড়ো সংকট হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি। কেউ আবার বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অভাবই হচ্ছে আসলে ইসলামী আন্দোলনের বড়ো সমস্যা। আমি জানি না আপনি আমার সাথে একমত হবেন কি না– আমি যদি বলি, এর কোনোটাই চলমান বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের সমস্যা কিংবা সংকট নয়। আজ ইসলামী আন্দোলনের সবচাইতে বড়ো সংকট হচ্ছে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের পরিচালকদের লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্মম ব্যর্থতা ও তা বাস্তবায়নে তাদের পশ্চাতমুখী মানসিকতা।

এর সাথে আবার রয়েছে আমাদের বিগত শতকটিতে জন্ম নেয়া বিশাল নৈতিক সমস্যা, যার দূষিত প্রভাবে আমরা ভেতরে বাইরে অল্প বিস্তর সবাই প্রভাবিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর্থ সামাজিক পরিবেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসিক গোলামীর পটভূমিতে আরব আজমে যে কয়টি ইসলামী আন্দোলন জন্ম নিয়েছে, তার প্রতিটি আন্দোলনকে পর্যালোচনা করলে সম্ভবত এ সত্যটিই আমাদের সামনে প্রমাণিত হবে যে, উপরে বর্ণিত কোনোটাই আসলে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা কিংবা সংকট নয়। আজ ইসলামী আন্দোলনের সংকট খুঁজে বের করা ও তা থেকে উত্তরণের পন্থা খুঁজতে হলে আমাদের কিছুক্ষণের জন্যে দলীয় আনুগত্য ও তথাকথিত বিজয়গাথার উপরে উঠে চিন্তা করতে হবে।

বিগত শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতার লেবরেটরিতে যে তন্ত্রমন্ত্রগুলো জন্ম নিয়েছে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের নেতারা সত্যিকার অর্থে তাদের প্রিয় সংগঠনকে তার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। আমাদের কালের রেনেসাঁ আন্দোলনের একজন শীর্ষ নেতা আল্লামা ইকবাল বর্তমান সময়ের যে তিনটি মতবাদকে মানবতার জন্যে বিষের চেয়েও বেশী ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করেছেন, সে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধন বিলাসী অবাধ পুঁজিবাদ, তার রাজনৈতিক লেবাস ধর্মহীন গণতন্ত্র ও সম্প্রতি মৃত ঘোষিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র তথা সাম্যবাদের প্রভাববলয় থেকে যাবতীয় নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও এর কোনো একটি ইসলামী আন্দোলনকেও তারা সর্বতোভাবে মুক্ত রাখতে পারেননি। কোথাও তা আমাদের রাজনীতিকে গণতন্ত্রের অভিশাপ দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে, আবার কোথাও তা আমাদের অর্থনৈতিক দর্শনকে পাশ্চাত্যের জড়বাদিতার অক্টোপাসে আবদ্ধ করেছে।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ গোটা দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ কর্মীর সামনে নিজের খুনের নযরানা দিয়ে এ কথাটাই পেশ করেছেন যে, সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে ইসলামী আন্দোলনকে সর্বাগ্রে কোরআনের নির্ভেজাল রং দিয়ে সাজাতে হবে। আর আন্দোলনকে কোরআনের রং দিতে হলে সবার আগে কোরআন থেকে রসূলের আন্দোলনকে খুঁজে বের করতে হবে। কোরআনের ছত্রে ছত্রে শহীদ কুতুব এ মুক্তোগুলোই আমাদের জন্যে জমা করেছেন। এ মুক্তোর মাঝে রয়েছে ইসলামী আন্দোলনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, এ আন্দোলনের শক্তির আসল উৎস, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পাবার পূর্বশর্তসহ বাতেলের সাথে আন্দোলনের অগ্রসেনানীদের যাবতীয় আপস ফর্মূলা পরিহার করার কঠোর তাগিদ। আরো রয়েছে নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, সমস্যা সংকটে নেতৃত্বের অসাধারণ মেধা প্রদর্শন, লোভ লালসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় কঠোর ধৈর্যের আহবান সম্বলিত বহু মূল্যবান কথা। সর্বশেষে রয়েছে বিশ্বের প্রচলিত আন্দোলনসমূহের সাথে ইসলামী আন্দোলনের পার্থক্যের মানদন্ড এবং সে মানদন্ডের আলোকে ইসলামী আন্দোলনের সংকট উত্তরণের দিকনির্দেশনা। সাইয়েদ কুতুব শহীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের ফুল বাগিচায় আসন সাজিয়ে দিন। আর আমাদের তার মূল্যবান লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের আন্দোলনকে জঞ্জালমুক্ত করার শক্তি সাহস দিন, এই কামনা করেই পাঠকদের তার বক্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়ার আহবান জানাবো।

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

- মুসলিম জাতির দায়িত্ব কর্তব্য ৭
- মানবজাতির পরিচালনা ও মুসলিম জাতির দায়িত্ব ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

- জয় পরাজয়ের সত্যিকার মাপকাঠি ১৪
- বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ও তার কিছু শর্ত ১৯
- মোমেনদের সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ২৩
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার ওয়াদা ও তার শর্ত ২৬

তৃতীয় অধ্যায়

- ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান দুর্দশা ও তার কারণ ৩২
- মুসলিম জাতির অস্তিত্বের জন্যে ঐক্যবদ্ধতার গুরুত্ব ৩৩
- দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী ৩৮
- সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামকে সাজানো ৪১
- প্রচলিত রাজনীতির সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তফাৎ ৪৮
- জাহেলী সমাজে মিশে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া ৫৯
- আন্দোলন কৌশলের নামে সুন্নাত পরিহার করা ৬১

চতুর্থ অধ্যায়

- দ্বীনের দায়ীদের দায়িত্ব, সীমাবদ্ধতা ও জবাবদিহিতা ৬৪
- দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও অপরিহার্য বাধা ৬৭
- ইতিহাসের বিচারে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘাত ৭০
- বাধা বিপত্তি ও ইসলামী আন্দোলনের গতিশীলতা ৭৮

পঞ্চম অধ্যায়

- দাওয়াতের কাজে আপসের নীতি ৮২
- আপসের প্রস্তাবে আল্লাহর রসূলের জবাব ৮৩
- বাতিলের সাথে আপস ৮৭
- আপসহীনতা ও ইসলামী আন্দোলন ৮৮
- বাতিলের সাথে আপসের পরিণতি ৯৩
- ইসলামী আন্দোলনে আপসকামিতা ৯৮

❑ হক ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে চেনা ১০০
❑ ইসলামবিদ্বেষীদের সাথে একই বৈঠকে বসা ১০৪
❑ জাহেলী নেতৃত্বের সাথে সর্বাত্মক অসহযোগিতা করা ১১২
❑ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদাহরণ ১১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

❑ ইসলামী আন্দোলন কর্মীদের ধৈর্যের নির্দেশ ১২৪
❑ সবরে জামিল ১২৭
❑ দাওয়াতের কাজে মার্জিত ভাষার গুরুত্ব ১২৯
❑ দাওয়াতের কাজে উত্তেজিত হওয়া ১৩০
❑ দাওয়াতের উত্তম কৌশল ১৩৩
❑ ইসলামে প্রতিশোধ গ্রহণের মূলনীতি ১৩৭
❑ দ্বীনের দায়ীদের দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা ১৪৩
❑ আল্লাহর পথে আহবানের মর্যাদা ও পদ্ধতি ১৪৫
❑ হযরত ইউনুস (আ.)–এর শিক্ষণীয় ঘটনা ১৫০
❑ আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে হযরত লোকমানের উপদেশ ১৫৩

সপ্তম অধ্যায়

❑ দূরদর্শী নেতৃত্বের সুফল ১৫৭
❑ পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব ১৬৪
❑ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী ১৬৮
❑ আল্লাহর নির্বাচিত দলটির বৈশিষ্ট্য ১৭১
❑ মানবজাতির নেতা হিসেবে মোমেনদের কিছু বৈশিষ্ট্য ১৭৫
❑ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চারিত্রিক গুণাবলী ১৮২
❑ দাওয়াতের দায়িত্ব ও দায়ীর গুণ ১৮৭

অষ্টম অধ্যায়

❑ ইসলামী সংগঠনে কর্মীদের প্রস্তুতি ১৯১
❑ ইসলামী আন্দোলনের সাথে কোরআনের সম্পর্ক ১৯২
❑ দ্বীনের দায়ীদের প্রতি কোরআনের কিছু নির্দেশনা ১৯৬
❑ ইসলামের দুঃসময়ের ঈমান ও ত্যাগের মর্যাদা ১৯৯
❑ কঠোর সংগ্রামের প্রস্তুতি ২০১
❑ মানুষের সঠিক মূল্যায়ন ২০৪
২১০

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম জাতির দায়িত্ব কর্তব্য

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকবে, যারা (মানুষকে সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে এবং (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে (অতপর যারা এই দলে শামিল হবে) সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্যমন্ডিত হবে।' (আলে ইমরান, ১০৪)

আলোচ্য আয়াতে যেভাবে কথাটি বলা হয়েছে তা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। সবকিছুরই অস্তিত্বের একটা মুল উদ্দেশ্য থাকে। আনুষংগিক কিছু কাজ মাঝে মাঝে তা দিয়ে নেয়া হলেও মূল উদ্দেশ্য সব সময়ই মুখ্য থাকে। কেননা মূল উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে গেলে সেই বস্তুটির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার আর কোনো মূল্য থাকে না। যেমন কলমের উদ্দেশ্য লেখা, ঘড়ির উদ্দেশ্য সময় দেয়া, কিন্তু কলম যদি লিখতে না পারে, ঘড়ি যদি সময় দিতে সক্ষম না হয় তাহলে বুঝতে হবে, এগুলো সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে। তেমনিভাবে মুসলিম জাতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হলো মানব জাতিকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটাই হলো মুসলিম জাতির আবির্ভাব বা অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য।

অতএব মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে, মানুষের জন্যে কল্যাণকর বলে জানা সকল প্রকার ভালো কাজের তারা নির্দেশ দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অপ্রিয় কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে, বিরত রাখবে। তবে এ কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সৎকাজের 'আদেশ' ও অসৎ কাজ থেকে 'নিষেধ' করার জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য। কারণ ক্ষমতা না থাকলে ভালো কাজ করার জন্যে মানুষকে আহ্বান হয় তো জানানো যায়, কিন্তু নির্দেশ দেয়া যায় না। ভালো কাজের আদেশ দিতে বা মন্দ কাজ বন্ধ করার জন্যে হুকুম করতে গেলে হাতে অবশ্যই ক্ষমতা থাকা চাই, নচেত সে নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কেউ মানবে না, আর এসব কাজের জন্যে ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকে জরুরী মনে করাটা কোরআনের আয়াত থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আলোচ্য এ আয়াতটিতে ভালো বা কল্যাণকর কাজের জন্যে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে সেখানে একইভাবে 'মারূফ'– ভালো কাজসমূহ করার নির্দেশ বা হুকুম দিতে বলা হয়েছে এবং

মন্দ বা অকল্যাণকর কাজগুলো করার ব্যাপারে নিষেধ করতে বলা হয়েছে। যদিও ভালো কাজের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে ক্ষমতার অধিকারী না হলেও চলে, কিন্তু নির্দেশ বা নিষেধ করার কাজ ক্ষমতা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইসলামী চিন্তা-চেতনার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি বা দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহর এ হুকুম পালন করার জন্যেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। কেননা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিই কেবল নির্দেশ দিতে বা নিষেধ করতে পারে। অতএব, এমন একটি শাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন, যারা পৃথিবীতে ভালো কাজের হুকুম দেবে ও মন্দ কাজ বন্ধ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করবে। এ ধরনের কর্তৃপক্ষ মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে থাকবে এবং মন্দ কাজ বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ দায়িত্ব যে পালন করবে সে-ই আসলে সঠিক অর্থে একতা গড়ে তুলতে পারবে। সেই আল্লাহর সাহায্য পাবে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষমতাও পাবে।

যে ক্ষমতাবানরা এ দু'টি কেন্দ্রীয় উদ্দেশে কাজ করবে, তারা মানুষের জীবনে আল্লাহর ব্যবস্থা চালু করতে সফল হবে। তবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বুঝিয়ে শুনিয়ে বিবেকসম্মতভাবে কল্যাণের পথে মানুষকে আহ্বান জানানো। যাতে মানুষ এ সত্য সুন্দর ব্যবস্থার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। এরপর প্রয়োজন শাসন-ক্ষমতা, যার মাধ্যমে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া সম্ভব হবে। তখন কল্যাণকর কাজের প্রসার হবে, মন্দ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা যাবে এবং এ সময় মানুষের পক্ষে সে নির্দেশ পালন করাও সহজ হবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'আমি যে কোনো রসূল পাঠিয়েছি, তাকে এই অধিকার দিয়ে দিয়েছি যেন আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই তার আনুগত্য করা হয়।' সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা মানে যুগযুগান্তর ধরে নিছক ওয়ায-নসীহত, আলাপ-আলোচনা বা বিবৃতি দেয়া নয়। সমগ্র কাজের এটা একটা অংশমাত্র এবং এই দাওয়াতী প্রক্রিয়ায় এ আন্দোলনের সূচনা হয়। এর অপর প্রধান অংশ হচ্ছে ক্ষমতাবলে এ ব্যবস্থার আদেশ ও নিষেধগুলো চালু করা, যাতে করে সমাজে 'ভালো' কাজসমূহ বাস্তবায়িত হয় এবং 'মন্দ' ও অপ্রিয় কাজগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কল্যাণকামী এই দলকে স্বার্থপরতা ও দুশ্চরিত্রতার কবল থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এ দলকে কল্যাণকর কাজে সহায়তা দিতে হবে।

ভালোর দিকে ডাকা, কল্যাণকর কাজের নির্দেশদান এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা আসলে মোটেই তুচ্ছ বা খুব সহজ কাজ নয়। মানুষের প্রকৃতির দিকে যখন আমরা তাকাই তাদের মধ্যে অবস্থিত সহজাত কু-প্রবৃত্তি ও প্রত্যেক মানুষের নিজ ইচ্ছা কার্যকর করার প্রবণতার দিকে যখন তাকাই তখন আমরা দেখি, মানুষের মধ্যে যখন নিজ নিজ সুবিধা ভোগের বিষয়গুলো নিশ্চিত করার এক অন্ধ আবেগ রয়েছে, যখন কারো কারো মধ্যে অহংকার দেখা যায়, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার নেশা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করি 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' এবং এবং 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার'– আল্লাহর দিকে ডাকা, ভালো কাজের আদেশ ও

মন্দ কাজে নিষেধ করা কতো কঠিন কাজ। সমাজে বরাবরই যুলুমবাজ এমন কিছু লোক থাকে যারা জোর করে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। রয়েছে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা, আবার রয়েছে এমন কিছু হীনমন্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা অন্যায়ভাবে মর্যাদাবান হতে আকাংখী। রয়েছে অতি নরমপন্থী কিছু লোক, যারা কোনো ব্যাপারেই শক্ত হতে পারে না, কোনো রকম দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারে না। আবার কিছু দুর্বল লোকও আছে, যারা সুবিচার পায় না। আছে সত্য পরিহারকারী আরো কিছু মানুষ, যারা মযবুত ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে না। এমনিভাবে এমন বহু লোকও আছে যারা কল্যাণকর ও 'ভালো কাজের' প্রসার বরদাশত করতে পারে না; বরং অপ্রিয় ও মানবতাবিরোধী কাজে বেশ খুশী হয়। তারা চায় না গোটা জনপদের সবাই সুখে-শান্তিতে থাকুক এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ হোক। এমতাবস্থায় নেক চরিত্রের লোকের হাতে নেতৃত্ব দান করাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এবং সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। তাহলে কল্যাণকর ব্যবস্থা ভালো বলে মানুষ তা বুঝার সুযোগ পাবে এবং মন্দকে মন্দ বলে তারা পরিহার করতে পারবে। কল্যাণকর ক্ষমতার দাবী এটিই এবং ভালো লোকের হাতে ক্ষমতা দান করার মাধ্যমে এ সব 'মারূফ'– ভালো কাজসমূহের নির্দেশ দেয়া যায় এবং মন্দ ও অকল্যাণকর কাজগুলো থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। বস্তুত মানুষের শুধু এমন নেতৃত্বেরই আনুগত্য করা উচিত।

'ভালো কাজ চালু করা ও মন্দ কাজ বন্ধ করা' সমাজের এ দু'টি মৌলিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যে সৎ চিন্তাশীল ও একমনা একটি দল প্রয়োজন, যাদের মধ্যে তিনটি মুখ্য গুণ থাকবে। তা হলো, আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, তাঁর রসূলের আদর্শের আপোসহীন অনুসরণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ। তাহলেই এই ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি এবং এর সাথে মহব্বত ও দরদ-সহানুভূতির অমিয় ধারা একত্রিত হয়ে হতাশায় জর্জরিত এই সমাজের বুকে আবার অনাবিল শান্তি স্থাপিত হবে, যার জন্যে উম্মতে মুসলিমার আবির্ভাব হয়েছিলো। এ দায়িত্বই মুসলমানদের দেয়া হয়েছে এবং এ দায়িত্ব পালনকেই তাদের সাফল্যলাভের চাবিকাঠি বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই, যারা এ কাজ শুরু করবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেন–

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'তারাই হচ্ছে সাফল্যমন্ডিত।' (আলে ইমরান, ১০৪)

আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য দাবীই হচ্ছে এমনি একটা দল প্রতিষ্ঠা করা। এই দল হচ্ছে সমাজদেহের সেই কেন্দ্রবিন্দু, যার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত এই সুমহান ব্যবস্থা বিরাজ করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এ দল হচ্ছে মানবদেহের হৃৎপিন্ড, যার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং বাস্তব জীবনে তা কিছু ভূমিকা রাখতে পারে। এ দলই কল্যাণের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু এবং

কল্যাণের দিকে দাওয়াতদানের একমাত্র সহায়ক শক্তি। এ মহান দলের মাধ্যমেই সমাজদেহে কল্যাণ প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য সঠিক ব্যবহার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। এ দলটি অন্যায় ও অকল্যাণকর কাজ, কদর্যতা, মিথ্যা ও যুলুম পরিহার করবে। এ দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের মধ্যে মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা ও অনীহা থাকবে এবং ভালো কাজ করার প্রবণতা থাকবে। এখানে কদর্য ব্যবহারের তুলনায় মর্যাদাপ্রাপ্তি হবে সহজলভ্য, মিথ্যা থেকে সত্য কথা বলা নিরাপদ হবে এবং অবিচার নির্মূল হবে, সুবিচার এখানে স্বাভাবিক চিত্র হবে। ন্যায়বান ব্যক্তি এখানে সবদিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করবে এবং মন্দ ব্যক্তিটি বিরোধিতা ও হীনতার সম্মুখীন হবে। এসবই হবে এ দলের বৈশিষ্ট্য। এ হবে এমন একটি পবিত্র ও মধুর পরিবেশ, যার মধ্যে কল্যাণকামিতা প্রসার লাভ করবে এবং অনায়াসে সেখানে সত্যনির্ভর পরিবেশ গড়ে উঠবে। কারণ, এ দলের প্রতিটি ব্যক্তি ভালো কাজের প্রবক্তাকে সবদিক থেকে সহায়তা করতে থাকবে। অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা যুলুম এখানে মোটেই স্থান পাবে না, যেহেতু অন্যায়কারীর প্রতিটি পদক্ষেপ এখানকার নিয়ম-শৃংখলা কঠোরভাবে রুখে দাঁড়াবে।

জীবন ও জগত সম্পর্কে, মানুষের মর্যাদা ও তার কার্যাবলী সম্পর্কে, জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি জাহেলী বা অনৈসলামী জীবনবোধ থেকে মৌলিকভাবেই সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং ইসলামের অনুসারী ও প্রবক্তাদের কর্তব্য হচ্ছে এ বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করা ও অমুসলিমদের সামনে এগুলোর বিশেষ মর্যাদা তুলে ধরা।

ঈমান ও ভ্রাতৃত্বরূপী এ দু'টি কেন্দ্রবিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠী গোটা মানবসমাজে মধ্যমণির মতো অবস্থান করবে। সেখানে আল্লাহর ওপর ঈমানের প্রতিফলন এমনভাবে ঘটবে যে, জগতজোড়া মানুষের জন্যে তারা অনুকরণীয় আদর্শ হবে। তাদের গোটা জীবন, জীবনের মূল্যবোধ, তাদের কাজ, তাদের জীবনের ঘটনাবলী, তাদের ব্যক্তিত্ব ও বিষয়াদি সবকিছুই অন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তারা হবে সবার জন্যে এমন এক আদর্শ যে, মানুষ নিজেদের অজান্তেই এ জনগোষ্ঠীকে অনুসরণ করতে শুরু করবে।

যে নযীর তারা এ পর্যায়ে স্থাপন করবে এবং সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের যে মানদন্ড তারা এখানে দাঁড় করবে, জীবনের সবকিছু যাচাই করার জন্যে মানুষ সেই মানদন্ডের দিকেই তাকাবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একমাত্র আইন-কানুনের দিকেই তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে। যে কোনো বিষয়ের ফয়সালা নেয়ার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে এদের কাছেই ছুটে আসবে। তখন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা অনুসারে গড়ে ওঠা এই নেতৃত্বের দিকে তাদের মন ঝুঁকে পড়বে। তারা অনুভব করবে, মানুষের মধ্যে শান্তি ও মহব্বত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে গড়ে ওঠা এই ভ্রাতৃত্ববোধের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থা হলেও মানবতাবোধ বর্তমান আছে।

সময়-সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশে তা অকস্মাৎ জেগে ওঠে। মানবতা ও মানুষের জন্যে দরদ-অনুভূতি– এটা হচ্ছে মানুষের সহজাত বৃত্তি। এর বিকাশ ঘটানোর জন্যে শুধু পরিবেশ সৃষ্টি করাই মুসলমানদের কাজ। ইসলামের সম্মোহনী আদর্শ দ্বারা অশান্ত মানবতার মধ্যে স্বস্তি ও প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে পারলেই মানুষ পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে এ মহান আদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করবে।

ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের এ মহান আদর্শের ছোঁয়াচে জীবন গড়ার লক্ষ্যেই মদীনার বুকে প্রথম মুসলিম জামায়াত কায়েম হয়েছিলো। সে সময়ে তাদের ঈমান ছিলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং ছবির মতো নবীর গুণাবলী মোমেনদের অন্তরে ভাসতো। আল্লাহর ভয় এবং তাঁর তদারকীর অনুভূতি তাদের অন্তরে সর্বদা জাগ্রত ছিলো। কদাচিত একটু গাফেল হয়ে পড়লেও পারস্পরিক সদুপদেশ আদানপ্রদানের মাধ্যমে তা আবার জেগে উঠতো। মুসলমানরা সদা-সর্বদা নিজেদের মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সজাগ ছিলো। তাদের পারস্পরিক মহব্বত ছিলো পরিচ্ছন্ন এবং সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত, তাদের সুমধুর আন্তরিকতা ছিলো বড়ই সুন্দর, তারা গভীর দরদ দিয়ে পরস্পর কুশল বিনিময় করতো এবং কারো কোনো অসুবিধা হলে একান্ত আন্তরিকতা দিয়ে তা দূর করার জন্যে এগিয়ে যেতো। সে সময়কার সে জামায়াতটি সত্যিই সবদিক দিয়ে আদর্শ জামায়াতে পরিণত হয়েছিলো। তৎকালীন মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে বিদ্যমান ভালোবাসার সম্পর্ক পৃথিবী জুড়ে আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে বরং আজকে তাদের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করলে মনে হয়, সে যেন সত্যিই এক স্বপ্নে পাওয়া ছবি, কিন্তু এ ইতিহাস নিছক কোনো স্বপ্নপুরীর কাহিনী নয়; বরং পৃথিবীর বুকে সত্য সত্যই একদিন এ ঘটনা ঘটেছে। সে সোনালী ইতিহাস পৃথিবীর মানুষদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন জাগরূক হয়ে থাকবে।

আর এমনি করেই সে ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সকল যমানায় আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থাকে মযবুতী দান করতে থাকবে।

মানবজাতির পরিচালনা ও মুসলিম জাতির দায়িত্ব

কোরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতে উম্মতে মুসলিমা যেন নিজেদের মান-মর্যাদা ও মানবমন্ডলীর মধ্যে তাদের সঠিক অবস্থান নিরূপণ করতে পারে, সে জন্যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আহলে কেতাবদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে তাদের যে পতন হবে– উম্মতে মুসলিমাকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মুসলমানদের মান-মর্যাদা এবং কর্তব্যই বা কি সে বিষয়েও তাদের আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন। ঈমানের দাবী পূরণের লক্ষ্যে তাদের কি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হবে তা জানানোর পর তার থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্যে তাদের মধ্যে তীব্র আগ্রহ আকাংখা সৃষ্টি করছেন, দুশমনের দুশমনি থেকে তিনি মুসলমানদের হেফাযত করেছেন। সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ কিছুই মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা কখনও তাদের কোনো সাহায্য

করবেন না। ওদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে পরকালে জাহান্নামের আযাব। সেখানে ঈমান ও তাকওয়া ব্যতীত দুনিয়ার জীবনে ব্যয় করা বিভিন্ন দান-খয়রাত কোনো কাজেই লাগবে না। এরশাদ হচ্ছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

'তোমরাই (হচ্ছো দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে; আমি (তোমাদের আগে) যাদের কাছে কেতাব পাঠিয়েছি, তারা যদি (সত্যি সত্যিই) ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে কতোই না ভালো হতো! তাদের মধ্যে কিছু কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, তবে এদের অধিকাংশ হচ্ছে খারাপ প্রকৃতির লোক।' (আলে ইমরান, ১১০)

আয়াতের এই পুরো অংশটির মধ্যে প্রথম অংশে যে আলোচনা এসেছে তার দ্বারা গোটা মুসলিম উম্মাহর কাঁধে একটি ভারী বোঝা তুলে দেয়া হয়েছে, যা তাদের মান-মর্যাদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল এবং এ বিষয়টি মানবমন্ডলীর মধ্যে তাদের উচ্চতর অবস্থানও নিরূপণ করে। এ বিশেষ মর্যাদার একক অধিকারী একমাত্র তারাই, এ মর্যাদা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে দেয়া হয়নি। আলোচনারধারার দিকে আবার একবার নযর দিন।

বাক্যের মধ্যে 'উখরেজাত' শব্দটিতে কর্তার উল্লেখ নেই, অর্থাৎ কর্মবাচক পদে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে আয়াতটি গভীরভাবে চিন্তা করার দাবী রাখে এবং এতে বুঝা যাচ্ছে, এ মুসলিম উম্মতকে আদর্শবাদী এবং আদর্শের পতাকাবাহী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে এক অদৃশ্য হাত নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এ উম্মতকে গোটা মানবমন্ডলীর পথ-প্রদর্শক বানানো হয়েছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশে এদের বাছাই করে নেয়া হয়েছে। রহস্যাবৃত গায়ব থেকেই এদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অজানা সে রহস্যের পেছনে রয়েছে সেই চিরস্থায়ী সত্তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যিনি অন্তরীক্ষ থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন ও পরিচালনা করছেন এবং তিনি ছাড়া বিশ্ব রহস্য সম্পর্কে আর কেউ কিছুই জানে না। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে জানা যায়, এক গোপন শক্তি সব কিছুর পেছনে অতি সূক্ষ্মভাবে এবং সংগোপনে সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছে। ক্রিয়াশীল সেই মহাশক্তি এই মহান জাতিকে পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে হাযির করেছেন, যারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি যুগের সূচনা করেছে, যারা বিশ্বসভায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরাই (হচ্ছো দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।' (আলে ইমরান, ১১০)

এ কারণে মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বের দরবারে তার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সংরক্ষণ করতে হবে এবং সেই মর্যাদার আসনে সমাসীন হওয়ার জন্যে তার সম্মানজনক অবস্থানকে বুঝতে হবে, তার নিজের পরিচয় এবং সঠিক মূল্যও জানতে হবে। তাকে আরও জানতে হবে, তাকে মানবতার অগ্রদূত বানানো হয়েছে এবং তাকে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব দান করা হয়েছে, সার্বিক বিবেচনায় তারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই চান, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ভালো লোকের হাতে থাক এবং মন্দ লোকের হাতে তা কখনই না যাক। নেতৃত্ব কর্তৃত্ব একমাত্র ভালো লোকের হাতে গেলেই ভালো কাজ হওয়ার আশা করা যায়, তাই তিনি তাদের বাদ দিয়ে জাহেলী আদর্শের ধ্বজাধারী কোনো গোষ্ঠীর হাতে নেতৃত্ব দান করা পছন্দ করেননি। এ কারণেও এটা প্রয়োজন যে, যে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মুসলিম উম্মাহর হাতে এসেছে, তা চিরদিন তাদের হাতেই থাকতে হবে, এ আমানত চিরদিন এ সব ঈমানদার ও বিশ্বস্ত লোকের হাতে থাকবে, যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা সঠিক খাতে প্রবাহিত হয়, যাদের মধ্যে সঠিক সংগঠন, সঠিক চরিত্র, সঠিক জ্ঞান, সঠিক বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা বিদ্যমান রয়েছে। এ সব গুণাবলী তার অবস্থান চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করতে পারে এবং তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যও সফল করে তুলতে পারে। এ সকল গুণাবলীই তার অগ্রযাত্রা স্থায়ী ও সুনিশ্চিত করতে পারে এবং নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে তাকে সমাসীন করে দিতে পারে। আসলে নেতৃত্বের এই আমানত নিজস্ব গুণের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই পাওয়ার জিনিস– এটা দাবী করে পাওয়ার বস্তু নয় এবং প্রকৃত যোগ্যতা ছাড়া কাউকে এমনি এমনিই এ দায়িত্ব দেয়া হয় না। আন্তরিক বিশ্বাস ও সমাজ সংগঠনের গুণ হচ্ছে এর প্রধান যোগ্যতা। তবে খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং দেশ পরিচালনার জন্যে জ্ঞানগত যোগ্যতাও সমধিক জরুরী। অতএব, একথা স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো, এ উম্মতকে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার যে গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করতে গেলে বহু জিনিসের প্রয়োজন, প্রয়োজন উপরোল্লিখিত গুণের অধিকারী হওয়া। এসব গুণ অর্জন করতে পারলে এবং সেগুলোর দাবী পূরণ করতে পারলে অতীতের মতো আজও উম্মতে মুসলিমার হাতে নেতৃত্বের আমানত এসে যাওয়া সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় পরাজয়ের আসল মাপকাঠি

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ - يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ - وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ - هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ - فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ

'নিশ্চয়ই আমি আমার নবীদের ও (তাদের ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের এ দুনিয়ার জীবনে (যেমন) সাহায্য করি, (তেমনি সেদিনও সাহায্য করবো) যেদিন (তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে) সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে যাবে। যেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি কোনোই উপকারে আসবে না, (সেদিন) তাদের জন্যে (শুধু থাকবে) অভিশাপ, তাদের জন্যে আরো থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস। আমি মূসাকে অবশ্যই পথনির্দেশিকা দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদেরও (আমার) কেতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম; (তা ছিলো) জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে হেদায়াত (ও সুস্পষ্ট) উপদেশ। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমার গুনাহখাতার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। (সূরা আল মোমেন, আয়াত ৫১-৫৫)

আলোচ্য আয়াতে জয়পরাজয়ের মাপকাঠি সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত মন্তব্য করা হচ্ছে। এ মন্তব্যের মাঝে সেসব দল এবং গোষ্ঠীর প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে যারা আল্লাহর বাণী অস্বীকার এবং অহংকার করার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে।

এ মন্তব্য এমন বাস্তবসম্মত ভংগিতেই করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে মানুষ সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারবে। মানুষ বুঝতে পারবে, সত্য ও মিথ্যার ফলাফল পার্থিব জগতে কী হয় আর পরকালে কী হয়। এর মাধ্যমে আনুষ আরও জানতে পারবে, ফেরাউন ও তার লোকজনদের পরিণতি পৃথিবীতে কী হয়েছিলো এবং পরকালে কী হবে। অর্থাৎ তাদের পরিণতি হবে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা। পবিত্র কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে, এ জাতীয় সব ঘটনার পরিণতি এ রকমই হবে। বলা হচ্ছে–

يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ الدَّارِ

'সেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি কোনোই উপকারে আসবে না, (সেদিন) তাদের জন্যে (শুধু থাকবে) অভিশাপ, তাদের জন্যে আরো থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস।' (আল মোমেন, ৫২)

তবে পরকালে বিশ্বাসী কোনো মোমেন বান্দা পরকালের এ পরিণতি সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হবে না। তাছাড়া এ জাতীয় বিতর্কের কোনো প্রয়োজনও তার হবে না, কিন্তু পার্থিব জগতের বিজয় ও সফলতা সম্পর্কে কখনও কখনও নিশ্চয়তা ও সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই বলা হয়েছে–

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

'আমি এই দুনিয়ার জীবনে আমার রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের অবশ্যই সাহায্য করবো'। (আল মোমেন, ৫১)

অথচ বাস্তবে মানুষ দেখতে পায়, কোনো কোনো রসূলকে হত্যা করা হয়েছে, কোনো কোনো রসূলকে নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং কোনো কোনো রসূলকে তার পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। অপরদিকে মোমেন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কাউকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, কাউকে জ্বলন্ত অগ্নিকূপে নিক্ষেপ করা হয়, কাউকে শহীদ করে দেয়া হয়, তাদের কেউ কেউ যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট ও যুলুম-অত্যাচারের মাঝে বেঁচে থাকে। তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে সেই আসমানী ওয়াদা কোথায়? এ ছিদ্র দিয়েই শয়তান মানুষের মনে ঢুকে এবং যা করার তাই করে।

মানুষ সচরাচর যা দেখে তার মাধ্যমেই ঘটনার বিচার করে এবং অনেক মূল্যবোধ ও বাস্তব তত্ত্বই তখন তার বিবেচনায় থাকে না। মানুষ অত্যন্ত সংকীর্ণ চিন্তার অধিকারী, তাই স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ঘটনাসমূহের বিচার করে। বিচারের এই মানবীয় মানদন্ড নিসন্দেহে খুবই সংকীর্ণ। অপরদিকে ব্যাপক মানদন্ডে যখন ঘটনার বিচার করা হয় তখন স্থান কালের গন্ডি থাকে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ। সেখানে কালের মাঝে কোনো ব্যবধান থাকে না এবং স্থানের মাঝেও কোনো ব্যবধান থাকে না। এ মানদন্ডের ভিত্তিতে যদি আমরা আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি বিচার করি তাহলে আমরা নিসন্দেহে এর বিজয় সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবো। আসলে কোনো আকীদা বিশ্বাস বা আদর্শের বিজয়ের অর্থ হচ্ছে এর ধারক ও বাহকদেরই বিজয়। কাজেই, এ আদর্শের অস্তিত্বের বাইরে এর ধারক বাহকদের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ, এ আদর্শের প্রথম দাবীই হচ্ছে, এর ধারক ও বাহকরা তাতে বিলীন হয়ে যাবে এবং নিজেরা পর্দার আড়ালে থাকবে আর আদর্শকে সামনে তুলে ধরবে।

বিজয় ও সাফল্যের বিষয়টিও মানুষ অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে দেখে থাকে এবং সচরাচর এর যে চিত্র তারা প্রত্যক্ষ করে তার ওপর ভিত্তি করেই বিচার করে। অথচ

বিজয় বিভিন্নরূপে ও আকারে প্রকাশ পায়। বাহ্যিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিতে এ বিজয় কখনও কখনও পরাজয়ের রূপেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় দেখতে পাই, তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও তিনি নিজের আদর্শ থেকে সরে আসেননি এবং এ আদর্শের প্রচার থেকেও বিরত হননি। তাহলে তার এই অবস্থানকে কি নামে আখ্যায়িত করবো? বিজয় নামে, না পরাজয় নামে? যদি ঈমান আকীদার মানদন্ডে বিচার করি, তাহলে নিসন্দেহে বলতে পারি, এটা ছিলো সর্বোচ্চ বিজয়। যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন তখনও তিনি ছিলেন বিজয়ী এবং যখন অগ্নিকুন্ড থেকে সহি-সালামতে বের হয়ে আসেন তখনও ছিলেন বিজয়ী, অথচ বাহ্যিকভাবে দুটো অবস্থার মাঝে কতো ব্যবধান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটো অবস্থার মাঝে কোনোই ব্যবধান নেই।

হযরত হোসাইন (রা.) অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও করুণভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন। একদিকে শাহাদাত হচ্ছে এক বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা। অপরদিকে সেটা অত্যন্ত মর্মবিদারী ও বিয়োগান্তক এক ঘটনাও বটে। এখন এ ঘটনাকে আমরা বিজয় বলবো, না পরাজয়? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং সংকীর্ণ মানদন্ডে এটা ছিলো পরাজয়, কিন্তু প্রকৃত সত্যের আলোকে এবং উদার মানদন্ডে এটা ছিলো বিজয়। কারণ, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো শহীদ নেই যার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় হৃদয় সিক্ত হয় না, মন কেঁদে ওঠে না। ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ঘটনা যালেমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তার বিয়োগান্তক ঘটনায় শুধু মুসলমানই নয়, অনেক অমুসলিমও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এমন অনেক শহীদ আছেন যিনি এক হাজার বছর জীবিত থাকলেও তিনি তার আদর্শের প্রচার প্রসারে বিজয়ী হতে পারতেন না, শাহাদাতই তার আদর্শকে বিজয়ী করেছে। শহীদের রক্তে লেখা সর্বশেষ বক্তৃতাই হৃদয়ের মাঝে মহান চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং হাজার হাজার মানুষকে মহান কাজে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। শাহাদাতের রক্তাক্ত অধ্যায়ই ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে।

বিজয় কাকে বলে আর পরাজয়ই বা কাকে বলে? আমাদের মনে জয় পরাজয়ের যে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। পার্থিব জগতে নবী রসূল ও মোমেনদের বিজয় সম্পর্কিত আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবতাকে সঠিক অর্থে অনুধাবন করতে হবে।

এটা ঠিক, বিজয় অনেক সময় তার বাহ্যিক রূপেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। তখন এ বাহ্যিক রূপ অমর ও চিরন্তন রূপটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, মিলে যায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) তাঁর জীবনে এ বিজয় দেখেছেন। এটা উভয় দিক থেকেই বিজয় ছিলো। কারণ এ বিজয়ের সম্পর্ক ছিলো পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রচারিত আদর্শের বাস্তব ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সাথে। যদি তা গোটা মানবজীবনকে প্রভাবিত না করে, তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ না করে তাহলে তো এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের হৃদয় থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের শাসকের হৃদয় পর্যন্ত যদি এর বিস্তার না

থাকে তাহলে সঠিক পথে এ আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় নবী মোহাম্মদ (স.)-এর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে তা হলো, এ আদর্শের ধারক তাঁর জীবদ্দশায়ই উভয়বিদ বিজয় লাভ করতে পেরেছেন। কারণ, তিনি এ আদর্শকে এর পূর্ণাংগরূপে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এবং এই বাস্তব সত্যকে ইতিহাসের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে রেখে গেছেন। শুধু তাই নয়; বরং বিজয়ের এই চাক্ষুষ রূপ অদৃশ্য রূপটির সাথে মিশে গেছে। ফলে বাহ্যিক রূপ প্রকৃত রূপটির সাথে মিলে এক অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। আর এটা আল্লাহর নির্দেশ ও ব্যবস্থায়ই সম্পন্ন হয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে। তা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল রসূল ও মোমেন বান্দাদের জন্যে বিজয়ের যে ওয়াদা করেছেন তা আজও বহাল আছে এবং চিরকালই থাকবে। তবে এই ওয়াদা কেবল সে সব লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান থাকবে। প্রকৃত ঈমানের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। প্রকৃত ঈমান বা নির্ভেজাল ঈমান তাকেই বলে যার মাঝে বিন্দুমাত্র শেরেকের সংমিশ্রণ থাকবে না। শেরেকের এমন কিছু কিছু প্রকার আছে যা খুবই সূক্ষ্ম। এ সূক্ষ্ম শেরেকের কবল থেকে মানুষ কেবল তখনই মুক্তি পেতে পারে যখন সে পুরোপুরি আল্লাহমুখী হবে, একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা করবে, তাঁর ফয়সালায় রাযী-খুশী থাকবে এবং অনুভব করবে, একমাত্র আল্লাহই তাকে পরিচালিত করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন। কাজেই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তার কোনো মংগল নেই। এ বাস্তব সত্য সে সন্তুষ্টচিত্তে ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে গ্রহণ করে নেয়। তার অবস্থা যখন এই পর্যায়ে উন্নীত হবে তখন আল্লাহর নির্দেশের বাইরে সে কোনো কাজ করবে না। দুনিয়ার জীবনেই বিজয় বা সাফল্যের বিশেষ কোনো রূপের জন্যে আল্লাহর কাছে আবদার করবে না; বরং গোটা বিষয়টিই সে তখন আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করবে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবে সেগুলোকে নিজের জন্যে মঙ্গলজনক মনে করবে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে বিজয় ও সাফল্য। অর্থাৎ এখানে বিজয় হচ্ছে নিজের আমিত্বকে জয় করা, প্রবৃত্তিকে জয় করা। এটাই হচ্ছে অন্তর্নিহিত বিজয়। এ বিজয় ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই বাহ্যিক বিজয় লাভ করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, পরকালে যালেম অত্যাচারীদের কোনো ওযর আপত্তিই কাজে আসবে না; বরং তারা ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং পরিশেষে নিকৃষ্ট জায়গায় স্থান পাবে। অপরদিকে মূসা (আ.)-এর ঘটনায় ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। সেখানে তাঁকে আমরা বিজয়ীবেশে দেখি। যেমন বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ الْكِتٰبَ - هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ

'আমি মূসাকে অবশ্যই পথনির্দেশিকা দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলিদেরও (আমার) কেতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম, (তা ছিলো) জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে হেদায়াত (ও সুস্পষ্ট) উপদেশ। (সূরা আল মোমেন, আয়াত ৫৩)

এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের বিজয়। এ বিজয়ের সারমর্ম হচ্ছে, কেতাব ও হেদায়াতের অধিকারী হওয়া এবং কেতাব ও হেদায়াতকেই নিজের উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে যাওয়া। মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিজয়ের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয়, তার মাধ্যমে আমরা এক বিশেষ ধরনের বিজয়ের রূপ দেখতে পাই। বিজয়ের এ রূপ কোন ধারার ওপর ভিত্তি করে লাভ হয় তার ইংগিতও বহন করে।

আলোচনার এই পর্বে এখন সর্বশেষ বক্তব্য আসছে, যার মাঝে রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি দিকনির্দেশনা রয়েছে, তাঁর সাথে মক্কায় যুলুম নির্যাতনভোগকারী মোমেনদের প্রতি দিকনির্দেশনা রয়েছে এবং তাঁর উম্মতের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রত্যেকের জন্যে দিকনির্দেশনা রয়েছে, যারা অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। বলা হয়েছে–

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

'অতএব তুমি সবর করো, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তুমি তোমার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। (আল মোমেন, ৫৫)

এ সর্বশেষ বক্তব্যে ধৈর্য সহ্যের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মিথ্যারোপের ওপর ধৈর্য ধারণ করা, যুলুম নির্যাতনের ওপর ধৈর্য ধারণ করা, বাতিলের সাময়িক উত্থান ও প্রভাবপত্তির ওপর ধৈর্য ধারণ করা, মানুষের স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারের ওপর ধৈর্য ধারণ করা, মনের বিভিন্ন চাহিদা, আশা আকাংখা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং তাৎক্ষণিক বিজয়ের জন্যে মনের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা। এ ছাড়া আরও অনেক কিছুই ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা, যা শত্রুদের আগে বন্ধুদের কাছ থেকেই আসতে পারে।

বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য', অর্থাৎ সময় যতোই দীর্ঘ হোক না কেন, অবস্থা যতোই জটিল হোক না কেন এবং পরিস্থিতি যতোই অস্থিতিশীল হোক না কেন, এই ওয়াদা বাস্তবায়িত হবেই। কারণ, এ ওয়াদা তিনিই করেছেন যিনি এর বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখেন এবং ওয়াদা তিনিই করেছেন যিনি তা বাস্তবায়নের ইচ্ছাও রাখেন।

চলার পথে পাথেয় হিসেবে যা গ্রহণ করতে হবে তা হচ্ছে এই, 'তোমার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো।' কঠিন ও দীর্ঘ পথের জন্যে এটাও হচ্ছে প্রকৃত পাথেয়। অর্থাৎ গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা

বর্ণনা করা। আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা হলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এছাড়া এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং মানসিক প্রস্তুতিও লাভ হয়। আর এটাই বিজয়ের সেই রূপ যা মনোজগতে লাভ হয়। এর পরই লাভ হয় জাগতিক জীবনের বিজয়।

এখানে সকাল সন্ধ্যা বলতে হয় তো দিনের গোটা সময় বুঝানো হয়েছে। অথবা এ দুটো মুহূর্তে মানুষের মন পরিষ্কার এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে, তাই এভাবে বলা হয়েছে।

বিজয়লাভের জন্যে এটাই হচ্ছে যথার্থ পন্থা, এটাই হচ্ছে প্রকৃত পাথেয় যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, এটা হচ্ছে এক ধরনের যুদ্ধ। আর প্রত্যেক যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে এবং পাথেয়রও প্রয়োজন আছে।

বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ও তার কিছু শর্ত

কোরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বিজয়ের আগাম ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও প্রত্যয়, তাঁর আনুগত্য, তাঁকে একমাত্র বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ, তাঁর রসূল এবং মোমেনদেরও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ, আল্লাহর একনিষ্ঠ মোমেন বান্দা ব্যতীত আর সবার সাথে মোমেনদের সম্পর্কচ্ছেদের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ

'তোমাদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই মোমেনরা, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও সর্বদা (আল্লাহর আদেশের প্রতি) বিনয়াবনত থাকে।' (আল মায়েদা, ৫৫)

এভাবে মুসলমানদের বন্ধুর সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ সীমা কোনো ব্যাখ্যা দ্বারাই সম্প্রসারিত করার অবকাশ নেই, মানবরচিত জীবনব্যবস্থার ধারক বাহক ফাসেক ফুজ্জারদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আন্দোলনকে নমনীয় করার কোনো সুযোগ নেই।

বস্তুত ব্যাপারটা এ রকম না হয়ে উপায়ও ছিলো না। কেননা আমি আগেই বলেছি, সমস্যাটা মূলতই আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের। সমস্যাটা এ আকীদার আলোকে আন্দোলন পরিচালনার। বন্ধুত্ব হওয়া চাই নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্যে এবং একমাত্র তাঁরই প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস থাকা চাই। ইসলাম হওয়া চাই একমাত্র ধর্ম। যারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে ও জীবনের সঠিক বিধান হিসাবে গ্রহণ করে না, তাদের সাথে মুসলমানদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক শৃংখলা ও আপোসহীনতা থাকতে হবে। তাই তাতে শুধুমাত্র একই নেতৃত্ব

ও একই পতাকার কর্তৃত্ব থাকবে। আর পারস্পরিক সহযোগিতা থাকবে শুধু মোমেনদের মধ্যে। কেননা এ সহযোগিতা ইসলামী আকীদা ও আদর্শভিত্তিক জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই পরিচালিত।

তাই বলে ইসলাম যাতে নিছক শিরোনাম, নিছক শ্লোগান ও পতাকা, নিছক মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথা, নিছক উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত বংশীয় সম্পদ, কিংবা একটি নির্দিষ্ট জায়গার অধিবাসীদের গুণমাত্রে পরিণত হয়ে না থাকে, সে জন্যে মোমেনদের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

'তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনয়াবনত থাকে।' (আল মায়েদা, ৫৫)

তাদের একটি অন্যতম গুণ বলা হয়েছে নামায কায়েম করা– শুধু নামায আদায় করা নয়, নামায কায়েম করা দ্বারা বুঝানো হয় পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করা, যার ফলে নামাযীকে আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে রক্ষা করেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,'নিশ্চয়ই নামায পাপ ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে।'

যাকে নামায খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করে না, সে নামায কায়েমই করেনি। যদি করতো তবে সে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পেতোই। আল্লাহ তায়ালা একথাই বলেছেন এ আয়াতে।

তাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যাকাত দেয়া। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর নৈকট্যলাভের উদ্দেশে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে সম্পদের হক প্রদান করা। বস্তুত যাকাত নিছক কোনো আর্থিক কর নয়; বরং এটা একটা এবাদাত। একে আর্থিক এবাদাতও বলা চলে। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য, একটি ফরয দ্বারা সে বহু সংখ্যক উদ্দেশ্য সফল করে। অথচ মানবরচিত মতবাদগুলো এ রকম নয়। ওসব মতবাদে একটা উদ্দেশ্য সফল হলে অন্য বহু সংখ্যক উদ্দেশ্য উপেক্ষিত হয়।

এ কথা সত্য, সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কার সাধনের প্রয়োজনে কিছু না কিছু কর আরোপ, অন্য কথায় দেশ, জাতি বা যে কোনো কর্তৃপক্ষের নামে ধনীদের কাছ থেকে গরীবদের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় না করে পারা যায় না। এ দ্বারা অভাবী লোকদের কাছে কিছু অর্থ-কড়ি পৌঁছে দেয়া যায়। এভাবে অন্তত একটা উদ্দেশ্য সফল হয়। পক্ষান্তরে যাকাতের আভিধানিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায়, পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর একটা এবাদত হিসেবে তা বিবেক ও মনের পবিত্রতা এবং পরিশুদ্ধি সাধন করে। এর সাথে যুক্ত এ পবিত্র অনুভূতি দ্বারাও বিবেক ও মনের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়, যে দরিদ্র লোকদের যাকাত দেয়া হচ্ছে তারা সমাজের কোনো তুচ্ছ শ্রেণী নয়; বরং তারই ভাই। যাকাতকে আল্লাহর এবাদাত মনে করার কারণে দাতা আখেরাতে এর শুভ প্রতিদান পাওয়ার আশা করে। অনুরূপভাবে, এ দ্বারা দেশে কল্যাণকর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ সাধিত হওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির

পথও সুগম হয়। তা ছাড়া, যাকাত গ্রহণকারীদের মনে এ পবিত্র অনুভূতিও বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদে যাকাত ধার্য করে গরীবদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। ধনীদের ভাই মনে করার পরিবর্তে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের মনোভাব সৃষ্টি হয় না। বিশেষত, যখন তারা এ কথা স্মরণ করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ধনীরা অর্থোপার্জন করতে গিয়ে কোনো হারাম পন্থা অবলম্বন করে না বা কারো ওপর যুলুম করে না। সর্বশেষে তা এই পবিত্র, কল্যাণময় ও সন্তোষপূর্ণ পরিবেশে তথা পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধির পরিবেশে আর্থিক করের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করে।

যাকাত দেয়া মোমেনদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাদের মধ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মনোবৃত্তি গড়ে তোলে। আর এই আনুগত্যের নামই ইসলাম।

'এবং তারা বিনয়াবনত হয়।'

অর্থাৎ বিনয়াবনত থাকা এবং আনুগত্য করা তাদের স্থায়ী নীতি ও আসল স্বভাব। এ জন্যেই শুধু নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার উল্লেখ করে ক্ষান্ত থাকা হয়নি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপক ও সর্বাত্মক গুণ। তাদের সর্বপ্রধান ও স্থায়ী গুণ হলো আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য। আর এ গুণ দ্বারাই তারা সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুত এরূপ ক্ষেত্রে কোরআনের বক্তব্য অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যবহ। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

'আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মোমেনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত, (এটাই আল্লাহর দল এবং) আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়ে থাকে।' (আল মায়েদা, ৫৬)

এখানে ঈমানের প্রধান স্তম্ভ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরই বিজয়ের এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সেই স্তম্ভটি হলো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ এবং ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী প্রদান, এটা মুসলমানদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃতি, ইহুদী খৃস্টানদের অন্তর্ভুক্তি এবং ইসলাম পরিত্যাগ করা তথা মোরতাদ হওয়ার শামিল বলে গণ্য করার পরই বিজয়ের এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

এখানে কোরআনের একটি স্থায়ী বক্তব্য ফুটে উঠেছে। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও শুধু তার ভিত্তিতেই ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন না; বরং সাথে সাথে এও জানিয়ে দেন যে, ইসলাম সর্বোত্তম ও কল্যাণময় জীবনব্যবস্থা। বিজয় ও প্রতিষ্ঠালাভ ইসলামের এমন এক পরিণতি, যা যথাসময়ে অবশ্যই বাস্তব রূপ লাভ করবে। তবে সেটা বাস্তব রূপ লাভ করবে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে প্রলুব্ধ ও উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন তা কার্যকরি করার

জন্যে। ইসলামের বিজয়ে মুসলমানদের কোনো কৃতিত্ব নেই। এ বিজয় হচ্ছে আল্লাহর নিজের সিদ্ধান্ত, যা তিনি মুসলমানদের হাতে বাস্তবায়িত করে থাকেন। মুসলমানদের তিনি এ বিজয়ের সুফল ভোগ করান শুধু তাদের এর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান থাকার প্রতিদান হিসেবে, এর জন্যে তাদের চেষ্টা সাধনার প্রতিদান হিসেবে এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠালাভের সুফল হিসেবে যেসব সৎকাজ সংঘটিত হয় ও পৃথিবীর যে সংস্কার সংশোধন সম্পন্ন হয় তার প্রতিদান হিসেবে।

আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি এবং বিরাজমান বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্যেও দিয়ে থাকেন। কেননা অনেক সময় এ সব বাধা বিপত্তি তাদের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেয়। একদিন ইসলামের বিজয় হবেই– এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের পর তাদের সকল দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার মনোবল সৃষ্টি হয়। এ কারণে মুসলিম দল এই আশা পোষণ করে, আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর জন্যে যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা তাদের হাতেই সফল হোক। এতে করে তাদের জেহাদের সওয়াব, পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সওয়াব এবং এর ফলে যেসব সৎকর্ম সংঘটিত হবে তার সওয়াবও তারাই পাবে।

এ উক্তি দ্বারা তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা, তাদের এ সব সুসংবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহর দলের বিজয়ের এ মূলনীতির উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কী তা বুঝা যায়।

এরপর আমাদের ক্ষেত্রেও এ মূলনীতি প্রযোজ্য। এ মূলনীতির কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও কাল নেই। তাই আমরা এটিকে আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতি বলে মেনে নেবো। যদিও মোমেনরা কিছু কিছু যুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর চূড়ান্ত অমোঘ নিয়ম হচ্ছে, আল্লাহর দলই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে থাকে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে যাই কিছু ঘটুক, আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি সে সবের উর্ধ্বে ও সে সবের চেয়ে সত্য। আর আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহর রসূল ও মোমেনদের সাথে সুগভীর ভালোবাসা, একাত্মতা ও সম্প্রীতিই একমাত্র উপকরণ, যা দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে পবিত্র কোরআন মুসলমানদের তাদের আকীদা বিশ্বাসের বিরোধী মোশরেক ও আহলে কেতাব গোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে নিষেধ করা এবং এই ঈমানী মূলনীতিটাকে তাদের মন মগযে ও চেতনায় বদ্ধমূল করে নেয়ার আহ্বান জানানোর জন্যে যে রকমারি বাচনভংগি অবলম্বন করেছে, তা দ্বারা শুধু ইসলামী মতাদর্শেই নয়; বরং ইসলামী আন্দোলনেও এ মূলনীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, 'হে মোমেনরা' বলে প্রথম যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তাতে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ এবং বিজয় বা অন্য কোনো ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের গোপন কারসাজি ও গাঁটছড়া ফাঁস করে দিতে পারেন

বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বার যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তাতে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা বা ভীতি প্রদর্শনের পরিবর্তে তাদের এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা, রসূল এবং মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী স্থাপন করে নিজেদের মোরতাদ হবার ব্যবস্থা যেন না করে এবং আল্লাহর প্রিয় ও প্রেমিক বান্দাদের দলভুক্ত হতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর দলকে বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করা হয়েছে।

মোমেনদের সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

আল্লাহর দিকে আহবানের কাজে নিয়োজিত প্রতিটি দল সম্পর্কে একটি কথা অনেক স্থানেই তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দাওয়াতদানকারী মোমেনদের বিশেষভাবে 'আল্লাহর সেনাদল' বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, অবশ্যই এই সেনাদল জয়ী হবে। যেখানে যেখানে তারা বাধাপ্রাপ্ত হবে বা তাদের কাজ করার পথে জটিলতা আসবে, সেখানে অবশ্যই তারা গায়বী মদদ লাভ করবে। তাদের জীবন বিপন্ন করার জন্যে বা তাদের কাজ ব্যাহত করার জন্যে যতো প্রকার জটিলতাই সৃষ্টি করা হোক এবং যতো অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য মোমেনদের জন্যে অবধারিত। মিথ্যা প্রচার এবং মনগড়া কথা, সামরিক শক্তি প্রদর্শন ও একমাত্র শত্রুতার উদ্দেশেই যে বিরোধিতা করা হয়–এসবের ফল এক এক সময় এক এক রকমের হয়ে থাকে, কিন্তু অবশেষে মোমেনদের প্রতি আল্লাহর দেয়া ওয়াদাই সত্যে পরিণত হয়। এটা এক মহা সত্য যে, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর সেনাদলকে সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়, তখন সারা দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়েও তাদের পর্যুদস্ত করতে চাইলে তারা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোমেনদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্যের ওয়াদা হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান অন্যান্য শাশ্বত নিয়মের অন্যতম। গ্রহ উপগ্রহ ও তারকারাজির সুসংগঠিত আবর্তনের মধ্যে তাঁর এ নিয়ম চালু রয়েছে, দিন রাতের আনাগোনার মধ্যেও এটা আছে। এ নিয়মের অধীনেই বৃষ্টির পানি বর্ষিত হয়ে মৃত যমীন থেকে জীবনের উৎপত্তি হচ্ছে। সবার জীবন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপির কাছে দায়বদ্ধ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ সবাইকেই তাঁর মুখাপেক্ষী থাকতে হয়, যখন যার জন্যে ইচ্ছা তিনি তাঁর এ অমোঘ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, কিন্তু ভবিষ্যত কি হবে না হবে এবং মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনের পরিণতি কি হবে তা বাহ্যিক কিছু লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হলেও মানুষ অনেকাংশে অনুমান করতে পারে। এসব লক্ষণ মানুষের অজান্তেই বাস্তবায়িত হতে থাকে, যা অধিকাংশ সময়ে মানুষ অবচেতন মনে অনুভব করে। কারণ মানুষ চায়, বিজয় আকারে আল্লাহর ফয়সালা ও সরাসরি সাহায্য তাৎক্ষণিক আসুক, কিন্তু তাদের ইচ্ছা ও চাহিদামতোই আল্লাহর সাহায্য আসবে এমন নয়। তাঁর সাহায্যদানের বিশেষ এক পদ্ধতি রয়েছে, যা নির্দিষ্ট এক সময় পার হওয়ার পরই বাস্তবায়িত হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেনাবাহিনী এবং তাঁর রসূলদের অনুসারীদের প্রতি নানা প্রকার সাহায্যের যে ওয়াদা করেছেন তা এক নির্দিষ্ট নিয়মে তিনি দান করে থাকেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এ সাহায্য দিতে চান তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের আলোকে নির্ধারিত নিজস্ব প্রক্রিয়ায়, যা হবে আরও বেশী ভালো, আরও টেকসই। অতএব, আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হবে। তাতে যদি তাঁর সেনাবাহিনীকে আরও বেশী দিন কষ্ট পেতে হয় অথবা অনুমানের চাইতে আরও বেশী অপেক্ষা করতে হয়– তাহলে তাই হবে। বদর যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানরা তো চেয়েছিলো, কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলাটি তাদের হস্তগত হোক, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন তুচ্ছ ও সামান্য লাভজনক সেই কাফেলা তাদের হস্তগত না হোক; বরং তাদের মোকাবেলা হোক কোরায়শদের বিশাল বাহিনীর সাথে এবং তারা যুদ্ধ করুক দুর্ধর্ষ এক সেনাদলের সাথে। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুসলমান আরও বড়ো কল্যাণ চেয়েছিলেন; এজন্যে আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাঁর রসূল তাঁর সেনাদল এবং তাঁর দ্বীনের বিজয় আসতে বিলম্ব হয়েছিলো।

এটাও হয়েছে যে, কোনো কোনো যুদ্ধে আল্লাহর সেনা দল পরাজিত হয়েছে এবং আজও কখনও কখনও তাদের ওপর মসিবত আসে– আসে তাদের ওপর নানা পরীক্ষা। কারণ এ সব বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের আরও বড় বড় সমর ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলতে চান। এজন্যে তিনি তাদের চতুর্দিকের পরিবেশ ও তাদের ধারণ ক্ষমতাকে এতোদূর প্রস্তুত করতে চান যেন সেই কঠিন সময়ে আরও ব্যাপকভাবে তারা আল্লাহর সাহায্য কাজে লাগাতে পারে, আরও দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর সাহায্য পেতে পারে এবং এ সাহায্যের প্রভাব আরও গভীরভাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের উৎসাহিত করতে পারে।

অতীতের ইতিহাস সামনে রাখলে উপরোক্ত কথার যথার্থতা মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে এবং দেখতে পাবে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাঁর শাশ্বত নিয়মও বাস্তবায়িত হয়েছে, যার ব্যতিক্রম কোনো দিন হয়নি। আল্লাহর এ ওয়াদার বাস্তবতা কোনো বিচ্ছিন্ন বা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এরশাদ হচ্ছে–

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ج اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ – وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

'আমার (খাস) বান্দা রসূলদের ব্যাপারে আমার এই কথা সত্য হয়েছে যে, তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই (চূড়ান্তভাবে) বিজয়ী হবে।' (আস সাফফাত, ১৭১-১৭৩)

এ চূড়ান্ত ওয়াদার ঘোষণা দেয়ার এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণের সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি কাফের মোশরেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদের জন্যে প্রদত্ত আল্লাহর ওয়াদা ও চূড়ান্ত কথা যথার্থভাবে

প্রমাণিত হওয়ার জন্যে তাদের ছেড়ে দেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন চাচ্ছেন, মহানবী (স.) যেন তাদের কঠিন ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। কারণ তাদের ওপর শাস্তি যে নেমে আসবেই এটা আল্লাহর ওয়াদা। এ ওয়াদা যখন বাস্তবায়িত হবে তখন তাদের কি করুণ পরিণতি হবে তা নিজ চোখে দেখার জন্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর নবীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে–

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ - وَّ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ - اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ - فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاۤءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ - وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ - وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ

'অতএব (হে নবী), কিছুকালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো। তুমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো, অচিরেই তারা (বিদ্রোহের পরিণাম) দেখতে পাবে। এরা কি (তাহলে) সত্যিই আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়? (এর আগে) যাদের (এভাবে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের আংগিনায় যখন শাস্তি নেমে এলো, তখন (গযব নাযিলের সে) সকালটা তাদের জন্যে কতো মন্দ ছিলো! অতএব (হে নবী), কিছুকালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো, তুমি (শুধু) ওদের পর্যবেক্ষণই করে যাও, শীঘ্রই ওরা (সত্য প্রত্যাখ্যানের) পরিণাম (নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করবে।' (সূরা আস সাফফাত, আয়াত ১৭৪-১৭৯)

অর্থাৎ, হে রসূল, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করো এবং তাদের সাথে কোনো মেলামেশা করো না। ছেড়ে দাও তাদের সেই দিনের জন্যে যখন তাদের তুমি তাদের আযাবের মধ্যে আহাজারি করতে দেখতে পাবে এবং দেখবে, তাদের ও তোমার সম্পর্কে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দেয়া ওয়াদা কেমন করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকের এ সুখের দিনে সেই অকৃতজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিরা আমার অমোঘ আযাবের ব্যাপারে কতো ব্যস্ততাই না দেখাচ্ছে। আফসোস, যখন তাদের ওপর সেই আযাব এসেই পড়বে, তখন তাদের কি অবস্থা যে হবে তা এখন কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। সেই জাতির ওপর যখন আযাব এসে যাবে তখন তারা নিজেদের নিন্দিত, বিপর্যস্ত ও আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় দেখতে পাবে, রাগে ক্ষোভে, কষ্টে হাত-পা ছুঁড়তে থাকবে, কিন্তু সেই আযাব থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই তারা খুঁজে পাবে না। কারণ ইতিপূর্বে তাদের সতর্ক করার জন্যে বহু সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছে।

তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শনের উদ্দেশে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ বার বার এসেছে। এ ভয়ানক নির্দেশের মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড এক ধমক। বলা হচ্ছে–

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ -

'ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।' (আস সাফফাত, ১৭৪)

একইভাবে ইংগিত দেয়া হচ্ছে এক অতি কঠিন অবস্থার দিকে যা শীঘ্রই আসবে। এরশাদ হচ্ছে–

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ

'আর তুমি দেখো, অতপর শীঘ্রই ওরাও দেখবে।' (আস সাফফাত, ১৭৫)

কিন্তু কি দেখবে সে কথা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, যার কারণে এতো সাংঘাতিক পরিণতির ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

এরপর যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আল্লাহর পবিত্র হওয়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে, তাঁর বিশেষ মর্যাদার কথা জানানো হচ্ছে, আরও জানানো হচ্ছে যে, সকল রসূলদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অজস্র সালাম। ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে, যিনি গোটা বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক, যাঁর ক্ষমতায় ভাগ বসানোর কেউ নেই। এরশাদ হচ্ছে–

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ – وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ – وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'পবিত্র তোমার মালিকের মহান সত্তা, তারা (তাঁর সম্পর্কে) যা কিছু (অর্থহীন) কথাবার্তা বলে, তিনি তা থেকে অনেক বড়ো, তিনি সকল ক্ষমতার একক অধিকারী, (অনাবিল) শান্তি বর্ষিত হোক রসূলদের ওপর, সমস্ত প্রশংসা (নিবেদিত) সৃষ্টিকুলের মালিক, আল্লাহ তায়ালার জন্যে।' (আস সাফফাত, ১৮০-১৮২)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ওয়াদা ও তার শর্ত

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

'তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা হচ্ছে, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত (রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা) দান করবেন–যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবন বিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাকেও তাদের জন্যে (সমাজে ও রাষ্ট্রে) প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, তাদের (ভয়ের) অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দেবেন (তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে), তারা শুধু আমারই গোলামী করবে,

আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং যারা তাঁর নেয়ামতের নাফরমানী করবে তারাই ফাসেক (বলে পরিগণতি হবে)।' (সূরা আন নূর, আয়াত ৫৫)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর প্রতি বাস্তব অর্থে ঈমান রাখে, তাদের প্রতিদান কেয়ামতের আগে এ পৃথিবীর বুকেই কিঞ্চিত দেয়া হবে।

রসূলের উম্মতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করছেন যে, যারা ঈমান গ্রহণ করবে এবং সৎকার্য করবে, তাদের তিনি পৃথিবীর রাজত্ব দান করবেন, তাদের আদর্শ ও জীবনব্যবস্থাকে জয়ী করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা সব সময়ই সত্য হয়ে থাকে, তাঁর ওয়াদা সব সময়ই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করেন না। এখন প্রশ্ন, সেই ঈমান কেমন হওয়া উচিত? আর সেই রাজত্ব ও ক্ষমতাই বা কেমন হবে?

যে ঈমানের ফলে আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে সেই ঈমানের প্রকৃতি ও বাস্তবতা অত্যন্ত সুবিশাল, এ ঈমানের আওতায় গোটা মানবজীবনের কর্মকান্ডই এসে যায়। এ ঈমানই গোটা মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ও পথনির্দেশনা দান করে থাকে। এ ঈমান যখনই কোনো মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হবে তখনই তার কাজেকর্মে, আচার আচরণে ও চলনে-বলনে তার প্রতিফলন হবে। তখন ব্যক্তির প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি পদক্ষেপই হবে আল্লাহমুখী। তার প্রতিটি কাজই হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে। যে ঈমানের বিনিময়ে আল্লাহর এই ওয়াদা, সে ঈমান হচ্ছে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্যের নাম, আল্লাহর হাতেই খুঁটিনাটি সব কিছু ছেড়ে দেয়ার নাম। এ ঈমানের যখন প্রকাশ ঘটবে তখন ব্যক্তির খেয়াল খুশীর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, জৈবিক চাহিদার হাতে সে বন্দী থাকবে না এবং স্বভাব ও প্রকৃতির টানে ভেসে যাবে না; বরং এসব বিষয়েও সে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্ব করবে।

যে ঈমানের বিনিময়ে আল্লাহর এই ওয়াদা, গোটা মানবজীবনের কর্মকান্ড সেই ঈমানের আওতায় পড়ে। এই ঈমানের প্রভাব ব্যক্তির চিন্তাজগতে পড়বে, মনজগতে পড়বে, আধ্যাত্মিক জগতে পড়বে, স্বভাবপ্রবণতায় পড়বে, দেহের ওপর পড়বে, অংগ প্রত্যংগের ওপর পড়বে এবং পরিবার পরিজন ও সকল মানুষের সাথে তার আচরণেও পড়বে। অর্থাৎ ব্যক্তির সকল কর্মকান্ডই হবে তখন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদিত। আলোচ্য আয়াতে বিষয়টির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইংগিত করে বলছেন–

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

'তারা শুধু আমার গোলামী করে এবং আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না।' .... (আন নূর, ৫৫)

বলাবাহুল্য, শেরেকের বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। এমনকি গায়রুল্লাহর উদ্দেশে কোনো আমল নিবেদন করা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে উদ্ভূত কোনো জীবনব্যবস্থা বা কোনো আইন কানুন মেনে নেয়া, অথবা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, চক্র বা গোষ্ঠীর কোনো মতাদর্শ, তন্ত্র বা মতবাদ চেতনায় স্থান পাওয়াও একটি প্রচ্ছন্ন শেরেক।

শেরেক ও কুফুরমুক্ত ঈমানই হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে আল্লাহর সব ধরনের বিধি-নিষেধ রয়েছে, জীবন পরিচালনার জন্যে অপরিহার্য সব কিছুই গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে। সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে সকল প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা ও রয়েছে।

পৃথিবীর রাজত্ব বলতে এখানে নিছক কর্তৃত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি, দমন পীড়ন বুঝায় না, তবে এই খেলাফতের আওতায় নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ঠিকই থাকবে এবং তা সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশে ব্যবহৃত হবে। তা সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্যে, আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশে ব্যবহৃত হবে এবং আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা মানুষের জীবনকে এ পৃথিবীর বুকে পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশে ব্যবহৃত হবে।

পৃথিবীর খেলাফত হচ্ছে এমন একটি ক্ষমতা, যার মূল উদ্দেশ্য হবে গঠন ও সংস্কার; ধ্বংস ও নৈরাজ্য নয়। এ ক্ষমতার উদ্দেশ্য হবে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা; যুলুম-অত্যাচার ও দমন-পীড়ন নয়। এ ক্ষমতা মানবজীবন উন্নত করে, মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে উন্নত করে। এই ক্ষমতা কখনো মানুষকে পশুর স্তরে নিয়ে পৌঁছায় না।

এই খেলাফত আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদেরই দান করবেন বলে আল্লাহ ওয়াদা করছেন, যারা তাঁর দেয়া শর্ত পূরণ করবে। যেমনটি তিনি অতীতেও সৎকর্মশীল মোমেনদের দান করেছিলেন। এর দ্বারা মোমেন বান্দারা আল্লাহর মনোনীত আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবে, আল্লাহর মনোনীত ন্যায়বিচার ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঘটাবে এবং গোটা মানবজাতিকে পূর্ণতার পথে, মংগল ও কামিয়াবীর পথে পরিচালিত করবে। অপরদিকে যারা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে পৃথিবীর বুকে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, যুলুম অত্যাচারের বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পাশবিকতার স্তরে নিয়ে পৌঁছায়, তারা কখনো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারে না, তারা কখনো আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হতে পারে না; বরং তাদের এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হচ্ছে এক প্রকার ফেতনা। এ ফেতনার সম্মুখীন তারা নিজেরাও এবং তাদের প্রজারাও। এর পেছনে অবশ্য আল্লাহর হেকমত ও কুদরতই কাজ করে থাকে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এই যথার্থ ধারণা আমরা আল্লাহর এ বক্তব্যের মাঝেই পাই–

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

'এবং তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন।' (আন নূর, ৫৫)

অর্থাৎ এই দ্বীনকে প্রথমে অন্তরের মাঝে সুদৃঢ় করতে হবে। এর পর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন হতে হবে। আর তখনই আল্লাহর ওয়াদাও বাস্তবায়িত হবে। ফলে তারা পৃথিবীর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে, তাদের জন্যে মনোনীত দ্বীনই পৃথিবীর বুকে বিজয়ী হবে। কারণ তাদের এই দ্বীন সংস্কার ও সংশোধনের নির্দেশ দেয়, হক ও ইনসাফের নির্দেশ দেয়, পৃথিবীর সকল কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে থাকার নির্দেশ দেয়, পৃথিবীকে গড়ার নির্দেশ দেয় এবং পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ তায়ালা যে সব সম্পদ ও শক্তি রেখেছেন সেগুলো ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। আর এ সব কিছুই হতে হবে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

'এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দান করবেন.....।'(আন নূর, ৫৫)

অর্থাৎ তারা ভয়-ভীতির মাঝে জীবন যাপন করছিলো, সামাজিকভাবে তাদের জীবনে কোনো নিরাপত্তা ছিলো না এবং মদীনায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতের আগ পর্যন্ত তারা কখনো অস্ত্র ত্যাগ করতে পারতো না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবুল আলিয়ার বরাত দিয়ে রবী ইবনে আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবারা দশ বছর পর্যন্ত মক্কায় মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন, তাদের শেরেক ত্যাগ করে কেবল আল্লাহর এবাদাত বন্দেগীর জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। এসময় তারা অনেক ভয়-ভীতির মাঝে এই দাওয়াতী কাজ আ াম দিতেন। তাদের প্রতি তখনও লড়াইয়ের নির্দেশ ছিলো না। এ নির্দেশ মদীনায় হিজরতের পর তাদের দেয়া হয়েছিলো। তারা মদীনায় পৌছার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের লড়াইয়ের নির্দেশ দেন, মদীনায়ও তারা প্রথম দিকে বিভিন্ন রকম ভয় ভীতির মাঝে দিন যাপন করতো। ফলে অস্ত্র হাতেই তাদের দিন-রাত কাটতো। এ অবস্থার ওপরই তারা আল্লাহর ইচ্ছায় ধৈর্য ধারণ করেছেন। এরপর একজন সাহাবী রসূল (স.)-কে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কি এভাবেই সারাক্ষণ ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতে হবে? এমন দিন কি কখনো আসবে না যখন আমরা নিরাপদ হতে পারবো এবং হাত থেকে অস্ত্র নামাতে পারবো? উত্তরে রসূল (স.) বললেন, আর অল্প কিছু দিনই তোমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে, এরপর তোমাদের কেউ বিরাট জনসমাবেশে বসলে সেখানে একটি লোহাও থাকবে না। এরপর আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন এবং এর মর্মানুসারে তাঁর প্রিয় নবীকে গোটা আরব জাহানের কর্তৃত্ব দান করেন। ফলে মুসলমানরা জীবনের নিরাপত্তা ফিরে পান, যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পান। আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আবু বকর,

ওমর ও ওসমান (রা.) এ তিন জন খলিফার শাসন আমলেও মুসলমানরা নিরাপদে ছিলেন, শান্তিতে ছিলেন, এরপর যা ঘটার তাই ঘটেছে। ফলে সমাজ জীবনে ভয় ভীতি দানা বেঁধে উঠেছে। শাসকবর্গ নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে প্রহরী ও পুলিশ নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা নিজেরাও বদলে গিয়েছিলো, ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের সাথে সেভাবেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তাদের জীবন থেকে নিরাপত্তা উঠিয়ে নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

'এরপরও যারা কুফরী করবে, তারা ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।' (আন নূর, ৫৫)

অর্থাৎ আল্লাহর শর্তের ব্যাপারে অবাধ্য হবে, আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে অবাধ্য হবে, অংগীকারের ব্যাপারে অবাধ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা একবার তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং তিনি ভবিষ্যতেও পূর্ণ করে দেখাবেন, যদি মুসলমানরা তাঁর শর্ত অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে। আর তা হচ্ছে–

يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا

'তারা একমাত্র আমার গোলামী করবে আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে।'(আন নূর, ৫৫)

অর্থাৎ আমার সাথে কোনো দেব-দেবী, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, চক্র এবং নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী ও কামনা বাসনাকে শরীক করবে না। সকল কিছুর উর্ধ্বে আমার ইচ্ছা, আমার হুকুমকে প্রাধান্য দেবে, আমার প্রতি অবিচল ঈমান ও বিশ্বাস রাখবে এবং সৎকাজ করবে। আল্লাহর এ ওয়াদা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। কাজেই এই উম্মতের যে কোনো প্রজন্মই ওপরে বর্ণিত শর্তগুলো পালন করবে, তাদের ক্ষেত্রেই আল্লাহর ওই ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। আর যদি উক্ত শর্তগুলো পালনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হবে, ক্ষমতাপ্রাপ্তি বিলম্বিত হবে, পৃথিবীর বুকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাও বিলম্বিত হবে। তবে মুসলিম জাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ যদি কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, অথবা লাঞ্ছনা গঞ্জনার সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করে, অথবা পশ্চাদপদতায় নিমজ্জিত হয়ে উন্নতি-অগ্রগতি কামনা এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা পূরণ করে দেখাবেন। এ ব্যাপারে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

কাজেই এ ওয়াদা পালনের পূর্বশর্ত হিসেবে নামায আদায় করতে, যাকাত আদায় করতে এবং আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে রসূল (স.)-কে বলা হচ্ছে, তিনি এবং তাঁর উম্মত যেন কোনোভাবেই কাফের সম্প্রদায়কে ভয় করে না চলেন, আমলে না আনেন। তাই বলা হচ্ছে–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও ....। (আন নূর, আয়াত ৫৬)

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, নামায আদায়ের মাধ্যমে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে চারিত্রিক নির্মলতা, রসূলের প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ, ছোটো বড়ো সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ, আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন– এসবই হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের উপায়। এর মাধ্যমেই মানুষ পৃথিবীর বুকে সব ধরনের আপদ বিপদ, ভয় ভীতি, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা পায়। আর পরকালে মুক্তি পায় আল্লাহর গযব, আযাব ও শাস্তির কবল থেকে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা যদি সঠিক আদর্শের অনুসারী হও, তাহলে কাফের মোশরেকদের কোনো শক্তিই তোমাদের টলাতে পারবে না। তোমাদের চলার পথে তারা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ তোমাদের শক্তির উৎস হচ্ছে তোমাদের ঈমান, তোমাদের আদর্শ এবং তোমাদের নৈতিকতা ও মনোবল। জাগতিক ও বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে তোমরা দুর্বল হলেও তোমরা অজেয় ঈমানী শক্তির অধিকারী। এ ঈমানী শক্তির বলেই তোমরা অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম।

ইসলাম হচ্ছে একটি বিরাট সত্য। এই সত্য উপলব্ধি করতে না পারলে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর ওয়াদার তাৎপর্যও উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে না। কাজেই আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয় সন্দেহ পোষণ করার আগে মানব ইতিহাসে ইসলামী জীবন বিধানের অবদান ও প্রভাবগুলো খতিয়ে দেখতে হবে।

এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুসলিম জাতি যখনই আল্লাহর বিধান মেনে চলেছে, আল্লাহর দ্বীনকে জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়িত করেছে, তখন আল্লাহ তায়ালাও নিজের ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং মুসলিম জাতিকে পৃথিবীর শাসন ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। আর যখনই সে আল্লাহর বিধানের বরখেলাপ করেছে তখনই তাকে পেছন সারিতে ঠেলে দেয়া হয়েছে, তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং শত্রুদের হাতে তাদের অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা এখনও বলবৎ রয়েছে। এ ওয়াদা বাস্তবায়নের পূর্বশর্তগুলোও সবার সামনে রয়েছে। কাজেই কেউ এ ওয়াদার বাস্তবায়ন চাইলে তাকে প্রথমে এর পূর্বশর্তগুলো পূরণ করে দেখাতে হবে। যদি এ শর্তগুলো পূরণ করা হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করবেন। কারণ, তাঁর চেয়ে বড়ো ওয়াদা রক্ষাকারী আর কে হতে পারে?

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান দুর্দশা ও তার কারণ

ইসলাম প্রচারকদের কথা ও কাজের অমিল বর্তমান সময়ের ইসলাম প্রিয় লোকদের জন্যে একটা বড় বিপদ। ইসলাম প্রচারকদের কাছে যখন ইসলামের কথা বলাটা জীবনের সাথে মিশে যাওয়া আদর্শ ও আকীদা না হয়ে নিছক পেশা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের কথা ও কাজে এবং কথা ও চিন্তায় আর সামঞ্জস্য থাকে না। তারা মুখে বলে ভালো কথা, কিন্তু কাজের বেলায় নিজেরা তা করে না। তারা মুখে বলে এক কথা, কিন্তু মনে ভাবে অন্য জিনিস। অন্য মানুষকে ভালো কাজ করার আহ্বান জানায় অথচ নিজেরা তা অবহেলা করে। স্বার্থের টানে আবার কখনো কখনো আল্লাহর বাণীকে বিকৃতও করে এবং অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন বাক্যের ঘোরানো পেঁচালো অর্থ করে আপন মতলব উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। কখনো কখনো এমন এমন আজগুবি ফতোয়া দেয়, যা হয় তো আল্লাহর ওহীর বাণীর সাথে বাহ্যত ও শাব্দিকভাবে মিল খায়, কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রাণসত্তার সাথে তা সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা তাদের নিছক মতলববাজি। সমাজে যারা সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কাছ থেকে হীন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশেই এরা এরূপ করে থাকে। ইহুদী ধর্মযাজকরাও এ বদভ্যাসে লিপ্ত ছিলো।

একজন প্রচারক যখন সৎকাজ করার জন্যে মানুষকে দাওয়াত দেয়, অথচ নিজে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন এটা সাধারণ মানুষের জন্যে মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা শুধু যে প্রচারককেই সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে তা নয়; বরং সেই সাথে তার প্রচারিত আদর্শের ব্যাপারেও তারা ঘোরতর দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এ বৈসাদৃশ্য তাদের মনে ও চিন্তাধারায় অস্থিরতা এবং দ্বিধা সংশয়ের জন্ম দেয়। কেননা তারা শোনে ভালো কথা অথচ বাস্তবে দেখে মন্দ কাজ কারবার। কাজ ও কথার এই ব্যবধান তাদের দিশাহারা করে ফেলে। প্রচারিত আদর্শ তাদের আত্মায় প্রেরণার আগুন জ্বালে এবং অন্তরে ঈমানের জ্যোতি উদ্দীপিত করে ঠিকই, কিন্তু পরক্ষণেই তা নিভে যায়। এর ফলে প্রচারকের ওপর তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়, সেই সাথে প্রচারিত আদর্শ বা ধর্মের ওপরও সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।

যে আদর্শের প্রতি আদর্শের প্রবক্তা ও প্রচারক সর্বান্তকরণে বিশ্বাসী হয় না, প্রচারকের জীবনে যদি সে আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন না ঘটে, তাহলে সে আদর্শের প্রচার যতো জাঁকজমকের সাথে ও সুরেলা গলায় করা হোক না কেন এবং যতো আবেগ উদ্দীপনা সহকারেই তা পেশ করা হোক না কেন, তা সাধারণ মানুষের কাছে নির্জীব ও প্রাণহীন থেকে যেতে বাধ্য। প্রচারক তার প্রচারিত আদর্শে আন্তরিকভাবে

বিশ্বাসী সাব্যস্ত হবে কেবল তখনই, যখন সে নিজে সেই আদর্শের জীবন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াতে পারবে, যখন তার কাজ ও চরিত্রে তার কথার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটবে। এরূপ হলেই মানুষ তার প্রতি আস্থাশীল এবং তার আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী হবে। এক্ষেত্রে আদর্শের প্রচারে যদি তেমন কোন লালিত্য ও চমক নাও থাকে, তাতেও কিছু আসে যায় না। আদর্শ তখন তার জীবন্ত বাস্তবতা থেকেই জীবনীশক্তি লাভ করবে এবং তার জ্বলন্ত সত্যতা তাকে সৌন্দর্য সুষমায় মন্ডিত করবে, তখন সুরেলা কণ্ঠ ও জাঁকজমকের কোনো প্রয়োজন হবে না। সেটা তখন একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। কেননা জীবন্ত ঈমান থেকেই তা উৎপন্ন।

এ কথা সত্য, কথা ও কাজের এবং আদর্শ ও চরিত্রের সাদৃশ্য সামঞ্জস্য অর্জিত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এটা অর্জন করতে প্রচুর চেষ্টা সাধনা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন আল্লাহর সাথে সুগভীর সংযোগ রক্ষা করা এবং তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও হেদায়াত প্রার্থনা করা। কেননা মানুষের নিত্যকার কর্মব্যস্ততা, কর্মক্ষেত্রের নানারকম বাধ্যবাধকতা ও বৈষয়িক প্রয়োজনের নিত্য-নতুন তাগিদ অনেক সময় মানুষকে বাস্তব জীবনে তার আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাস থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। যে নীতি ও বিধানের প্রতি সে অন্যদের ডাকে, নিজের জীবনে তার প্রতিফলনে অনেক সময় হয় তো অসমর্থ হয়ে পড়ে। ধ্বংসশীল মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যতো ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, মহাশক্তিধর চিরঞ্জীব সত্তার সাথে গভীর সম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত সে দুর্বল ও অক্ষমই রয়ে যায়। কেননা অন্যায় অসত্যের আগ্রাসী শক্তিসমূহ তার চেয়ে অনেক বড়ো ও পরাক্রমশালী। সে শক্তিগুলোকে সে কখনো কখনো পরাজিতও করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সহসা একটি দুর্বল মুহূর্তের পদস্খলনে হয় তো সে আবার পর্যুদস্ত হয়ে পড়তে পারে। ফলে তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সবই সে এক নিমিষে হারিয়ে বসতে পারে। সুতরাং সে যদি সকল শক্তিমানের ওপর যিনি পরাক্রান্ত, সেই চির অজেয় ও চির দুর্বার মাবুদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে এবং তার ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সে নিজের সকল দুর্বলতা, কামনা বাসনা, প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা জয় করতে এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে, যেসব শক্তিধর তাগুতেরা তাকে নিরন্তর চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, তাদেরও সে পরাজিত করতে সমর্থ হবে।

মুসলিম জাতির অস্তিত্বের জন্যে ঐক্যবদ্ধতার গুরুত্ব

যেসব মূলনীতির ওপর মুসলিম জামায়াতের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার অন্যতম প্রধান মূলনীতি হলো ঐক্যবদ্ধতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। লাখ লাখ বিচ্ছিন্ন ইসলামপ্রিয় মানুষেরও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে তেমন কোনো মূল্যই নেই। ইসলামী আন্দোলনকে সফলতার পর্যায়ে আনতে হলে ঐক্যবদ্ধতা অনিবার্য; বরং বলা যায় পূর্বশর্ত। তবে এই ঐক্যবদ্ধতা কোনো দুনিয়াবী স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না; বরং এই ঐক্যবদ্ধতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, যাতে করে আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা পৃথিবীতে চালু করা যায়। এ প্রসংগে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো– যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, আল্লাহ তায়ালা (তাঁর দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের একের জন্যে অপরের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন। অতপর (যুগ যুগান্তরের শত্রুতা ভুলে) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) আগুনে ভরা (গভীর) খাদের প্রান্তসীমায় (দাঁড়ানো)! সেই থেকে আল্লাহ তায়ালা (তাঁর রহমত দিয়ে) তোমাদের উদ্ধার করলেন। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)

এ হচ্ছে সেই ভ্রাতৃত্ব, যা তাকওয়া ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়, এটা ইসলামের প্রথম উৎস এবং তাওহীদের পর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর রশিকে মযবুত করে ধরা, অর্থাৎ তাঁর ওয়াদা, লক্ষ্য ও কাংখিত জীবনব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরা। অন্য কোনো ধ্যান-ধারণার ওপর এই জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না, এ উদ্দেশ্যও অর্জিত হয় না। অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের পথে কাজ করার মাধ্যমে, অথবা জাহেলী যুগে গড়ে ওঠা বহু প্রকার বন্ধনসূত্রের কোনো একটির মাধ্যমেও এ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে মযবুত করে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না' আল্লাহর রশিতে আবদ্ধ এই ভ্রাতৃত্ব একটি অতি বড়ো নেয়ামত, যা দ্বারা প্রথম যুগের মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালা এহসান প্রদর্শন করেছেন। যাদের আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন তাদের সবাইকেই তিনি এখানে তা স্মরণ করাচ্ছেন। স্মরণ করাচ্ছেন তাদেরকে জাহেলিয়াতের যমানার করুন অবস্থার কথা। তারা গোত্রপতি কর্তৃক শাসিত ছোটো ছোটো গোত্রে বিভক্ত ছিলো এবং অতি তুচ্ছ কারণে তারা প্রায়ই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে যেতো এবং তাদের পারস্পরিক এই শত্রুতা শত শত বছর ধরে চলতো। এভাবে তারা ছিলো পরস্পরের দুশমন।

এমনই দুশমনী মদীনায় অবস্থিত আওস ও খাযরাজ নামক দু'টি গোত্রের মধ্যেও বিরাজ করতো। এদের পড়শী ছিলো ইহুদীরা, যারা সদা-সর্বদা এদের মধ্যে শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত রাখার জন্যে তৎপরতা চালাতো, যার কারণে এদের পারস্পরিক বন্ধনের সম্ভাবনা পুরোপুরিভাবে ভেংগে গিয়েছিলো। এরই ফলে ইহুদীরা চমৎকার এক সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের উপস্থিতি ও মধ্যস্থতা ছাড়া ওদের কোনো কিছুই

বুঝি মীমাংসা হতো না এবং এই বদৌলতে ইহুদীরা ওদের এক অবিভাজ্য অংশ হয়ে গিয়েছিলো। অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন ওই দু'টি গোত্রের মধ্যে ইসলামের বন্ধনের উসিলায় ভালোবাসা ও মযবুত ভ্রাতৃত্ব দান করলেন, তখন ইহুদীরা প্রমাদ গুনতে লাগলো। এ সত্য মেনে না নিয়ে কোনো উপায় নেই যে, ইসলামের বন্ধন ছাড়া তাদের সে বৈরী মনোভাব, পারস্পরিক বিদ্বেষ বদলে গিয়ে একটি বন্ধু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। আর এটাই ছিলো (ইসলামরূপী) আল্লাহর রশি, যার দ্বারা বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলো পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং একে অপরের ভাইতে পরিণত হয়েছিলো। সেসব বিচ্ছিন্ন অন্তরগুলো জুড়ে দেয়ার কাজ আল্লাহর মহব্বতে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই সম্ভব ছিলো না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এই ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির কারণে বংশ পরম্পরায় গড়ে ওঠা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, অপরের ক্ষতি করে নিজে বড়ো হওয়ার মনোভাব, গোত্রীয় প্রাধান্য হাসিল করার প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা এবং বর্ণ-বৈষম্যের মাদকতা সবই তখন তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগলো এবং সুমহান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার পতাকাতলে সমবেত হয়ে তারা এক জাতিতে পরিণত হয়ে গেলো। তাই একথা স্মরণ করাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا

'স্মরণ করো তোমাদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামতের কথা, যখন তোমরা ছিলো পরস্পর শত্রু, অতপর তোমাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ তায়ালা জুড়ে দিলেন, অতপর তাঁর নেয়ামতলাভে তোমরা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে গেলে।' (আলে ইমরান, ১০৩)

এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তাঁর আর একটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে উল্লেখ করছেন যে, তাদের চিন্তা করা দরকার, কেমন করে জাহান্নামের আগুনে পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদের বাঁচিয়ে দিলেন। হেদায়াতের আলো দিয়ে সে ধ্বংস থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ তায়ালা ও দ্বীন ইসলামের রশিতে বেঁধে তাদের এক জামায়াতে পরিণত করে দিলেন। মুসলমানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব একতাবন্ধন গড়ে উঠেছিলো এবং তাদের অন্তরে পারস্পরিক মহব্বত স্থাপিত হয়েছিলো, যার ফলে তারা ভাই-ভাইয়ে পরিণত হয়ে গেলো। এরপর আল্লাহ তাঁর দ্বিতীয় নেয়ামতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি স্মরণ করাচ্ছেন–

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا

'আর তোমরা আগুনভরা গর্তের একেবারে কিনারায় উপনীত হয়ে গিয়েছিলে, যেখান থেকে তিনি তোমাদের বাঁচিয়ে আনলেন'। (আলে ইমরান, ১০৩)

কোরআনের বর্ণনাধারা মানুষের অনুভূতি ও সম্পর্ক বৃদ্ধির চেতনাকে জাগিয়ে দিতে চায়। অন্তরের মধ্যে এর কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোরআন 'ফাআল্লাফা বাইনাকুম' (অর্থাৎ তোমাদরকে জুড়ে দিয়েছেন) বলছে না; বরং অন্তরের গভীরে তীব্রভাবে রেখাপাত করানোর জন্যে কোরআনে করীম বলছে, 'ফাআল্লাফা বাইনা কুলূবেকুম' (অর্থাৎ তোমাদের অন্তরগুলোকে জুড়ে দিয়েছেন)। অপর কথায়, তোমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে মহব্বত পয়দা করে দিয়েছেন। এর ফলে আল্লাহ পাকের নিজ রহমতের হাত দ্বারা এবং তাঁর ওয়াদা অনুসারে মুসলমানদের অন্তরসমূহ পারস্পরিক মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থার চিত্র কোরআনে করীমে এমন নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে। দৃশ্য পাঠকের অন্তরকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। দেখুন, কোরআন পাকের বর্ণনাভংগি

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

'আর তোমরা (এমনভাবে) আগুনের গর্তের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলে যেন মনে হচ্ছিলো, তোমরা যে কোনো মুহূর্তে আগুনের মধ্যে পড়ে যাবে যাবে'। (আলে ইমরান, ১০৩)

এমনই এক কঠিন মুহূর্তে অন্তরসমূহ অনুভব করে, অকস্মাৎ আল্লাহর অদৃশ্য হাত এসে যেন সজোরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে! আল্লাহর রশি সম্প্রসারিত হয়ে এগিয়ে এসে যেন তাদের সে মৃত্যুগহ্বর থেকে উঠিয়ে নিচ্ছে। সে বিপজ্জনক অবস্থার দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থেকে পাঠক যেন দেখতে পাচ্ছে, বিপদ মুক্তি ও সফলতার মনোহারী এ অপূর্ব দৃশ্য! গতিশীল ও জীবন্ত এ দৃশ্য অবলোকনে আবেগ-বিহ্বল অন্তরসমূহ দুরু দুরু করে কেঁপে উঠছে, নাড়ির স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে এবং অজান্তেই তার নয়নসমূহে আনন্দাশ্রুর বান নামছে।

ইবনে ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতে ইবনে হিশামে' এবং তাঁর প্রণীত অন্যান্য আরো কয়েকটি গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এক ইহুদী ব্যক্তি আওস ও খাযরাজদের এক সমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। এ সময় উক্ত গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক মহব্বত ও একতার দৃশ্য তার কাছে অসহনীয় লাগে। অতপর সে হীন চক্রান্তের উদ্দেশে ওদের সমাবেশে শরীক হওয়ার জন্যে এক ব্যক্তিকে পাঠায়। লোকটি এসে তাদের কথোপকথনে যোগ দেয় এবং সুযোগমতো এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে অতীতে সংঘটিত 'বুআস' যুদ্ধের তিক্ত ইতিহাস তুলে ধরে বিদ্বেষ ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর তার এই হিংসাত্মক ষড়যন্ত্র অবশেষে সফল হয় এবং উক্ত গোত্রদ্বয়ের মধ্যে জাহেলী যুগের প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। ফলে তাদের নিভে যাওয়া আক্রোশের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়। তাদের ক্রোধাগ্নির শিখা উস্কিয়ে দেয়ার জন্যে তারা স্ব স্ব মর্যাদা উদ্দীপক বিভিন্ন ধ্বনি তুলতে থাকে, উভয়পক্ষ

হাতিয়ার তুলে নেয়ার উপক্রম করে এবং 'হাররা' নামক ময়দানে মোকাবেলা করার জন্যে একে অপরকে আহ্বানও জানায়। ঘটনাটি নবী করীম (স.)-এর গোচরীভূত হলে তিনি সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত হন এবং অবস্থার নাযুকতা যথাযথভাবে অনুভব করেন। তিনি তাদের শান্ত করতে গিয়ে বলেন, 'কী আশ্চর্য, আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তোমরা জাহেলী যুগের মতো পরস্পরে শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানানো শুরু করেছো।' এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুরু করেন। আল্লাহর মেহেরবানী, কোরআনের সম্মোহনী শক্তি স্বীয় প্রভাব দেখাতে সক্ষম হয় এবং সাথে সাথে তাদের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হাতিয়ার ফেলে দেয় এবং ভীষণ লজ্জিত হয়ে যায়। তারপর প্রশান্ত বদনে এগিয়ে এসে গভীর মহব্বতের আবেগে তারা পরস্পর আলিংগনাবদ্ধ হয়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা ও নবী রসূলদের দুশমন ইহুদীদের চক্রান্ত চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যার ফলে তারা সঠিক পথ অবলম্বন করে এবং আয়াতের শেষভাগে আল্লাহর উল্লেখিত কথাগুলো কার্যকরি হয়। এরশাদ হচ্ছে–

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

'এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন যেন তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও।' (আলে ইমরান, ১০৩)

এ হচ্ছে মহব্বতের রশিতে বাঁধা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশে রচিত ইসলামের জঘন্য দুশমন ইহুদীদের হীন চক্রান্তের কদাকার দৃশ্য। আলহামদু লিল্লাহ, তৎকালীন মুসলমানরা ইসলামী ব্যবস্থার ওপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়েছিলো এবং এরই ফলে তারা বিশ্ব মানবতাকে সঠিক সফলতার পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলো। ইহুদীদের এই মারাত্মক চক্রান্ত মুসলমানদের একতা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে আজও সমভাবে ক্রিয়াশীল এবং তখনই তারা তাদের চক্রান্তের থাবা বিস্তার করার জন্যে অস্থির হয়ে যায়, যখন তারা মুসলমানদের আল্লাহর ব্যবস্থার ওপর একত্রিত হতে দেখে। বিশেষ করে তারা যখন দেখে মুসলমানরা আল্লাহর রশি মযবুতভাবে ধারণ করেছে।

বিচ্ছিন্নতা হলো সেই কুফলগুলোর একটি যা আহলে কেতাবদের অন্ধ অনুকরণ করার কারণে মুসলমানদের মাঝে মাঝে ভোগ করতে হয়েছে। এই চক্রান্ত অতীতেও যেমন হয়েছে, এখনও তেমন চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। আহলে কেতাবরা মুসলমানদের একের বিরুদ্ধে অন্যকে এমনভাবে উস্কিয়েছে যে, তারা পরস্পরকে হত্যা করার উদ্দেশে অস্ত্র পর্যন্ত হাতে তুলে নিয়েছে এবং এভাবে আল্লাহ পাকের সেই মযবুত রশি তারা ছিঁড়ে ফেলেছে, যা তাদের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে এক জামায়াতে পরিণত করেছিলো।

এ কথাগুলো দ্বারা পূর্বে বর্ণিত আয়াতগুলোর সাথে বর্তমান আয়াতের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা উল্লেখিত ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আরো অনেক বেশী ব্যাপক। আয়াতটিতে ইহুদী জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের পরিকল্পিত হীন কার্যকলাপের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

মদীনার তৎকালীন অবস্থায় মুসলমানদের দলে ভাংগন সৃষ্টি করার জন্যে ইহুদীরা নিরন্তর চেষ্টা জারি রেখেছে। সর্বতোভাবে তারা চেয়েছে যেন মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃংখলা লেগে থাকে। এ কারণেই কোরআন করীম তাদের অনুসরণ করা, তাদের কথায় কান দেয়া এবং তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুসলমানদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছে। বিশেষ করে মদীনার ইহুদীরাই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে সব থেকে বেশী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। মদীনার মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, সন্দেহ ও পেরেশানীর বীজ বপন করাই ছিলো ইহুদীদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। মূলত সকল যমানাতেই তাদের এ চক্রান্ত সমভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। মুসলমানদের সারির সবখানেই তাদের এ জঘন্য কাজ আজ যেমন চালু আছে– আগামীতেও তেমনি থাকবে।

এখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর কর্তব্য হবে ইহুদী ও খৃস্টানদের এই দ্বিমুখী আক্রমণের মোকাবেলায় নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। তাদের অবশ্য করণীয় এ কাজটির লক্ষ্য হবে পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা চালু করা এবং মিথ্যার ওপর সত্যকে বিজয়ী করার জন্যে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, মানবসমাজে সুপরিচিত ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়-অপ্রিয় ও অশান্তির কাজগুলোর পথ রোধ করা এবং মন্দের ওপর ভালোর বিজয় কেতন উড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

আল কোরআনের অসংখ্য আয়াতে মোমেনদের ঐক্যবদ্ধতা প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা এই ঐক্যবদ্ধতা তো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে অপরিহার্য উপাদান। ঐক্যবদ্ধতা না থাকলে তো তারা তাদের দায়িত্ব পালনই করতে পারবে না। তাই এ পর্যায়ে মুসলিম জামায়াতকে পুনরায় স্মরণ করানো হচ্ছে এবং সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, যেন তারা কারো ফাঁদে পা না দেয় এবং সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। তাদের আবারও সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, যেন তারা পথভ্রষ্ট কেতাবধারী ব্যক্তিদের মতো না হয়ে যায়, যাদের তাদের পূর্বে এক পবিত্র আমানত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা রক্ষা না করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নানা প্রকার মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের থেকে আল্লাহ তায়ালা নেতৃত্বের পতাকা কেড়ে নেন এবং ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম জামায়াতের হাতে সে পতাকা অর্পণ করেন। সর্বোপরি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে পরকাল, যেদিন কিছুসংখ্যক চেহারা থাকবে আনন্দের উজ্জ্বলতায় শুভ্র সমুজ্জ্বল আর কিছু চেহারা থাকবে কালো-কুশ্রী-কদাকার। মোমেনদের প্রতি আল্লাহর এরশাদ–

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۗ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ - وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

'তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এ ধরনের মানুষদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। (কেয়ামতের) দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা আলোয় ঝলমল করবে, (আবার) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (ও বিশ্রী) হয়ে পড়বে। যাদের মুখ (সেদিন) কালো হয়ে যাবে (জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে), ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? (হাঁ,) নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে) এই আযাব ভোগ করতে থাকো! আর যাদের চেহারা আলোকিত হবে, তারা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত দয়ার আশ্রয়ে থাকবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।' (আলে ইমরান, ১০৫-১০৭)

এখানে কোরআন করীমের মধ্যে উল্লেখিত বিভিন্ন দৃশ্যের একটি উজ্জ্বল, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দৃশ্য ফুটে উঠেছে, কিন্তু আমাদের কাছে সে দৃশ্যটি এতো ভয়ানক যে, তা কোনো ভাষায় বর্ণনা করা বা তার বৈশিষ্ট্যের চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। তবে মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে দৃশ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে। এ অবস্থাগুলো শুভ্র আলোর আভায় প্রদীপ্ত। যেদিন এক শ্রেণীর মানুষ এতো সুন্দর এবং এতো খুশী থাকবে, আর এক শ্রেণীর মানুষ দুঃখভারে ভারাক্রান্ত থাকবে, তাদের চেহারাগুলো জরাজীর্ণ ও ধূলিধূসরিত হবে, তারা ভীষণ কষ্টের জ্বালায় কালো-কুশ্রী-কদাকার হয়ে যাবে এবং এ অবস্থা থেকে তারা কোনোদিনই মুক্তি লাভ করতে পারবে না, তাদের জন্যে সদা-সর্বদা তিরস্কার ও অভিশাপের দংশন-জ্বালা থাকবে। তাদের বলা হবে—

اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

'ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? (হাঁ) নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে) এ আযাব ভোগ করতে থাকো!।' (আলে ইমরান, ১০৬)

এভাবে সেদিনের এ দৃশ্য জীবনস্পন্দনে সচল হবে। কোরআন এই কথা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে। এভাবেই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ও মতভেদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। সাথে

সাথে মুসলমানদের মধ্যে ঈমান এবং ভ্রাতৃসম সম্পর্ক থাকা যে আল্লাহর এক মহা-নেয়ামত, সে কথাও তাদের বলা হয়েছে।

এমনি করেই কেতাবধারী জাতির পরিণতি মুসলমানরা যেন বাস্তবে দেখতে পায়। কারণ, ওদের প্রত্যাবর্তনস্থলে যে বেদনাদায়ক ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তাতে মুসলমানরা যেন শরীক না হয়, তার জন্যে তাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوۡهٌ وَّتَسۡوَدُّ وُجُوۡهٌ

'(কেয়ামতের) দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা আলোয় ঝলমল করবে, (আবার) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (ও বিশ্রী) হয়ে পড়বে।' (আলে ইমরান, ১০৬)

এ বিবরণ দান করার পর দু'টি দলের পরিণতি সম্পর্কে এ বৃহৎ সূরার মধ্যে ব্যাপক আলোচনা পাওয়া যায়। যে তথ্য এ সূরার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে তা-ই ওহী ও রেসালাতের যথার্থতার প্রমাণ দেয় এবং এ কথা বুঝতে সাহায্য করে যে, কেয়ামতের দিন প্রতিদান ও হিসাব গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। সূরাটি এ কথাও জানিয়ে দেয়, দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানে তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়াই হচ্ছে ইনসাফের দাবী। আল্লাহর একক মালিকানা আকাশমন্ডলী ও গোটা পৃথিবী জুড়ে পরিব্যপ্ত রয়েছে এবং সকল অবস্থাতেই সব কিছু তাঁর কাছে ফিরে যাবে। আল্লাহর বাণী–

تِلۡكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتۡلُوۡهَا عَلَيۡكَ بِالۡحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيۡدُ ظُلۡمًا لِّلۡعٰلَمِيۡنَ – وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرۡجَعُ الۡاُمُوۡرُ

'এর সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর আয়াত, যথাযথভাবে আমি সেগুলোকে তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি; কেননা আল্লাহ তায়ালা (তাঁর আয়াতসমূহ গোপন রেখে এবং পরে সে জন্যে শাস্তির বিধান করে) দুনিয়াবাসীদের ওপর কোনো যুলুম করতে চান না; (মূলত) আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্যে, সব কিছুকে একদিন আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে।' (আলে ইমরান, ১০৮-১০৯)

অর্থাৎ তাঁর কাছে গিয়েই সকল কিছুর চূড়ান্ত বিচার-ফয়সালা হবে।

সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতাকে বুঝানোর জন্যে আদিগন্তব্যাপী যে চিত্রগুলো দেখা যাচ্ছে, সত্যের যে নিদর্শনগুলো গোটা ভুবন জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তাই পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহর হুকুমে দিবা-রাত্রি ঘটে চলেছে। আল্লাহকে জানার জন্যে এসব কিছুকে তিনি মাধ্যম বলে আখ্যা দিয়েছেন। বলছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিদর্শনগুলো এবং স্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাঁর বান্দার জ্ঞান লাভের সহায়ক হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন–

تِلۡكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتۡلُوۡهَا عَلَيۡكَ بِالۡحَقِّ

'এর সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর আয়াত, যথাযথভাবে আমি সেগুলো তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি।' (আলে ইমরান, ১০৮)

সে চিত্রগুলো এমন সত্য, এমন সঠিক যে, এর মধ্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এগুলো এমন সত্য যা মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল ও প্রতিদান সম্পর্কে তাকে সঠিক কথা জানিয়ে দেয়। এগুলো তাঁর কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে, যিনি নাযিল করার একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর সঠিক মূল্যায়ন করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই নিবদ্ধ। সবার গন্তব্যস্থল ঠিক করে দেয়া এবং কার প্রতিদান কি হবে তা স্থির করা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার কাজ। বান্দার ওপর যুলুম হতে থাকবে, আল্লাহ্ তায়ালা কিছুতেই তা বরদাশত করতে রাযি নন। তিনি নিজেই হুকুমদাতা, নিজেই সুবিচারক এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের মালিকও একমাত্র তিনি। অবশ্য ভালো-মন্দ সকল কাজের প্রতিদানের ব্যবস্থা এমনভাবে তিনি করেন যাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সুবিচারের ব্যবস্থা চালু হয়, সর্বোপরি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান মর্যাদা উপযোগী ব্যবস্থাপনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আহলে কেতাবদের দাবী, তাদের সুনির্দিষ্ট সামান্য কিছুদিন ব্যতীত স্থায়ীভাবে কোনো আগুন স্পর্শ করবে না, এটা কখনও হবার নয়।

সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামকে সাজানো

কোরআন করীমের অসংখ্য আয়াতে অতীতের অনেক ঈমানী কাফেলার বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারকার্যে নিয়োজিতদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও পথনির্দেশ তুলে ধরা হয়েছে। আমি এখানে সংক্ষেপে তার কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চাই। বস্তুত সকল রসূলকে যে দাওয়াত ও মূলনীতি দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যা কিছু শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা কোনো নির্দিষ্ট যুগ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল যুগের ও সকল প্রজন্মের দাওয়াতদাতাদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। উপরন্তু তা ইসলামের দাওয়াতের এমন একটা পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, যা সর্বকালের ও সকল অঞ্চলের লোকদের জন্যে উপযোগী। এ সকল দিক সবিস্তার তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় এর প্রধান প্রধান দিকগুলো এখানে আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

আল্লাহর দিকে আহবান জানানোর পথটা বড়োই বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। এ পথটা অবাঞ্ছিত সব বাধাবিঘ্নে পরিপূর্ণ। যদিও সত্যের জন্যে আল্লাহর সাহায্য আসা সন্দেহাতীত ও অবধারিত, কিন্তু এ সাহায্য আল্লাহর নির্ধারিত সময়েই আসবে। নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারেই তিনি সাহায্যের সময় নির্ধারণ করে থাকেন। সে সময়টা সবার অজ্ঞাত। এমনকি রসূলও জানেন না কখন সাহায্য আসবে। এ পথের দুঃখ কষ্টের মূল কারণ দুটো। প্রথমত উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান, যা দাওয়াতের প্রাথমিক স্তরে দেখা যায় এবং দাওয়াতদাতাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ ও অত্যাচার। দ্বিতীয়ত দ্বীনের পথে আহবানকারীর মনে মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করার তীব্র আকাংখা আগ্রহ। এ আকাংখা আগ্রহ স্বাভাবিক ও মানবোচিত। কেননা 'দায়ী'– আল্লাহর দিকে

আহবানকারী নিজে ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করে জেনেছে, তা কতো হৃদয়গ্রাহী। এ জন্যে ইসলামের সাথে তার তীব্র আবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা প্রচারের জন্যে সে অতিমাত্রায় উৎসুক হয়। এই তীব্র প্রচারাকাংখা শত্রুদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা, প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ ও অত্যাচার নিপীড়নের চেয়ে কম কষ্টদায়ক নয়। এর সবগুলোই ইসলামের দাওয়াতের পথে কষ্টদায়ক বাধা।

কোরআন জানাচ্ছে, যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা তার দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারা নিশ্চিতভাবেই জানে, তাদের যে দাওয়াত দেয়া হয়, তা অকাট্য সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এ আহবান সত্য ও আহবানকারীরা সত্যবাদী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে না; বরং ক্রমাগত অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। কারণ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করায় তাদের আপাত কিছু বৈষয়িক স্বার্থ রয়েছে। যে সত্যের দিকে 'দায়ী'রা আহবান জানান, তার সত্যতার প্রমাণ তার সাথেই রয়েছে। এ সত্য প্রতিটি মানুষের স্বভাব প্রকৃতি তথা তার সহজাত বিবেক বুদ্ধিকে সম্বোধন করে। এ বিবেক বুদ্ধি যখন জীবন্ত থাকে এবং তার যাবতীয় অনুভূতি শক্তি ও উপলব্ধির যন্ত্রগুলো কার্যকর থাকে, তখন তা এ দাওয়াত গ্রহণ করে। নিম্নের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একথাই বলেন–

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ – وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'যারা (এ কথাগুলো) যথাযথভাবে শোনে, তারা অবশ্যই (আল্লাহর) ডাকে সাড়া দেয়, যারা মরে গেছে আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেও কবর থেকে উঠিয়ে (জড়ো করে) নেবেন, অতপর সেই মহা বিচারের জন্যে তারা সবাই তাঁর সামনে প্রত্যাবর্তিত হবে। এরা বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর (নবীর) ওপর (আমাদের কথামতো) কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন, (হে রসূল!) তুমি তাদের বলো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের নিদর্শন পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু (সত্য কথা হচ্ছে) এদের অধিকাংশ লোকই কিছু জানে না।' (আল আনয়াম, ৩৬-৩৭)

মৃতদের ও বধিরদের জোরপূর্বক দাওয়াত শোনানোর ব্যবস্থা করা রসূলের কোনো দায়িত্ব নয় এবং তা করতে তিনি সমর্থও নন। মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করা দাওয়াতদাতার কাজ নয়; বরং আল্লাহর কাজ। এ হলো একটা দিক। অপর দিকটি হচ্ছে, আল্লাহর সাহায্যের আগমন নিসন্দেহে অবধারিত। কেবল আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নীতি অনুসারে তা আসবে এই যা। আল্লাহর সাহায্যের নীতিকে আমাদের ইচ্ছামতো ত্বরান্বিত করা এবং তা পাল্টানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সাহায্যের নির্ধারিত সময়কেও হেরফের করা সম্ভব নয়। দাওয়াতদাতা যদি রসূলও হন এবং তাকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতন করা হতে থাকে, তাহলেও আল্লাহ তায়ালা সাহায্যদান

ত্বরান্বিত করেন না। কেননা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাহায্য বিলম্বিত করার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা দায়ীদের কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা, সকল নির্যাতন স্থিরভাবে ও অকুতোভয়ে বরদাশত করা এবং আখেরাতের প্রতিদানে অবিচল বিশ্বাস রাখা প্রত্যাশা করেন।

এ আয়াতগুলো থেকে এও জানা যায়, ইসলামের ব্যাপারে রসূল (স.) ও তাঁর পরবর্তী দাওয়াতদাতাদের কর্তব্য কী। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া, কিন্তু মানুষের হেদায়াতলাভ নিশ্চিত করা ও বিপথগামিতা ঠেকানো তার কোনো দায়িত্ব নয়। সেটা তার ক্ষমতার আয়ত্তাধীনও নয়। হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর শাশ্বত রীতিনীতি অনুসারেই হয়ে থাকে। এতে কোনো রদবদল হয় না। এমনকি খোদ আল্লাহর রসূলও যাকে ভালোবাসেন, তাকে হেদায়াত করা তাঁর প্রবল আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ানো সত্ত্বেও তা আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেনি, যেমন পারে না রসূলের শত্রুদের প্রতি তার বিরক্তি। বস্তুত এ ক্ষেত্রে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিসত্তার কোনো গুরুত্ব নেই। কতোজন লোক হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো, তিনি তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য কতোটা পালন করতে পেরেছেন, কতোটা ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং কতোটা আল্লাহর আনুগত্য ও আদর্শের ওপর অবিচলতা বজায় রেখেছেন। এরপর জনগণের সব কিছু মহান আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। জনগণের মালিক ও প্রতিপালক তো একমাত্র তিনিই।

'তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক সোজা পথে পরিচালিত করেন।'.....

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

'তিনি যদি চাইতেন, তবে সবাইকে হেদায়াতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করে দিতেন, অতএব তুমি কখনো (জেনে বুঝে) জাহেল মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'..... (আল আনয়াম, ৩৫)

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ

'একমাত্র তারাই দাওয়াত গ্রহণ করে যারা তা শ্রবণ করে।' (আল আনয়াম, ৩৬)

এ জন্যে ইসলামের দিকে আহবানকারীর পক্ষে জাহেলী সমাজের কোনো দল গোত্রের পরামর্শ ও প্রস্তাব মেনে নিয়ে দাওয়াতের কার্যক্রমকে ইসলামী নীতিমালার আওতা বহির্ভূত করা কিংবা তাদের ইচ্ছা ও খায়েশ মোতাবেক ইসলামকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা সমীচীন নয়। কোরআন একাধিক জায়গায় বলেছে, মোশরেকরা তাদের যুগের প্রচলিত রীতিপ্রথা এবং তাদের বোধশক্তির মান অনুযায়ী অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানোর দাবী জানিয়েছিলো। এ জায়গাগুলোর মধ্যে কয়েকটা তো রয়েছে চলতি সূরায় এবং বাদ বাকীগুলো রয়েছে অন্যান্য সূরায়। যেমন—

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

. 'তারা বলে, তার ওপর তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?'.... (আল আনয়াম, ৩৭)

তারা সর্বাত্মকভাবে শপথ করে, তাদের কাছে কোনো নিদর্শন এলে তারা অবশ্যই তার ওপর ঈমান আনবে। অন্যান্য সূরায় তাদের আরো বিস্ময়কর কথাবার্তা দেখতে পাওয়া যায়, যেমন রয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলে। এরশাদ হচ্ছে–

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا اَوْتُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْتَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا- اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوتَرْقٰى فِى السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ

'তারা বললো, তোমার ওপর আমরা ততোক্ষণ ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে মাটির মধ্য থেকে একটা ঝর্ণা বের করে দেবে, অথবা তোমার একটা খেজুর ও আংগুরের বাগান হবে, যার ভেতরে তুমি খাল-নালা ছড়িয়ে দেবে, অথবা তোমার দাবী মোতাবেক আকাশকে আমাদের মাথার ওপর খান খান করে ভেংগে ফেলে দেবে, অথবা আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদের এনে আমাদের সকলের মুখোমুখি দাড় করাবে, অথবা তোমার একটা বিলাসবহুল প্রাসাদ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে অতপর তুমি যতোক্ষণ সেখান থেকে আমাদের ওপর একখানা বই নামিয়ে না দেবে, যা আমরা পড়তে পারি, ততোক্ষণ তোমার আকাশে আরোহণকেও আমরা বিশ্বাস করবো না।' (বনী ইসরাঈল, ৯০-৯৩)

সূরা ফোরকানে বলা হয়েছে,

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا - اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

'তারা বলে, এ কেমন রসূল, যে খাদ্য খায় এবং বাজারে ঘুরে বেড়ায়? তার ওপর যদি একজন ফেরেশতা নামানো হতো এবং সে তার সাথে সতর্ককারী হয়ে চলতো, অথবা তাকে একটা অর্থভান্ডার দেয়া হতো কিংবা তার একটা ফলের বাগান থাকতো, যা থেকে সে খেতো, তবে তো খুবই ভালো হতো এবং যালেমরা (মুসলমানদের) বলে, তোমরা তো আসলে একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।' (আল ফোরকান)

সূরা আনয়ামে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.) ও অন্যান্য মোমেনদের সরাসরি নিষেধ করেছেন কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী জানাতে। রসূল (স.)-কে বলা হয়েছে–

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاۤءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

'যদি তাদের এ অবাধ্যতা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ তালাশ করো; কিংবা আসমানে সিঁড়ি লাগিয়ে (সেখানে চলে যাও) অতপর (সেখান থেকে) তাদের জন্যে কোনো কিছু একটা নিদর্শন নিয়ে এসো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর জড়ো করে দিতে পারতেন, তুমি কখনো (জেনে-বুঝে) মূর্খ লোকদের দলে শামিল হয়ো না।' (আল আনয়াম, ৩৫)

'একটা অলৌকিক নিদর্শন দেখালেই আমরা অবশ্য অবশ্য ঈমান আনবো'– বলে মোশরেকরা কসম খাওয়ায় যে সকল মুসলমান মোশরেকদের ওই দাবীটা পূরণ করার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে, তাদের বলা হয়েছে, বলে দাও, অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর ওইসব নিদর্শন যখন আসবে, তখনও যে তারা ঈমান আনবে না, সেটা তোমরা কিভাবে জানবে? প্রথম বারে ঈমান না আনার কারণে আমি তাদের মন ও চোখকে ঘুরিয়ে দেবো এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেবো। এ কথা বলার উদ্দেশ্য প্রথমত, তাদের এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, যারা ইসলামের দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রত্যাখ্যান করছে, তারা কোনো যুক্তি প্রমাণ বা নিদর্শনের অভাবে প্রত্যাখ্যান করছে তা নয়; বরং তাদের প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ হলো, তাদের শ্রবণশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, তারা নির্জীব হয়ে গেছে এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর যে চিরাচরিত নীতি ও বিধান রয়েছে, সে অনুসারে তাদের জন্যে হোদায়াত বরাদ্দ করা হয়নি। এর আরো একটা উদ্দেশ্য হলো, তাদের এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, ইসলাম একটা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়মে চলে এবং তা মানুষের খেয়াল খুশীর উর্ধ্বে।

এ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, কোরআনের নির্দেশের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে, কোনো বিশেষ ঘটনার সাথে এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাবের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। কেননা সময় এবং মানুষের ইচ্ছা আকাংখা ও খেয়াল খুশী অনবরতই পরিবর্তনশীল। যারা আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবে, তাদের এতোটা ব্যক্তিত্বহীন হওয়া চাই না যে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত শক্তি কিংবা কোনো মানুষের খেয়াল খুশী অনুসারে তারা চলতে থাকবে। মানুষের খেয়াল খুশী ও পরামর্শ অনুসারে চলার বাতিক ইদানীং ইসলামের দাওয়াতদাতাদের অনেককে এমনভাবে

পেয়ে বসেছে যে, তারা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে বিকৃত করে পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্যান্য অসংখ্য ছোটো খাটো ধর্মমতের মতো একটা কাগুজে মতবাদে পরিণত করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে বহু কাগুজে মতবাদ বিভিন্ন সময়ে রচিত হতে দেখা যায়। একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা যায়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে পরস্পর বিরোধী ধ্যান ধারণার সমষ্টিতে পরিণত হয়ে গেছে। সাময়িক প্রভাব বিস্তারকারী ওই সকল কাগুজে মতবাদগুলো দেখে ইসলামের দাওয়াতদাতাদেরও কেউ কেউ ইসলামী জীবন বিধানকে একটা কাগুজে শাসন ব্যবস্থা বা কাগুজে আইন ব্যবস্থায় পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ সব কাগুজে ব্যবস্থায় আধুনিক জাহেলিয়াতের সেসব বিধি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই। কেননা এ জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা বলে থাকে, ইসলাম হলো শুধু একটা আকীদা-বিশ্বাসের নাম এবং জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। এ সব বিধি ব্যবস্থার ধারক বাহকরা নিজেদের জীবনে জাহেলী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে, আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহবিমুখ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে ধর্না দিচ্ছে এবং আল্লাহর বিধানের কাছ থেকে বিচার ফয়সালা গ্রহণ করছে না। এ সব কাজকর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ধিক্কারযোগ্য। মানুষের সদা পরিবর্তনশীল মনগড়া মতাদর্শসমূহের কাছে নতি স্বীকার করে এ সব চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া এবং একে 'আল্লাহর পথে দাওয়াতদানের সময়োপযোগী পদ্ধতি' নামকরণ করা কোনো মুসলমানের পক্ষেই সমীচীন নয়।

এর চেয়েও নিকৃষ্ট তৎপরতায় নিয়োজিত রয়েছে আর এক শ্রেণীর মানুষ, যারা ইসলামের ওপর 'সমাজতন্ত্র' ও 'গণতন্ত্র' প্রভৃতি নামের পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে। তারা মনে করে, এ দ্বারা তারা ইসলামের সেবা করছে। সমাজতন্ত্র হচ্ছে মানবরচিত একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, যা ভুল ও নির্ভুল এবং ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের উপাদানের সমষ্টি। আর 'গণতন্ত্র' হচ্ছে একই ধরনের একটা মানবরচিত শাসনব্যবস্থা বা রাজনৈতিক মতবাদ। মানুষের তৈরী অন্য যে কোনো মতবাদের মতো গণতন্ত্রেও ভুল ও নির্ভুল উভয় রকমের উপাদান রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে একটা পূর্ণাংগ, সুস্থির, অপরিবর্তনশীল ও শাশ্বত আকীদা বিশ্বাস ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। যার রয়েছে নিজস্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রয়েছে সামাজিক শৃংখলা রক্ষা ও প্রশাসন পরিচালনার জন্যে অবকাঠামোগত স্বতন্ত্র পদ্ধতি। এ ব্যবস্থা যেহেতু আল্লাহর তৈরী, তাই এটা সব রকমের দোষক্রটিমুক্ত। আল্লাহর এই নিখুঁত নির্ভুল জীবন বিধানকে যে ব্যক্তি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার অভিপ্রায়ে মানুষের বানানো রীতিনীতি বা মতবাদের দ্বারা মিশ্রিত করে, কিংবা মানুষের কিছু কথা ও ধ্যান ধারণা দ্বারা মিশ্রিত করার জন্যে অন্য মানুষদের সাহায্য কামনা করে, ইসলামের সাথে তার কিসের সম্পর্ক? আরবের জাহেলী যুগে মোশরেকরা যেসব শেরক করতো, তা তো আল্লাহর কতক সৃষ্টিকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করেই করতো, তারা তো আল্লাহকে অস্বীকার করতো না। তাদের তারা আল্লাহর কাছে পৌছানোর একটা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতো। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

'যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা তো কেবল এজন্যেই ওদের উপাসনা করি যেন ওরা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।' (আঝ ঝুমার, ৩)

এটাই শেরেক। এখন যারা আল্লাহর বান্দাদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করছে তারা যদিও সরাসরি তাদের আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করে না, কিন্তু তারা বান্দাদের রচিত কোনো মতবাদ বা ব্যবস্থাকে আল্লাহর বিধানের সাথে মিশ্রিত করে আল্লাহর বান্দাদের তাঁর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করার চেয়ে আরো ঘৃণ্য কাজ করছে।

বস্তুত ইসলাম ইসলামই। সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রই। গণতন্ত্র গণতন্ত্রই। ইসলাম আল্লাহর বিধান। এর আর কোনো শিরোনাম নেই এবং আর কোনো বিশেষণ নেই। আল্লাহ তায়ালা এর যে একমাত্র শিরোনাম ও বিশেষণ নির্ধারণ করেছেন, তা হচ্ছে ইসলাম। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র হচ্ছে মানবরচিত ব্যবস্থা। এগুলো মানুষেরই অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত। এগুলো যখন কেউ গ্রহণ করতে চায়, তখন তার এগুলোকে মানবরচিত মতবাদ হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। যারা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের মহান কাজে নিয়োজিত, তাদের উচিত আল্লাহর দ্বীন প্রচারে নিজেদের আল্লাহর নির্ধারিত নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। প্রচলিত নিত্য পরিবর্তনশীল কোনো মানবরচিত মতবাদের হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে তা গ্রহণ করা এবং সেটাকে 'ইসলামের খেদমত' মনে করা তাদের পক্ষে সমীচীন নয়।

যাদের কাছে ইসলাম মূল্যহীন হয়ে গেছে এবং যারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আজকে যখন আপনারা মানুষের কাছে ইসলামকে সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের নামে এই কারণে পেশ করছেন যে, ওই দুটো ব্যবস্থা সমকালীন সমাজে প্রচলিত ও জনপ্রিয়, তাহলে এককালে তো পুঁজিবাদও মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলো। কারণ এর উসীলায় তারা জমিদারী শোষণ ত্রাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। অনুরূপভাবে জাতীয়তাবাদী ঐকতান সৃষ্টি করে বিক্ষিপ্ত রাজ্যগুলোকে অখন্ড রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আনার জন্যে এক সময় একনায়কতন্ত্রও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো, যেমন বিসমার্কের জার্মানীতে ও মুসোলিনীর ইটালিতে হয়েছে। এভাবে আগামীতে মানুষের জন্যে মানুষের রচিত কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কখন কোথায় জনপ্রিয় হয়ে সমাজে চালু হয়ে যাবে তা কে জানে? তাহলে আপনারা তখন ইসলাম সম্পর্কে কী বক্তব্য দেবেন? তখনও কি কোন জনপ্রিয় মতবাদের মোড়কে মানুষের কাছে ইসলামকে পেশ করবেন?

কোরআন শুধু আলোচ্য অংশেই নয়; বরং অন্যান্য স্থানেও যে দিকনির্দেশনা দেয়, তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, কোরআন ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারে নিয়োজিত সম্মানিত ভাইবোনকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে চায়। সে চায়, তারা যেন ইসলামকে

অন্য কোনো নামে মানুষের সামনে পেশ না করে। তাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর গোলাম মনে করে, অথচ আল্লাহর দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না এবং আল্লাহর বিধান ছাড়া আর সব বিধানের আনুগত্য থেকে সরে আসে না, আল্লাহর এ দ্বীনের জন্যে সে ধরনের লোকের কোনো প্রয়োজন নেই, যেমন প্রয়োজন নেই স্বয়ং আল্লাহর কোনো অবাধ্য বান্দার।

মৌল বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলোর দিক দিয়ে যখন ইসলামের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব রয়েছে এবং তা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করুক– এটা আল্লাহ তায়ালা চান, তখন একটা কার্যকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবেও তার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব রয়েছে। মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও মনমগযকে সম্বোধনের এবং এ দ্বীন রাজনৈতিকভাবে সমাজ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিতেও তার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব রয়েছে। যিনি এ দ্বীন তার সমস্ত মৌল বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলোসহ এবং তার আন্দোলনী চরিত্র ও বিধানসহ নাযিল করেছেন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। মানুষের সৃষ্টিকর্তাও তিনি, আর মানুষের অন্তরে কে কী প্ররোচনা দেয়, সেটাও তিনিই জানেন। সুতরাং পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার দোহাই দিয়ে, ইসলামের নিজস্ব পদ্ধতি বাদ দিয়ে সমাজে প্রচলিত কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টায় লাখ লাখ তাওহিদী জনতার একনিষ্ঠতা ও আত্মত্যাগকে পন্ডশ্রমে পরিণত করা সত্যিই সাধারণ মুসলমানদের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রচলিত রাজনীতির সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তফাৎ

আজকের দিনে যারা ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে এবং এর বাস্তবায়ন দেখতে চায়, অথবা এ বিষয়ে লেখালেখি করে, হাতেগোনা কতিপয় লোক ছাড়া তাদের অনেকেই কোরআন হাদীসের সন্তোষজনক জ্ঞান রাখে না। যার কারণে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ আয়াত বা হাদীস সামনে আসায় তারা হয়রান পেরেশান হয়ে যায়। এর মূল কারণ হলো, তারা বিরাজমান জাহেলী ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করতে চায়। সব কিছু মিলিয়ে এক যৌথ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়; যাতে করে জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকেও মূল্যায়ন করা হয় এবং মনে করা হয়, এর সাথে খাপ খাইয়ে আস্তে আস্তে ইসলামী ব্যবস্থাও কায়েম করা যাবে, মানবনির্মিত ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ধীরে ধীরে ইসলামী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। আসলে এটা হচ্ছে এ ব্যবস্থা চালু করার এক কাল্পনিক চিন্তা, বাস্তবে এটা কখনো সম্ভব নয়। মানবনির্মিত ব্যবস্থা ও আল্লাহর ব্যবস্থা পরস্পর বিরোধী। ইসলামী ব্যবস্থায় সকল নিয়ম নীতি এক সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর গড়ে উঠেছে, যার মূলে সক্রিয় রয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর রসূলের ব্যবস্থাপনা এবং তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হচ্ছে গোটা বিশ্ব। এ ব্যবস্থার নিরন্তর চেষ্টাই হচ্ছে জাহেলী ব্যবস্থার মধ্য থেকে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা। আর জাহেলিয়াত এটা কিছুতেই বরদাশত করতে রাযি নয়, যার কারণে যারাই সঠিক অর্থে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাদের নানা প্রকার যুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে চরম ধৈর্য

অবলম্বন করতে হয়। এ পরীক্ষা তাদের ওপর জাহেলী ব্যবস্থা যতোদিন প্রতিষ্ঠিত থাকে ততোদিনই চলতে থাকে। অপরদিকে বর্তমানে যে জাহেলী ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা মানবনির্মিত। এ ব্যবস্থা কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় এবং রক্ষণশীল ঈমান ও ইসলামের সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। এ জন্যে এ ব্যবস্থার সাথে আপস?—এটা শুধু মুখের কথা ও শূন্যে স্বর্গ রচনার মতোই অবাস্তব। যেখানে মানবনির্মিত ব্যবস্থা বিজয়ী অবস্থায় চালু আছে, সেখানে কোনো আপসরফা করে কোনোদিনই আল্লাহর ব্যবস্থা চালু করা যায় না।

যেসব লেখক ও আলোচক এ উভয় প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান ঘুচাতে চায়, এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চায়, তারা আপসরফা করতে গিয়ে আসলে খুবই মুশকিলে পড়ে যায়। প্রথম যে জটিলতার তারা সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে, জনপ্রতিনিধি বা নেতা নিয়োগ প্রশ্নে ও পদ্ধতিতে, অথবা পার্লামেন্ট মেম্বার নির্বাচন পদ্ধতি। কেননা ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী তো আত্মপ্রচার করা যাবে না এবং নিজেদের গুণাবলী সম্পর্কে নিজেরা কিছু বলা যাবে না। সুতরাং আজকে এ জনবহুল সমাজে—যখন কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কারো পরিচয় জানে না, সে অবস্থায় কারও যোগ্যতা ও প্রার্থীপদ লাভের যোগ্যতা জনগণকে জানানোর উপায় কি? যে দায়িত্বপূর্ণ পদে তাদের বসানো হবে সে কাজে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বুঝার জন্যে সত্যিকারের কি ব্যবস্থা আছে, কোন নিক্তিতে তাদের সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিমাপ করা হবে, তাদের নির্দোষিতা প্রমাণের ও আমানতদারী যাচাইয়ের উপায় কি, নেতা-নির্বাচনের উপায় ও তাদের যোগ্যতা মাপার পথ পদ্ধতিই বা কি হবে? সাধারণ ভোটে কি নেতা নির্বাচন হবে, না মৌলিক গণতন্ত্রের কায়দায় প্রভাবশালী জনগণ দেশের নেতা নির্বাচন করবে? তারাই বা কোন নীতির ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করবে? শুধু দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভোটে যদি নেতা নির্বাচনের কাজ সমাধা করা হয় তাহলে সাধারণ শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের সপক্ষে নিয়ে এ সরকারকে বিপাকে ফেলে দেয়া তো মোটেই কঠিন কাজ নয়। আবার এই সাধারণ জনগণকে পকেটে নিয়ে যখন কেউ নেতা নির্বাচিত হয়ে যাবে তখন সমস্ত ক্ষমতাই তার হাতে চলে যাবে এবং সে এমন নেতা সেজে বসবে যে, তার ওপর আর কারো কিছু বলার থাকবে না। আর যতোদিন সে চায় ততোদিন অবলীলাক্রমে তার কর্তৃত্ব চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তার কাছে নীতি আদর্শ নয়, সাধারণ জনগণকে খুশী রাখাই হবে বড়ো কাজ। এ ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন উঠবে, যার জবাব পাওয়া খুবই মুশকিল!

এ জটিল চিন্তার শুরু কোথায় তা আমি জানি। এসব অবাস্তব চিন্তার উৎস হলো, যে জাহেলী সমাজে তারা বাস করে তাকে তারা একটা মুসলিম সমাজ মনে করে। এখন চলুন, বর্তমান জাহেলী সমাজে প্রচলিত আইন কানুন ও সামাজিক রীতি নীতি কতোটুকু ইসলামী বিধি বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ তা আমরা একটু খতিয়ে দেখবো,

দেখবো ইসলামী মূল্যবোধের সাথে ও ইসলামী চরিত্রের সাথে এর কতোটুকু মিল আছে।

প্রকৃতপক্ষে এই সমাজকে আমরা মুসলিম সমাজ মনে করলেও এ সমাজের চিন্তা চেতনা, রুচি, আইন কানুন তথা সকল ক্ষেত্রেই বিজাতীয় শেরেকী ভাবধারা প্রবাহিত রয়েছে। আমরা এক সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে ইসলামী জীবন ও তার সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং এমন এক সমাজের মধ্যে তা তালাশ করছি, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে অনৈসলামী জাহেলী ভাবধারা। এ ভাবধারা যেমন ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিকদের দেশে রয়েছে, তেমনি রয়েছে মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত দেশগুলোতেও।

যে জাহেলী সমাজে আমরা বসবাস করছি তা মোটেই কোনো ইসলামী সমাজ নয়; সুতরাং এখানে শরয়ী হুকুম আহকাম বা ইসলামী আইন কানুন এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় এখানে ফেকাহর যেসব জটিলতা ও মতভেদ রয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করা। এ সব কঠিন সমস্যার সমাধান এ জন্যে সম্ভব নয় যে, এগুলোর কার্যকারিতা ও এগুলোর কল্যাণকর বা ক্ষতিকর দিক কোনো শূন্য পরিবেশে পরীক্ষা করা যায় না। আসলে ইসলামের স্বর্ণযুগে বাস্তব জীবনে এগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে। যেসব বিষয়ে মানুষকে নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আজো সেসব বিষয়ে কোরআন হাদীসের পরিপন্থী ব্যবহার না করে সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অবশ্যই ইসলামী সমাজব্যবস্থার গঠনপদ্ধতি জাহেলী সমাজব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। এ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন বিশেষ এক জনপদ, যারা প্রকৃতির দিক দিয়ে হবে সংগ্রামী ও ত্যাগী। এ সমাজব্যবস্থা গড়তে গিয়ে তাদের জাহেলী সমাজের সব কিছুর সাথে মোকাবেলা করতে হবে, এ সমাজের মূল্যায়নের মাপকাঠিকে ঠিক করতে হবে এবং মানবরচিত যাবতীয় আইন বিধান ও আল্লাহ-রসূলের পথের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ইসলামের নির্মিত প্রথম সমাজটি ছিলো এক নতুন জনপদ, নবগঠিত এক সমাজ, এ সমাজ ছিলো চির সবুজ, চির সচল এবং মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্যেই এ সমাজের জন্ম হয়েছিলো– কোনো বিশেষ জনতার মুক্তির জন্যে নয়। গায়রুল্লাহর দাসত্বের বন্ধন থেকে পৃথিবীর সকল জনগণের মুক্তির আহ্বান নিয়ে এ সমাজ গড়ে উঠেছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহদ্রোহী সকল প্রকার শক্তির দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করে মানবতার মর্যাদা উন্নত করা.... সে তাগুতী শক্তি যারাই হোক না কেন।

এ সমাজ গঠনকালে সমাজের সদস্যদের আত্মশুদ্ধির নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়া হয়। জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে নেতা নির্বাচন, পরিচালক নির্বাচন, শূরা গঠন পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কিত আরও এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় এবং এভাবেই আস্তে আস্তে একটি পূর্ণাংগ সমাজ গড়ে ওঠে। এ সমাজের যাবতীয় নীতিমালা, আইন

কানুন সবই থাকে সুনির্ধারিত। অন্যের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে ধার করার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ বর্তমান সমাজের ইসলামী আন্দোলনকর্মীরা এমন এক জাহেলী সমাজের মধ্যে বসে ইসলামের আইন কানুন, বিধি বিধানের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করে, যেখানকার পুরো সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, জনগণের চিন্তা চেতনা, আদর্শ, মূল্যবোধ সবকিছুই জাহেলিয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছাড়াই মুসলিম সমাজে এ ব্যবস্থা কিভাবে চালু করা যায় তা নিয়ে আজ তারা আলোচনা করে চলেছে। এ জীবন ব্যবস্থার মূল্য ও মর্যাদা, এর যথার্থতা, এর মধ্যে বিরাজমান নৈতিক শিক্ষা, এর বিভিন্ন চিন্তাধারা, এর চরিত্র গঠন-পদ্ধতি– এসব বিষয়ে দিনের পর দিন তারা নিষ্ফল আলোচনা করে যাচ্ছে।

এসব আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে, আধুনিক সমাজে প্রচলিত সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে কিভাবে ইসলামকে খাপ খাওয়ানো যায়, সূদী ব্যবস্থার নিয়ম কানুন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, জানি না আরও কতো কিছু। তবে এসব বিষয়ের মধ্যে মূল যে বিষয়টি নিয়ে তারা বেশী ব্যস্ত, যাকে তারা সব থেকে বেশী কঠিন মনে করে এবং তাদের কাছে সব থেকে প্রিয় আলোচনা– তা হচ্ছে তারা চায়, মানুষ বিদ্যমান এসব জাহেলী ব্যবস্থার সাথে ইসলামকে খাপ খাইয়ে নিক!

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আলোচনার শুরুতেই এসব মহান (?) ব্যক্তি নানা প্রকার চিন্তায় জড়িয়ে পড়ে। তাদের কথা শুরু হয় এই অনুমান দিয়ে যে, আধুনিক অর্থব্যবস্থার সাথে তো আমাদের খাপ খাইয়ে চলতে হবে, এমতাবস্থায় কি ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও তার হুকুম-আহকাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন করে বর্তমান অবস্থার উপযোগী করে নেয়া যায় না? এটা করতে পারলে গোটা পরিবেশে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা চালু করে দেয়া সহজ হবে এবং সমগ্র জগতে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে।

হাস্যোদ্দীপক এ সব কল্পনা, দুঃখজনকও বটে!

মনে রাখতে হবে, ইসলামী আইন কানুন এবং এর ফেকাহ বা ব্যবহারশাস্ত্র মুসলিম সমাজের মনীষীদের নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি। প্রথমত, জাহেলী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এবং দ্বিতীয়ত, বাস্তব দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে পুরোপুরি ইসলামী আইন কানুনের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যবস্থা তার ফেকাহশাস্ত্র গড়ে তুলেছে। তাই তার মধ্যে যদি কোনো মানুষের মত অনুপ্রবেশ করে, তাহলে এটা আর আল্লাহর আইন থাকলো না।

এটা সদা সর্বদা মনে রাখতে হবে, ইসলামী ফেকাহ কোনো শূন্যের ওপর গড়ে ওঠেনি এবং শূন্যের ওপর বাসও করে না, এটা কোনো উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত বিধানও নয়, না এটা মানবনির্মিত কোনো ইতিহাস; বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এবং রসূল (স.)-এর শিক্ষার আলোকে বাস্তব জীবনকে শৃংখলামতে পরিচালনা করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা চূড়ান্ত বিজ্ঞানসম্মত একটা ব্যবস্থা। যা মুসলমানদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ একটা ইসলামী সমাজ গড়ে তোলে। এ সমাজের বিধি নিষেধগুলো সবই মানুষের স্বভাবপ্রকৃতির সাথে সাম

স্যশীল। ইসলামের এ বিধানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ইসলামী ফেকাহ এবং এ যুক্তি বুদ্ধি নিয়ে এ ব্যবস্থা সব কিছুর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, অবশ্য এর মধ্যে কিছু মতভেদও থাকে..........।

আল্লাহর দেয়া পূর্ণাংগ এ জীবন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে চাই আল্লাহর আইন দ্বারা বিশেষভাবে গঠিত এক সমাজ, যা জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হবে এবং ধীরে ধীরে জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন হক-ইনসাফমতো মেটানোর ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করবে। এ ব্যবস্থা মানুষকে অর্থনৈতিক জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবে। মানুষের গোটা জীবনকে গ্রাস করে নিয়েছে যে ব্যাংক ব্যবস্থা, ইনস্যুরেন্স ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, এ প্রশ্নগুলোর যথাযথ জবাব দেবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, এসব রংগিন মত ও পথ দেখিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীরা মানুষকে শোষণ করার জন্যে নিজেদের আবিষ্কার করা এগুলোর ফযীলত এমনভাবে বর্ণনা করে চলেছে যে, সরলমনা সাধারণ জনতা এর বিভ্রান্তিগুলো বুঝতে সক্ষম হয় না। এগুলো সবই এক শ্রেণীর মানবশক্রর মস্তিষ্কপ্রসূত পদ্ধতি। এগুলোর কোনো প্রয়োজন ইসলামী সমাজে হয় না, এজন্যে এগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। ইসলাম যেখানে যাকাত ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে এবং সরকার যেখানে সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সেখানে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণমনা মানবনির্মিত কোনো ব্যবস্থা তার চেয়ে উন্নততর হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আরও মনে রাখতে হবে, জাহেলী জীবনব্যবস্থায় মানুষের চিন্তা ভাবনা এবং দৃষ্টি পৃথিবীর সংকীর্ণ গন্ডি ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। অপরদিকে ইসলামের দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এ জীবনের সীমা পেরিয়ে পরপারের অসীমতায়। জাহেলী সমাজের প্রয়োজনে আবিস্কৃত ব্যাংক ব্যবস্থা, জীবনবীমা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা– এগুলোর কোনো প্রয়োজন মুসলিম সমাজ বোধ করে না, অতীতেও এসব চিন্তা ইসলামী সমাজে ছিলো না। এগুলোর সাথে একমত হওয়া এবং এগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে চলা তো দূরের কথা, ৮এসব বাতিল ব্যবস্থার অস্তিত্ব এক মুহূর্তও ইসলাম মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। মানবনির্মিত এ বাতিল ব্যবস্থা ভেংগে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহর রাজ্যে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলাম বদ্ধপরিকর এবং এর জন্যে আল্লাহর সৈনিকরা আপসহীন সংগ্রাম করে যাবে।

ওসব আপোষকামী আলোচনাকারীদের ব্যাপারে সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে, ওরা মনে করে, জাহেলী ব্যবস্থাই মূল সভ্যতা, যার সাথে ইসলামী সভ্যতাকে মানিয়ে নিতে হবে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থাই আসল, এর সাথে মানুষ খাপ খাইয়ে চলবে এবং নিজেদের উদ্ভাবিত সকল পন্থা পদ্ধতি পরিত্যাগ করবে। জাহেলী আমলের সব কিছুকে ছোটো জানবে, কিন্তু এই ছোটো মনে করা এবং পরিবর্তন আনা একটিমাত্র পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে, তা হচ্ছে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম। এর উদ্দেশ্য একটিই, তা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে

আল্লাহর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা, বান্দাদের একমাত্র তাঁরই প্রভুত্ব মেনে নেয়া, মানুষকে তাগূতী শক্তির গোলামী থেকে মুক্ত করা এবং তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইন কানুন চালু করা।

তবে এটা ঠিক, এ আন্দোলন নিষ্কন্টক নয়– এর পদে পদে রয়েছে বিপদ, কষ্ট ও নানা প্রকার পরীক্ষা। যারা ধৈর্যশীল ও অবিচল, তারাই এসব পরীক্ষায় সফলতা লাভ করবে, আর যারা দুর্বলচেতা, তারা এ সব পরীক্ষার কঠোরতা বরদাশত করতে না পেরে হাল ছেড়ে দেবে এবং যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলো তার থেকে পিছিয়ে যাবে। যারা আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা সত্যে পরিণত করবে এবং সত্যের পথে শাহাদাত বরণ করবে, অথবা বিপদ-আপদের ঝড়ঝঞ্ঝা যা-ই আসুক না কেন তা অম্লান বদনে সহ্য করবে এবং সত্যের পতাকা হাতে বীরদর্পে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলামীন হক ও বাতিলের মধ্যে ফয়সালা না করে দেবেন ততোক্ষণ তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তারা দ্বীনের ঝান্ডা হাতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে, একমাত্র এ প্রক্রিয়াতেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের বীর মোজাহেদরা এভাবেই বরাবর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে এসেছে এবং এ জীবনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এভাবে আল্লাহর মেহেরবানীতে যখন এ মহান দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে তখন তাদের জীবনের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন ও সমস্যা সামনে আসবে এবং সেগুলোর সমাধান ধীরে ধীরে আসতে থাকবে। তাদের সমস্যা ও সমাধান বর্তমান জাহেলী সমাজব্যবস্থার সমস্যা ও সমধান থেকে ভিন্নতর হবে। তখন ওই নতুন অবস্থা অনুসারে ইসলামী হুকুম আহকাম প্রয়োগ করা হবে। এ সময় ইসলামের ফেকাহশাস্ত্রের বাস্তবমুখিতা ও প্রাণপ্রবাহের প্রমাণ পাওয়া যাবে। এগুলো শুধু মৌখিক কথা নয় যে শূন্যে ভাসতে থাকবে; বরং জীবন্ত ইসলামী সমাজের মধ্যে আগত বাস্তব সমস্যার সমাধানকল্পে এ সমাধান আসবে।

আজকের বিরাজমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে কেউ কি আমাদের এমন একটা দৃশ্য দেখাতে পারবে, যেখানে মুসলিম সমাজের মতো যাকাত দান করা হয় এবং আল কোরআনে বর্ণিত খাতগুলোতে সে অর্থ ব্যয়িত হয়, মানুষে মানুষে ভালোবাসাবাসি, দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়, দুঃখ বেদনা, সংকট সমস্যার সুযোগ নিয়ে শোষণ করার পরিবর্তে দরদ ভালোবাসা নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর সকল সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা হয়, মানুষের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, যেখানে মানুষের জীবনে কোনো অপচয় থাকে না, থাকে না প্রদর্শনীমূলক কাজ বা অহংকার ও আত্মপ্রশান্তিমূলক গালগল্প........... এভাবে অতীতে গোটা ইসলামী সমাজের চিত্রের মতো কোনো চিত্র আধুনিক সভ্যতাগর্বী সমাজের কোথাও আছে বলে কেউ দেখাতে পারবে কি? কেউ কি বলতে পারবে, ইসলামের স্বর্ণযুগে মানবসভ্যতার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো, যে শান্তি ও সমৃদ্ধি এসেছিলো, তা আর কোথাও এসেছে। আজকেও যদি আমরা অনুরূপ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সেখানে মানবনির্মিত কোনো সংস্থা গঠনের প্রয়োজন থাকতে পারে?

ইসলামী সমাজের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা বা অনুরূপ কোনো কর্মসূচীর প্রয়োজন? আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর যে বান্দা দুনিয়ায় আসার সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে– তাদের ঠেকানোর কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে? এমনি করে মানুষের মনগড়া বিধি বিধান প্রণয়নে উদ্ভূত হাজারো রকম যে সমস্যা আজকের আধুনিক সমাজে বিরাজ করছে, রসূল (স.)-এর অনুকরণে আল্লাহর বিধানে পরিচালিত সমাজে কি ওইসব কঠিন সমস্যা আসতে পারে?

হতে পারে কি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে কেমন শান্তি স্থাপিত হতে পারে তা যদি আমরা অনুমান করতে না পারি এবং আজকের জাহেলী সমাজ সভ্যতার বহুমুখী বিরোধিতার কারণে আগত সমস্যা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি, তাহলে সে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চাওয়ার এবং ইসলামের আলোকে উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টায় আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে গাত্রদাহের হেতু কি? ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি, ইসলামী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যখনই বিভিন্নমুখী চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে, তখনই তারা সীমাহীন সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং দিনে দিনে তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। যখন মানুষ 'আধুনিক মুসলমানদের জাহেলী সমাজকে' ইসলামী সমাজ মনে করে এই সমাজব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থা মনে করতে শুরু করেছে, তখনই এসব জটিল চিন্তার উৎপত্তি হয়েছে।

আবারো বলছি, ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করার প্রশ্নে যে মূল জটিলতা আমরা অনুভব করছি তা হচ্ছে, আধুনিক মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানবরচিত বর্তমান জাহেলী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে তার সাথে আল্লাহ রসূলের কিছু আইন জোড়াতালি দিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েম করার স্বপ্ন দেখে এবং তারা ইসলামী বিধানের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে এই বিপর্যস্ত সমাজের সকল সমস্যা সংকট দূর করতে চায়। অথচ মানবরচিত ওইসব বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের বিরোধিতা করা। এর অসারতা প্রমাণ করে কোরআন সুন্নাহ থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া।

আমরা মনে করি, সময় এসেছে ইসলামের প্রচারকদের দ্বারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার। তারা আর আধুনিক জাহেলী জীবনব্যবস্থার সেবাদাস হয়ে থাকবে না এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে থেকে জাহেলিয়াতের মনিবদের আর আনুগত্য করে যাবে না; বরং সকল মানুষকে ডেকে বলবে, 'সর্বপ্রথম তোমরা আল্লাহর দ্বীনের দিকে এসো, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার ঘোষণা দাও এবং এ কথার সাক্ষ্য দাও, সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নেই'– এই ঘোষণা এবং এর বাস্তব অনুশীলন ছাড়া ঈমান ও ইসলাম কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। এর অর্থ হচ্ছে, আসমানে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা যেমন একমাত্র আল্লাহর, তেমনি পৃথিবীর ওপরও আধিপত্য করার, রাজত্ব চালনোর অধিকার এবং ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আকাশ রাজ্যে যেমন তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিরাজ করছে, তেমনি পৃথিবীর সর্বত্রও তাঁর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং এখানকার অধিবাসীদের একমাত্র তাঁরই আইন

মানতে হবে। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাঁরই শাসন ক্ষমতা ও তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মানবজাতিকে শাসকদের গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে, আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষের ওপর থেকে মানুষের মনগড়া শাসন ক্ষমতা অপসারিত করে এবং মানুষের ওপর থেকে মানবরচিত আইন তুলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আইন তাঁর বান্দাদের ওপর চালু করা হবে।

পৃথিবীর যে কোনো ভূখন্ডে তখনই আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা চালু হবে, যখন সাধারণভাবে মানুষ এ জীবনব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করবে, অথবা অন্তত কোনো নির্দিষ্ট দেশের এক উল্লেখযোগ্য জনতা এ আহ্বানে সাড়া দেবে। এজন্যে অবশ্যই কোনো এক মুসলিম সংগঠনকে কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ডে কদম জমিয়ে বসে যেতে হবে, আর তখনই তাদের কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের সাথে যোগ দিতে থাকবে। এভাবে সত্যাশ্রয়ী জনতার কাফেলা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তারা প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের জীবনে আল্লাহর বিধান চালু করতে থাকবে। বাস্তবে এই ইসলামী সমাজ গঠন করার পূর্বে ফেকাহ ও সাংগঠনিক বিধি-বিধানের ময়দানে যে কাজ করা হয় তা নিছক এক ধোকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কারণ এ কাজের অর্থ হচ্ছে হাওয়ায় বীজ বপন। আর শূন্যে কেউ কখনো ইসলামী ফেকাহর কোনো গাছ রোপণ করতে পারবে না, যেমন বাতাসে কোনো বীজ বোনা যায় না।

চিন্তা ও কল্পনার ক্ষেত্রে ইসলামী ফেকাহর যে চর্চা হয় তা নিছক এক ছেলে খেলা! এর কারণ হচ্ছে, এ খেলায় কোনো ঝুঁকি নেই, প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের কোনো কাজও নয় বা এটা দ্বীন ইসলামের কোনো পদ বা পদ্ধতি বা ইসলামের কোনো মেযাজও নয়! এটা তাদের কাছে একটি আরামদায়ক মজার খেলা। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় যখন ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম নেই, সে সময়ে ইসলামের জন্যে এ ধরনের মুখরোচক ইসলামী ফেকাহ রচনা বা ফেকাহ সম্পর্কিত আলোচনাকে আমি ওই রকমের এক কল্পনাবিলাস মনে করি। মনে করি, এ হচ্ছে সময় ও শ্রম নষ্ট করা, যেহেতু বাস্তবে এর কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

দ্বীন ইসলাম এমন কোনো ফেরারী উট বা কোনো পলাতক জীব জানোয়ার নয়, যা মাঠে-ময়দানে পালিয়ে বেড়াবে; এটা কোনো এক অনুগত চাকর যা এমন এক জাহেলী সমাজের মানুষের তাবেদারী করে না যারা তার থেকে দূরে থাকতে চায়, যারা এর সাথে সাক্ষাত হওয়াটাও পছন্দ করে না। ...... হাঁ, কখনও কখনও সংকটে সমস্যায় পড়ে ফতোয়া অবশ্য তারা চায়! এটা নিছক একটা গতানুগতিক প্রথা, বাস্তবে ওই বাতিল সমাজ ও তার লোকেরা ইসলামের কোনো সমাধান চায় না, ইসলামী আইনের কাছে নতিস্বীকার করতে চায় না, ইসলামী শাসন মানতে চায় না।

আবারো বলছি, দ্বীন ইসলামের যুক্তিবিদ্যা, কোরআন হাদীসকে কেন্দ্র করে যে ফেকাহশাস্ত্র এবং এর বিধি বিধান জনমানবশূন্য কোনো প্রান্তরে অথবা ঊর্ধ্বাকাশের মহাশূন্যতায় গড়ে ওঠেনি, শূন্যের মধ্যে এ জীবন বিধান কাজ করে না ..... বরং বার

বার এটাই দেখা গেছে, গোড়া থেকেই মুসলিম সমাজ আল্লাহর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর ক্ষমতার সামনে বরাবর মাথা নত করেছে। যেহেতু তাঁর হুকুম পালন করার উপকারিতা সম্পর্কে তিনিই জানিয়েছেন, জানিয়েছেন কখনো কোরআনের বাণী দ্বারা, আবার কখনো তাঁর রসূলের মাধ্যমে .... আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্যে কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তা কোনো মানুষ দেয়নি, বা এটা কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রিত বিষয়ও নয়।

ইসলামী সমাজের অগ্রগতির জন্যে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেসব পর্যায়ক্রমিক ধারাসমূহ এক স্থায়ী নিয়মে বাঁধা। জাহেলী ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া কখনো একদিনে সম্ভব হয়নি, বা এটা কোনো সহজ সরল কাজও নয়, বা মহাশূন্যে রচিত কোনো ব্যবস্থাও নয়, নয় এটা আকাশের জন্যে তৈরী কোনো জ্ঞানগর্ভ বিধান; বরং ইসলামী সমাজ ও ইসলামী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে আমাদের সদা সর্বদা প্রস্তুতি নিতে হবে, এর জন্যে সর্বপ্রকার যোগাড়যন্ত্র করতে হবে। বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া ইসলামের আইন কানুনের বিস্তারিত বিবরণ, তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা দ্বারা জনগণকে জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে এগিয়ে আনা সম্ভব হবে না। এভাবে এসব জাহেলী সমাজ সংগঠনগুলো পরিবর্তিত হয়ে ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত হবে তাও নয়! আবার জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে আসায় যদি কেউ অস্বস্তি বোধ করে তা দূর করার জন্যে ইসলামী ব্যবস্থার আইন কানুনের মধ্যে কোনো শিথিলতা বা পরিবর্তন আনাও কোনোদিন সম্ভব হবে না। এভাবে ইসলামী বিধানে কেউ কাউকে ধোকা দিতে পারে না বা কারো দ্বারা ধোকা খাওয়াও চলে না।

একমাত্র সেসব আল্লাহদ্রোহী শক্তিরাই জাহেলী সমাজব্যবস্থা উৎখাত না করে ইসলামী ব্যবস্থা চালু করার স্বপ্ন দেখায় এবং এ বিষয়ে বাগাড়ম্বর করে, যারা প্রকৃতপক্ষে একথা স্বীকারই করতে চায় না যে, শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তারা এও স্বীকার করতে চায় না যে, মানুষের কর্তা-মনিব, প্রভু প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ এবং বিশ্বজগতের বাদশাহী থাকবে একমাত্র আল্লাহরই হাতে। মুখ দিয়ে না বললেও আসলে তারা ইসলাম থেকে পরিপূর্ণভাবে বের হয়ে যায়। একথা বার বার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, গোটা বিশ্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ; সুতরাং দ্বীন ইসলামের ধারক বাহকদের কাছে আল্লাহর দাবী হচ্ছে একমাত্র তাঁরই আইন সারা বিশ্বে চালু করা ....। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর বলদর্পী অহংকারী শাসকদের দাসত্ব করে চলেছে। অর্থাৎ তাদের আইন কানুন মেনে চলছে, তাদের কাছে নতিস্বীকার করছে এবং তাদের অনুসরণ করে চলেছে। এভাবেই তাদের নানা কায়দায় তারা ত্রাণকর্তা ও নিঃশর্তভাবে আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য বানিয়ে নিয়েছে। এভাবেই এ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা অন্ধ আনুগত্য দ্বারা তাওহীদী বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়ে শেরেকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে শেরেকের সবচেয়ে বেশী প্রামাণ্য দলীল .... তাই দেখা যাচ্ছে, এভাবে বা ওভাবে পৃথিবীর প্রায় সবখানে শাসনব্যবস্থার ওপর জাহেলিয়াতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যেখানে

বস্তুগত শক্তির প্রাবল্য যতো বেশী, ততোবেশী সেখানে মানুষের গোলামী জেঁকে বসে রয়েছে এবং ততোবেশী গোমরাহীর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

ফেকাহ শাস্ত্রের বিধি বিধানের মধ্যে এসব জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করার কোনো কর্মসূচী নেই, এমন কোনো উপযুক্ত উপায় উপকরণ ফেকাহবিদদের কাছে নেই, যার দ্বারা তারা ওই তাগূতী শক্তির মোকাবেলা করতে পারেন। ওদের মোকাবেলা তো তারাই করতে পারবে যারা পুনরায় মানুষকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার জন্যে ডাক দেবে, যারা জাহেলী ব্যবস্থার মোকাবেলা করার জন্যে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং জাহেলী সমাজে থেকে যারা ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকবে। এতে সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা থাকবেই, তা সত্ত্বেও যখন আল্লাহর নেক বান্দারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করতে থাকবে, তখনই আল্লাহর সাহায্য আসবে। আর তখন যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের ও তাদের জাতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা একটা ফয়সালা করে দেবেন। ইসলামের এমন বিজয় সূচিত হওয়ার পরই ফেকাহ নিয়ে আলোচনা এবং এ সম্পর্কিত মতভেদ দূর করার প্রয়াস পাওয়া সংগত হবে। আর তখনকার নতুন সমাজের নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ওইসব সমস্যাগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধান বের করা সম্ভব হবে। জীবনের এ সব নতুন নতুন সমস্যা ঘুরে ঘুরে নব নব রূপ নিয়ে আসবে এবং তখন এ সবের বাস্তবমুখী সমাধানও দেয়া যাবে। এভাবে নিত্য-নতুন সমস্যা যতোই আসুক না কেন, তা সবই আল্লাহ আলেমুল গায়বের জ্ঞানভান্ডারের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা আমাদের পক্ষে যেমন আন্দায করা সম্ভব নয়, তেমনি এ মহান ব্যবস্থা থেকে কি সমাধান বের করা যাবে তা আন্দায করাও সম্ভব নয়।

কোরআন ও হাদীসে শরয়ী যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে তা আজ কেতাবেই রয়ে গেছে। বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ না থাকায় তার সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমরা বলতে চাই, আজ প্রথম আমাদের সেই সমাজ কায়েম করতে হবে যার মধ্যে ওই ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আল্লাহ-রসূলের বিধান বাস্তবায়িত হওয়ার জন্যে যেমন প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি নিবেদিত এক সমাজ, তেমনি সমাজ সুন্দর হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে ওই বিধান বাস্তবায়ন। সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক ইসলামী সমাজ যখন আল্লাহর বিধান জীবনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে, তখনই ওই বিধানের সৌন্দর্য বিকশিত হয় এবং তার কার্যকারিতা মানুষের গোচরীভূত হয়; আর এটাও ঠিক, এ বিধানের প্রয়োগের জন্যে দরকার আল্লাহ প্রেমিক একটি আগ্রহী সমাজ......... সুতরাং যে বিধানকে নিয়ে আমরা গৌরববোধ করি সেই বিধানের সৌন্দর্য যদি আমরা দেখতে চাই, বুঝতে চাই এর উপযোগিতা, সভ্যসমাজ গড়ার জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা জানতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই এমন সমাজ গড়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হতে হবে। এর জন্যে সমাজের ওইসব মুসলমানদের মনের মধ্যে এক দায়িত্ববোধ থাকতে হবে যারা নিজেদের মুসলমান মনে করে, যারা

জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করতে চায় এবং বিদ্রোহী অহংকারী শাসক ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ধারক বাহকদের নাগপাশ ছিন্ন করে উড়াতে চায় ইসলামী আইন কানুনের বিজয় কেতন। বড়োই আশ্চর্যের বিষয়, আত্মগর্বী, শক্তিদর্পী ওইসব দুনিয়াদার লোকেরা বিশ্ব সম্রাটকে আইনদাতা হিসেবে মানতে চায় না, তার পরিবর্তে আইনদাতা মানে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর দেহের অধিকারী কিছু ব্যক্তিকে, যাদের না আছে কোনো অতীত আর না আছে কোনো ভবিষ্যত; বরং ঘটনাক্রমে সাময়িকভাবে কোনো ক্ষমতার আসনে এরা জেঁকে বসার সুযোগ পেয়েছে।

ইসলামী জাগরণের প্রকৃতি চিরদিন একই রকম। এর কোনো দিন কোনো পরিবর্তন নেই। যখনই জাহেলিয়াতের হাতে ক্ষমতা আসে এবং ইসলামের পতাকাবাহী মোজাহেদ দল এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়, তখনই শুরু হয় ইসলামকে বাস্তব ময়দানে কায়েম করার সংগ্রাম। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন উৎখাত করে যখনই মানবরচিত আইন কানুন চালু হয়েছে, তখনই অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তখন প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। যদিও আযান একামত ও মাসজিদ এবং কিছু ইসলামী রীতি নীতিও চালু রয়েছে, যার কারণে মানুষের অন্তরে এ দ্বীনের ক্ষীণ চেতনাটুকু মাত্র টিকে আছে। টিকে আছে তাদের মনের পর্দায় ইসলামের কল্যাণকারিতার এক কাল্পনিক ছায়া, কিন্তু বিশ্বজয়ী যে ব্যবস্থা নিয়ে রসূল (স.) এসেছিলেন, আসলে তার সঠিক রূপরেখা মুছে গেছে।

অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, আমাদের সময়ে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও চেতনা জাগরিত হওয়ার পূর্বে, মাসজিদ নির্মিত হওয়ারও বহু বহু আগে গড়ে উঠেছে ইসলামের মূলমন্ত্র; 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করা যাবে না'– এই অনুভূতির ভিত্তিতে ইসলামী চেতনার এই জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়েছিলো একটি ডাকে: এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহর, নিঃশর্ত ও নিরংকুশভাবে মেনে নাও আল্লাহর হুকুম। তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রভু মনিব, মালিক, আইনদাতা ও শাসনকর্তা নেই। অতএব, নিঃশর্ত নিরংকুশ এবাদাত আনুগত্য একমাত্র তাঁরই গোলামী এবং আনুগত্য দাবী করে। আর তাঁর প্রতি আনুগত্য শুধুমাত্র কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না; বরং গোটা জীবনে তাঁর যাবতীয় হুকুম ও আইন কানুন মানার মাধ্যমেই তাঁর আনুগত্য প্রকাশিত হয়। এ মনোভাব নিয়েই শুরু হয়েছে আনুগত্য প্রকাশের শিক্ষা। এরপর এসেছে আইন কানুন। ইসলাম যখন প্রথম কাজ শুরু করেছিলো তখনও আমরা এই একই চিত্র দেখতে পাই। যখন একদল মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম মেনে নেয়ার মন প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে বিভিন্নভাবে গৃহীত পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তখনই শরয়ী বিধান নাযিল হতে শুরু করেছে। আর যখন তারা জীবনের বিস্তীর্ণ ময়দানের ছোটোখাটো বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বান্দার জীবনকে সহজ করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কোনো নির্দেশ দেননি। কোরআন ও হাদীস সামনে রেখে

মানবীয় যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করে ফয়সালা করার অধিকার মানুষকে দেয়া হয়েছে। একেই বলা হয় ফেকাহ। সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে শুরু করে ইতিহাসের সকল স্তরেই এই ফেকহী বিষয়াবলীতে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যবোধ রেখে নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন।

মানবজীবনের সীমাহীন সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র পথ। এছাড়া মোমেনের অন্য কোনো পথ নেই। ওদের দৃষ্টিতে মনে হয়, আহ! ইসলামের প্রথম যুগে যখন মানুষকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো সে সময়ে মানুষ যেভাবে দ্বীনের এ দাওয়াতে সাড়া দিচ্ছিলো, তার থেকে যদি ভালো কোনো পদ্ধতি থাকতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু না, এটা শুধু একটা কল্পনাবিলাস ছাড়া এর বাস্তব প্রয়োগ কখনো সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এমন দেখা যায়নি যে, জাহেলিয়াত ও তাগূতী শক্তির গোলামী ছেড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এক সাথে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসে আল্লাহর এবাদাত করতে শুরু করেছে; বরং প্রতি যুগেই দেখা গেছে, দীর্ঘ দাওয়াতী অভিযানের পর ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে মানুষ একজন দুই জন করে এগিয়ে এসেছে। প্রতিবারেই দেখা গেছে, শুরুতে একজন ইসলাম কবুল করেছে, সে পথ দেখিয়েছে অন্যদের, তারপর প্রথম সারির একদল পথপ্রদর্শক অন্যদের সত্যের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। এরপর নবগঠিত এই ছোট্ট দলটি গড়ে তুলেছে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে এমন এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন, যার মাধ্যমে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং সত্যকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানুষের মনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে। এভাবে চিরদিন সত্যের বিজয় হয় এবং এ বিজয়পর্ব এসে যাওয়ার পরই মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। আর আল্লাহর দ্বীন বলতে বুঝায় তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা, তাঁর আইন এবং তাঁর দেয়া সমাজ ব্যবস্থা, যার বাস্তবায়ন আল্লাহ তায়ালা চান তাঁর বান্দার কাছে। এছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা তাদের জীবনে চলবে, আল্লাহ তায়ালা তা মোটেই বরদাশত করতে রাযি নন। তাই এরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে নিজের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে, কিছুতেই তার থেকে (কোনো আমলই) কবুল করা হবে না।' (আলে ইমরান, ৮৫)

জাহেলী সমাজে মিশে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া

নবুওতের সাক্ষ্য বহনকারী কোরআনের আয়াত এবং জীবন ও জগতকে ঘেরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী চোখে দেখেও যারা দেখছে না, জেনেও যারা বুঝছে না; বরং তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিভিন্ন ধরনের শেরেকী কাজে লিপ্ত হচ্ছে, আর তারা সংখ্যায়ও অধিক, কাজেই এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা ছাড়া

আর কোনো উপায় নেই। রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সত্যিকারের-অনুসারীরা সে পথেই থাকবেন। সে পথ থেকে তাঁরা বিচ্যুত হবেন না। নীচের আয়াতসমূহে সে নির্দেশই দেয়া হয়েছে–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ

'বলুন, এটাই হচ্ছে আমার পথ।' (ইউসুফ, ১০৮)

অর্থাৎ একক ও সহজ সরল পথ, যে পথে কোনো বক্রতা নেই। যে পথে কোনো সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(হে নবী, এদের) তুমি (স্পষ্ট করে) বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি, আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাংগ সচেতনতার সাথেই (এ পথে আহ্বান জানাই), আল্লাহ তায়ালা মহান পবিত্র এবং আমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (ইউসুফ, আয়াত ১০৮)

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

'এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব একমাত্র এ পথেরই তোমরা অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেবে। (সূরা আল আনয়াম, আয়াত ১৫৩)

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত ও আলোকপ্রাপ্ত। আমরা আমাদের পথ ভাল করেই জানি ও চিনি। সে পথে আমরা পূর্ণ সতর্কতা ও সজাগ দৃষ্টি নিয়েই চলি। কাজেই সে পথে চলতে গিয়ে আমরা হোঁচট খাই না, দোটানায় পড়ি না, থমকেও দাঁড়াই না। কারণ, আমরা সন্দেহমুক্ত ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী। এ ঈমান ও বিশ্বাসই আমাদের পথপ্রদর্শক। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করি না। কাজেই মোশরেকদের থেকে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক।

আমি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ধরনের শেরেক থেকে মুক্ত। এটাই আমার পথ ও আদর্শ। যার ইচ্ছা সে তা অনুসরণ করতে পারে। যদি কেউ তা পছন্দ না করে তাহলে তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তো এ সরল পথই অনুসরণ করে চলবো।

যারা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে তাদের মাঝে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকতে হবে। ঘোষণা দিয়ে তারা মানুষকে জানিয়ে দেবে, তারা ভিন্ন এক জাতি। তারা সেসব

লোকের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের আকীদা বিশ্বাসের সাথে এদের আকীদা বিশ্বাসের কোনো মিল নেই। যাদের মত ও পথ ভিন্ন, যাদের নেতৃত্বও ভিন্ন। ফলে একই সমাজে বাস করা সত্ত্বেও তাদের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তারা পরস্পরের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় না।

জাহেলী সমাজের মাঝে বিলীন হয়ে গিয়ে যারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, তাদের সেই ডাকের কোনো সার্থকতা নেই, আদৌ কোনো মূল্য নেই; বরং গোড়াতেই ঘোষণা দিয়ে মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে, তারা জাহেলী মতবাদের ধারকদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জনগোষ্ঠী, তাদের সামাজিক বন্ধনের মূলে রয়েছে এক বিশেষ আকীদা বিশ্বাস ও ইসলামী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। জাহেলী সমাজ থেকে নিজেদের পৃথক করতেই হবে। সাথে সাথে নিজেদের নেতৃত্বকেও জাহেলী সমাজের নেতৃত্ব থেকে পৃথক করে নিতে হবে।

জাহেলী সমাজে বিলীন হয়ে গিয়ে জাহেলী নেতৃত্বের অধীনে জীবন যাপন করলে তাদের আকীদার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের দাওয়াতী কাজের প্রভাবও খর্ব হবে এবং তাদের নতুন আদর্শের যে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারতো সেটাও সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে।

এই বাস্তবতা কেবল রসূলের যুগের মোশরেকদের মাঝে দাওয়াতী কাজের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং যখনই জাহেলী মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং মানবসমাজকে গ্রাস করে নেবে, তখনই এ বাস্তবতা দেখা দেবে। মৌলিক উপাদান এবং স্বতন্ত্র রূপরেখার দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত কোনোভাবেই অন্যান্য জাহেলিয়াত থেকে ভিন্ন নয়, যুগে যুগে ইসলামী দাওয়াতকে যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

জাহেলী সমাজের সাথে মিলে মিশে, জাহেলী পারিপার্শ্বিকতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে ইসলামী দাওয়াতকে আস্তে আস্তে সফলতার পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছাবে বলে যারা ভাবেন, তারা এই আকীদা বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কে এবং মানুষের মনকে কিভাবে নাড়া দিতে হয় সে সম্পর্কেও অজ্ঞ। আল্লাহদ্রোহী মতবাদের ধারক ও প্রচারকেরা যেখানে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় ও বোধ বিশ্বাস মানুষের সামনে খোলাখুলিভাবে তুলে ধরে, সেখানে ইসলামী মতাদর্শের ধারক ও প্রচারকেরা কেন নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরবে না? কেন তারা নিজেদের পৃথক মত ও পথের কথা ঘোষণা দিয়ে মানুষকে জানাবে না? অথচ তাদের মতাদর্শ অন্যান্য সকল জাহেলী মতাদর্শ থেকে শ্রেষ্ঠ। তাদের মতাদর্শ বিশ্বজাহানের নিরংকুশ সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত।

আন্দোলন কৌশলের নামে সুন্নাত পরিহার করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর ঘটনায় ইসলামী আন্দোলন কর্মীদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল

করা আয়াতের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত মোবাল্লেগদের সকলের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যে, সর্বকালে দাওয়াত গ্রহণ করার জন্যে সেসব মানুষকেই উপযোগী মনে করতে হবে এবং তাদের কাছেই আগ্রহভরে দাওয়াত পৌছাতে হবে, যারা আগ্রহভরে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দ্বীনের জন্যে অন্তরের মহব্বত নিয়ে অগ্রসর হবে। যেহেতু যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের মূল্যই তাঁর কাছে বেশী, এতে তাদের শক্তি সামর্থ, অর্থ সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা যতো তুচ্ছই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না– তাদের দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের খেদমত নেবেন। অপরদিকে যারা সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যারা অর্থ সম্পদ ও বিভিন্নমুখী মর্যাদাবোধ সামনে রেখে নিজেরাই নিজেদের মূল্যায়ন করে এবং অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা মূল্যহীন।

অতএব, ইসলামী দাওয়াতকে যারা অগ্রসর করতে চায়, তারা যেন এ ঘটনার জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অনুধাবন করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন তাঁর রসূলের এ ঘটনাটা থেকে ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে স্থায়ী একটা শিক্ষা রেখে দিতে।

এভাবে চিরদিনের জন্যে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার পদ্ধতি নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে, কিসের মূল্য দিতে হবে, কাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে তা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায়, মানুষ দাওয়াতী কাজ বৃদ্ধির জন্যে অনেক সময় নিজেদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন পদ্ধতিকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়, সে অবস্থায় অনেক কাজ নেক নিয়তে করতে গেলেও ভুল হয়ে যায়। যেহেতু শয়তান সদা-সর্বদা ওঁৎ পেতে বসে থাকে যেন মানুষ ভালো ইচ্ছার সাথে নিজের কিছু চিন্তা চেতনার গুরুত্ব দিতে গিয়ে এ ধরনের ভুল করে, যেন তাকে আত্মম্ভরিতায় পেয়ে বসে এবং সে নিজের চিন্তার প্রাধান্য দিয়ে বসে, আর সে সুযোগে শয়তান তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। এ জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও অতীতের ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে যে দিক-নির্দেশনা নাযিল হয়েছে, সেগুলো সামনে রেখে পরবর্তী দায়ীদের নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। আল্লাহর হাতেই সকল কাজের পরিণতি নিবদ্ধ, গায়বের খবর একমাত্র তাঁরই হাতে, কাজেই তাঁর দেয়া পদ্ধতিতে কাজ করেই আমাদের সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকতে হবে।

এভাবেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদের শয়তানের সূক্ষ্ম চালবাজি থেকে সাবধান করছে। সে আমাদের মনে নানা প্রকার আশা আকাংখা জাগিয়ে দেয় এবং সেগুলো কোনো ভালো কাজের জন্যে পরিচালিত হচ্ছে বলে আমাদের বুঝায়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবী রসূলদের তো নিজেই শয়তানের এসব সূক্ষ্ম চাল থেকে রক্ষা করেছেন। শয়তান হাজারো চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ করাতে পারেনি, কিন্তু আমরা তো মাসুম (নিরপরাধ) নই, এজন্যে আমাদের আরো বেশী সাবধান হতে হবে, আর তার উপায় হচ্ছে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা এবং সকল কাজে রসূল (স.)-এর তরফ থেকে কি দিকনির্দেশনা পাওয়া গেছে তা

সঠিকভাবে জেনে নিয়ে সেগুলো সযত্নে অনুসরণ করা। দাওয়াতী কাজ করার ব্যাপারে শয়তান যেন আমাদের ভুল পথে পরিচালনা করতে না পারে তার জন্যে আলোচ্য আয়াতগুলো ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। শয়তানের ওয়াসওয়াসায় অনেক সময় এমন হয় যে, নিজের মনে অনেক পরিকল্পনা ও পদ্ধতি জাগে, আমাদের বুঝানো হয়, পরিস্থিতির আলোকে এগুলোই মাসলেহাত (কল্যাণ) ও হেকমত (কৌশল)। পরামর্শ, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও কোরআন হাদীসের কথাকে প্রাধান্য না দেয়ার কারণে নিজের বুদ্ধি অনেক সময় বড়ো হয়ে দেখা দেয় এবং তখনই শয়তান সুযোগ করে নেয়। এ জন্যে শয়তান যুক্তি দেখায়, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত নীতিমালার মধ্যে নিহিত হেরফের করায় তেমন কোনো অসুবিধা নেই। এটাই হচ্ছে একমাত্র বড়ো শয়তানী হাতিয়ার, যা দ্বারা সে আমাদের বিভ্রান্ত করে, আর তা হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও রসূল (স.)-এর প্রদর্শিত পন্থাকে বড়ো করে না দেখে নিজেদের বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়া, আসলে এটাই সঠিক পথ পরিহার করার নামান্তর। এ পরিহার অল্প হোক আর বেশী এটাই আসল ফেতনা– অবস্থার চাহিদা বা মাসলেহাতের নামে এগুলো আমাদের বিভ্রান্ত করে। অবস্থা কি আছে তার একেবারে নির্ভুল ও চুলচেরা বিশ্লেষণ না করতে পারলে আমাদের পাকড়াও করা হবে না, পাকড়াও করা হবে সর্বাবস্থায়, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কথা পুরোপুরি মানছি কিনা সে ব্যাপারে।

এ প্রসংগের সর্বশেষ কথা হচ্ছে, দাওয়াতী কাজের জন্যে আলোচ্য আয়াতগুলো আমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা বাদ দিয়ে হেকমত, কৌশলের নামে নিজেদের বুদ্ধির কোনো প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ স্থায়ী নীতি থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বীনের দায়ীদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধতা ও জবাবদিহিতা

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۙ - اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ - فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ

'(হে নবী), তুমি কি বধিরকে (কিছু) শোনাতে পারবে? অথবা পারবে কি পথ দেখাতে সে অন্ধকে যে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত। অতপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমাকে এদের কাছ থেকে (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নিতে হবে, অথবা তোমার (জীবদ্দশায়) তোমাকে সে (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দেই– যার ওয়াদা আমি তাদের দিয়েছি (তাতেও এই প্রতিশোধ কেউ ঠেকাতে পারবে না), আমি অবশ্যই তাদের ওপর প্রবল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। অতএব যা তোমার ওপর ওহী করে পাঠানো হয়েছে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তুমি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর রয়েছো। নিসন্দেহে এই (কোরআন) তোমার ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশ, অচিরেই তোমাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আয যোখরুফ, আয়াত ৪০-৪৪)

উল্লেখিত আয়াতে করীমে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে সান্ত্বনাবাণী শুনাচ্ছেন। ওহীর মাধ্যমে তাঁকে যে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে তার ওপর অনড় অটল থাকতে আদেশ করছেন। কারণ এ নির্দেশনা সত্য ও চিরন্তন, এ নির্দেশনা প্রত্যেক নবীকেই দেয়া হয়েছে।

এ ধরনের সান্ত্বনাবাণী পবিত্র কোরআনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, অপরদিকে তাঁকে জানানো হয়েছে, হেদায়াত ও গোমরাহী সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্যির সাথে সম্পর্কিত, এ ব্যাপারে নবী-রসূলদের করণীয় কিছুই নেই। তাঁকে আরও জানানো হয়েছে, নবুওতের উচ্চতর মর্যাদালাভের পরও নবী-রসূলরা সীমিত মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অবাধ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এ সান্ত্বনাবাণীর পাশাপাশি আলোচ্য আয়াতে তাওহীদের সূক্ষ্ম অর্থও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন–

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

'তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে কি পথ প্রদর্শন করতে পারবে?' (আয যোখরুফ, ৪০)

বলাবাহুল্য, আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিরা আক্ষরিক অর্থে অন্ধ ও বধির নয়, কিন্তু তারা অন্ধ ও বধিরদের মতোই। কারণ তারা সত্য পথ দেখতে পায় না এবং সত্য বাণী শুনতে পায় না। আর রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে, যে শুনতে পায় তাকে শুনানো এবং যে দেখতে পায় তাকে পথ দেখানো। এখন যদি কারও অংগ-প্রত্যংগ বিকল হয়ে পড়ে এবং তার হৃদয় ও আত্মার সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার সামর্থ রসূলের থাকবে না। কাজেই তারা পথভ্রষ্ট হলে রসূলের করারও কিছু থাকবে না। কারণ তিনি নিজ দায়িত্ব সাধ্যমতো পালন করেছেন।

রসূল তাঁর ওপর অর্পিত নির্ধারিত দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করেছেন। এখন তাঁর দায় দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। তাই বলা হচ্ছে–

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ۙ

'অতপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমাকে এদের কাছ থেকে (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নিতে হবে।' (আয যোখরুফ, ৪১)

অর্থাৎ দুই অবস্থার যে কোনো একটি হতে পারে। হয় নবীর মৃত্যুর পর তাঁর অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে তিনি নিজেই প্রতিশোধ নেবেন, অথবা তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি তাদের জন্যে যে শাস্তির ফয়সালা করে রেখেছেন তা বাস্তবায়িত করে দেখাবেন। এ উভয়টিই তিনি করতে সক্ষম। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। গোটা বিষয়টাই আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে। কারণ দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশদাতা স্বয়ং তিনি। আর রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন। তাই রসূলকে উপদেশ দিয়ে বলা হচ্ছে–

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

' অতএব যা তোমার ওপর ওহী করে পাঠানো হয়েছে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তুমি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর রয়েছো।' (আয যোখরুফ, ৪৩)

অর্থাৎ তুমি যে পথে আছো, তার ওপর স্থির থাকো। সে পথেই চলতে থাকো। তোমার সাথে কে চললো আর না চললো, সেদিকে খেয়াল করার দরকার নেই। শান্ত চিত্তে তোমার পথে তুমি চলতে থাকো। কারণ তুমি সঠিক পথেই চলছো। এ পথ সোজা সরল। এ পথে চললে তুমি দিকহারা হবে না, লক্ষ্যবস্তু থেকে বিচ্যুত হবে না।

এ বিশ্বাস ও আদর্শের সম্পর্ক হচ্ছে মহাসত্যের সাথে এবং এ আকীদা বিশ্বাস সেই শাশ্বত নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যার ওপর ভিত্তি করে এ জগত টিকে আছে। সেই শাশ্বত নিয়ম যেমন সরল, তেমনি সরল এ আকীদা বিশ্বাসও, তাই উভয়ের মাঝে

বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই। তাই এ আকীদা বিশ্বাস তার ধারককে এই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার পথে পরিচালিত করে আর এই চলার পথে সে স্থিরতা ও অবিচলতা লাভ করে।

এ বাস্তব সত্য প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালা একদিকে তাঁর রসূলের মনে সাহস জোগাচ্ছেন, অপরদিকে সে সকল বান্দাদের মনেও সাহস জোগাচ্ছেন যারা রসূলের পরে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। ফলে চলার পথে তারা বিপথগামীদের কোনো চক্রান্তেই বিভ্রান্ত হবে না। এরপর বলা হচ্ছে–

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ

'নিসন্দেহে এ (কোরআন) তোমার ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশ, অচিরেই তোমাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (আয যোখরুফ, ৪৪)

এ আয়াতের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, এ কোরআন তোমার জন্যে ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশস্বরূপ। পরকালে তোমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তখন কোনো ওযর আপত্তি চলবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই কোরআন তোমার ও তোমার জাতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। দেখা গেছে বাস্তবে তাই ঘটেছে।

আর সে কারণেই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দরূদ সালাম ধ্বনিত হয়। প্রায় দেড় হাজার বছরেরও বেশী ধরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত অনুরক্তরা তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করে চলেছে। কেয়ামত পর্যন্ত তারা তাদের প্রিয় নবীর নাম স্মরণ করতে থাকবে।

তাঁর জাতি ইসলামের পূর্বে একটা অখ্যাত জাতি ছিলো। যখন থেকে তারা এ কোরআনকে আঁকড়ে ধরেছিলো, তখন থেকে তারা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এ কোরআনের বদৌলতেই গোটা বিশ্বে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং যতোদিন তারা এ কোরআনকে নিজেদের চলার পথে দিকনির্দেশক হিসেবে রেখেছে, ততোদিন পর্যন্ত গোটা পৃথিবী তাদের বাধ্য ছিলো, তাদের করায়ত্ত ছিলো। যখন থেকে তারা কোরআন পরিত্যাগ করেছে, তখন থেকে পৃথিবীও তাদের ভুলে গেছে ও হীন মনে করছে। তাদের নেতৃত্বের সারি থেকে টেনে এনে পেছনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এটা একটা বিরাট দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সম্পর্কে এ উম্মতকে অবশ্যই কৈফিয়ত দিতে হবে। কারণ, এই দ্বীনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের মনোনীত করেছিলেন, উদ্ভ্রান্ত ও দিশাহারা মানবতার কাফেলাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। অথচ তারা এ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। কাজেই তাদের এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে। এ শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি অধিকতর ব্যাপক ও অর্থবহ। তাই আমার আলোচনার প্রাধান্য এদিকেই বেশী।

দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও অপরিহার্য বাধা

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমরা কোরআনের এমন কতিপয় আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করবো, যেখানে মুসলমানদের সাধারণভাবে আল্লাহর কেতাব অনুসারে শাসন ও বিচার ফয়সালা করার নির্দেশদান, এ কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ থেকে বাধা ও শত্রুতার সম্মুখীন হলে করণীয় কী তা অবহিত করা এবং এর বিরোধিতাকারীদের শাস্তি কী, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

'তোমরা অন্য মানুষদের ভয় না করে একান্তভাবে আমাকেই ভয় করো, আর আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়ো না; যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই (হচ্ছে) কাফের।' (আল মায়েদা, ৪৪)

এ কথা আল্লাহর জানা ছিলো যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার শাসন করার উদ্যোগ যে যুগে ও যে জাতিতেই গ্রহণ করা হোক, জনগণের একটা অংশ তার বিরোধিতা করবেই। তাদের মন এ উদ্যোগকে কখনো সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে না। বিশেষত যারা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী, অহংকারী ও আধিপত্যবাদী, তারা তো মানবেই না। কেননা আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তা তাদের প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও ক্ষমতা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে এবং যাবতীয় প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে আল্লাহর কাছে। অনুরূপভাবে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর অনুমোদিত আইন বিধান মানবরচিত বিধান অনুসারে শাসন ও বিচার করা এবং আইন রচনা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার কেড়ে নেবে। আল্লাহ তায়ালা জানতেন, যুলুম, শোষণ ও হারামখূরীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা আল্লাহর বিধান কায়েম করার আহবানের বিরোধিতা করবেই। কারণ আল্লাহর বিধান তাদের যুলুম শোষণমূলক কায়েমী স্বার্থকে কখনো টিকতে দেবে না। পাপাচারী, লম্পট, ভোগবাদী, বিলাসী, দুর্নীতিবাজ ও অবৈধ সম্পদের মালিকরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। কেননা আল্লাহর দ্বীন তাদের এ সব নোংরামি থেকে পবিত্র না করে ছাড়বে না, এজন্যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেই। অনুরূপভাবে এমন আরো বহু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করবে, যারা পৃথিবীতে ন্যায়, সততা ও সুবিচার কায়েম হোক তা দেখতে চায় না। এ সব বিরোধিতার মোকাবেলা করা এবং এ জন্যে দৈহিক ও আর্থিক কষ্ট, ত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করার জন্যে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার সংগ্রামের সৈনিকদের প্রস্তুত থাকতে হবেই। আল্লাহ তায়ালা এ সব জানতেন বলেই তাদের বলেছেন–

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

'সুতরাং তোমরা জনগণকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো।' (আল মায়েদা, ৪৪)

অর্থাৎ আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার কাজ এ সব লোকের ভয়ে বন্ধ রেখো না। এ মহান কাজে বাধাদানকারী ও বিরোধিতাকারী জনগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী গোষ্ঠী রয়েছে। একটি শ্রেণী রয়েছে তারা মূলতই আল্লাহদ্রোহী। তারা আল্লাহর আইন মেনে চলতে চায় না এবং আল্লাহকে আইন ও শাসন ক্ষমতাসহ যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র ইলাহ বলে মানতে রাযি নয়। আর এক গোষ্ঠী রয়েছে, যারা জনগণের ওপর শোষণ নিপীড়ন চালাতে এবং নিজেদের কায়েমী স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। তারা ইসলামকে যুলুম, শোষণ, নিপীড়ন চালানোর পথে অন্তরায় বিবেচনা করে। এ ছাড়া এমন কিছু পথভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী গোষ্ঠী এবং শ্রেণীও এর বিরোধিতা করে, যারা আল্লাহর শরীয়তের বিধানকে কষ্টকর ও বিরক্তিকর মনে করে এবং এর বিরুদ্ধে দাংগা হাংগামা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এ সব দল, গোষ্ঠী ও মহলসহ সর্বশ্রেণীর ইসলামবিরোধীদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তকে মানবজীবনের নিয়ন্তা এবং পরিচালক বানানোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তাদের ভয়ে এ কাজ বন্ধ রাখা যাবে না। ভয় শুধু আল্লাহকেই করা যায়, আর কাউকে নয়।

আল্লাহ তায়ালা এ কথাও জানতেন যে, আল্লাহর কেতাব ও তাঁর বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিদের কেউ কেউ কখনো কখনো দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত হবে। ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী, বিত্তশালী ও ভোগবাদী মহলকে ক্রমাগত আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করতে দেখে এক সময় তাদেরও দুনিয়ার লালসায় পেয়ে বসবে। পেশাদার ধর্মযাজকদের মধ্যে সর্বত্র সর্বকালে এটা ঘটতে দেখা যায়, বর্তমান সময়ের মুসলমান সমাজেও এ ধরনের পেশাদার পীর পুরোহিত, ধর্মযাজক ও ইসলামী দলের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশেষত বনী ইসরাঈলের আলেমদের ক্ষেত্রে এটা একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছিলো। এ বিষয়টি জানতেন বলেই আল্লাহ তায়ালা তাদের লক্ষ্য করে বলেছেন–

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط

'তোমরা আমার আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না।' (আল মায়েদা, ৪৪)

বিক্রি করা বলতে এখানে আপস করা বুঝানো হয়েছে, যা কোথাও নীরবতা অবলম্বন তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার মাধ্যমে, কোথাও আল্লাহর বিধান ও আইনকে বিকৃত করার মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যার পোশাক পরিয়ে, তাবীল তা'লীল ও হেকমতের নামে দ্ব্যার্থহীন সত্যকে পাশ কাটিয়ে এবং কোথাও ভ্রান্ত ফতোয়া দানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহর দ্বীনের বিনিময়ে যাই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা স্বল্প, অপ্রতুল ও তুচ্ছ জিনিস, এমন কি তা যদি গোটা দুনিয়ার রাজত্বও হয়। কিছু বেতন ভাতা, পদ পদবী, নেতৃত্ব মন্ত্রিত্ব, খেতাব উপাধি ও এ ধরনের ক্ষুদ্র প্রাপ্তি তো আরো তুচ্ছ, যার বিনিময়ে আল্লাহর দ্বীন বিক্রি করা হয় এবং অবধারিত জাহান্নাম কিনে নেয়া হয়।

যাকে আমানত সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তার বিশ্বাসঘাতকতার মতো জঘন্য আর কিছু হতে পারে না। যাকে রক্ষক ও পাহারাদার নিয়োগ করা হয়, তার ইচ্ছাকৃত শৈথিল্যের মতো ঘৃণ্য শৈথিল্য আর হতে পারে না এবং যাকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তার জালিয়াতি ও শঠতার চেয়ে নিকৃষ্ট শঠতা আর হতে পারে না। যারা 'ধার্মিক' নামে পরিচিত হয়েও আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে শাসক, নিয়ন্তা ও পরিচালক বানানোর কাজ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর কেতাবকে শাব্দিকভাবে বিকৃত করার মাধ্যমে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে আল্লাহর কেতাবের বিনিময়ে খুশী করার কষ্ট করে, তারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, শঠতা ও শৈথিল্য প্রদর্শনের দায়ে দোষী।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফয়সালা ও বিচার শাসন করে না, তারা কাফের।' (আল মায়েদা, ৪৪)

এখানে আল্লাহর বিধান অনুসারে ফয়সালা না করলে স্থান, কাল, প্রজন্ম ও বংশধর নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষকে দ্ব্যর্থহীন ও অকুণ্ঠভাবে কাফের ঘোষণা করা হয়েছে।

এর কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। সেই কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, বিচার করে না, শাসন করে না, সে আল্লাহকে ইলাহ বলে স্বীকারই করে না। কেননা আইন রচনা ও জারি করার সার্বভৌম ও নিরংকুশ ক্ষমতা ইলাহ হওয়ার অনিবার্য দাবী, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদে অন্য কোনো বিধান অনুসারে বা স্বেচ্ছাচারীভাবে বিচার-ফয়সালা ও শাসন করে, সে আল্লাহকে একক ইলাহ তো মানেই না, উপরন্তু এ আইন রচনার ক্ষমতা দাবীর মাধ্যমে, স্বেচ্ছাচারী শাসনের মাধ্যমে সে নিজেই ইলাহ হওয়ার অধিকার দাবী করে। এ দুটো কাজ যদি কুফরী না হয়, তাহলে কুফরী আর কাকে বলে? মুখ দিয়ে ঈমান ও ইসলামের দাবীর কী সার্থকতা থাকে, যদি কাজের দ্বারা কেউ কথার চেয়েও স্পষ্টভাবে কুফরী করে? কাজ তো কথার চেয়েও মনোভাব প্রকাশের বেশী শক্তিশালী মাধ্যম।

এই সর্বাত্মক, কঠোর ও অনমনীয় ফয়সালার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার অর্থ সত্যের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করা এবং তা থেকে পালানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ঘোষণার নানা রকমের কৃত্রিম ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা আল্লাহর কেতাব ও আল্লাহর বক্তব্য বিকৃত করার চেষ্টার শামিল। অথচ আল্লাহ তায়ালা এ ঘোষণায় যাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাফের আখ্যা দিয়েছেন, কোনো রকমের বিতর্ক ও কৃত্রিম ব্যাখ্যা দ্বারা তাদের কাফের আখ্যাপ্রাপ্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে এ ধরনের বিতর্ক ও ব্যাখ্যার কোনোই ফায়দা এবং সার্থকতা নেই।

ইতিহাসের বিচারে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘাত

এখানে আমরা সংক্ষেপে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যা রসূলদের ইতিহাসে বার বার আলোচিত হয়েছে। এসব তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা নিজেদের মনগড়া কোনো কথা বলবো না; বরং যেসব তথ্য ও সূত্র আল কোরআনে পেয়েছি, আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করব।

প্রথম যে সত্যটি আমরা এখানে দেখতে পাই তা হচ্ছে সেই মহাসত্য, যা মহাবিজ্ঞানময়, সকল বিষয়ের খবর রাখনেওয়ালা আল্লাহর বর্ণিত সত্য, আর তা হচ্ছে ঈমান। এ বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় থেকেই আলোচিত হয়ে এসেছে।

সত্যের ধারক বাহক সকলে একই সারির মানুষ, যাদের আল্লাহর সম্মানিত রসূলরা পরিচালনা করেছেন, তারা সবাই মানুষকে একই সত্যের দিকে ডেকেছেন, সবাই একই সত্য প্রকাশ করেছেন এবং সবাই তারা এক পথে চলেছেন, সবাই এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং একই মালিকের বাদশাহী প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাদের কেউই এক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকেননি এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রতি তাওয়াক্কুল করেননি, তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি এবং তাঁর ওপর ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করেননি।

এরপর আসছে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রশ্ন। তবে আধুনিককালের বৈজ্ঞানিকরা যেভাবে চিন্তা করে এটা সে ধরনের কোনো বিশ্বাস নয়। কেননা ওসব 'মূর্খ বৈজ্ঞানিকরা' বলতে চায়, সারাবিশ্বের ক্ষমতা এক সময় অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছিলো, তারপর দুই জনের মধ্যে ক্ষমতা চলে আসে। অবশেষে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় একজনের মধ্যে। প্রাচীনকালে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিসের পূজা করতো, পরে আত্মা, তারকারাজি ও গ্রহ উপগ্রহের পূজা করতে করতে অবশেষে এক আল্লাহর পূজার দিকে এগিয়ে আসে। এভাবে তাদের চিন্তার অগ্রগতি হতেই থাকবে। যতো দিন যাবে ততোই তাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষ আরও উন্নতি করবে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বাড়বে, রাজনৈতিক সংগঠনের উন্নতি হতে হতে অবশেষে একজন মাত্র শাসককে মেনে নেয়ার মানসিকতা গড়ে উঠবে........... সংকীর্ণ বুদ্ধি ও দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন মানুষের লাগামহীন চিন্তার এসব ফসল মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আল্লাহর ধ্যান ধারণা এবং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান এসেছে বিশ্ব প্রভু আল্লাহর প্রেরিত ও মনোনীত মানব প্রতিনিধি রসূলদের কাছ থেকে এবং এটা পর্যায়ক্রমিক কোনো ধারায় আসেনি, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বাবা আদম (আ.)-এর কাছ থেকে এ বিশ্বাস চলে এসেছে যে, সৃষ্টিকর্তা একজনই। পরবর্তীতে তিনিই এ জ্ঞান লাভ করেছেন যাঁকে মহান সৃষ্টিকর্তা মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। এ সত্য চিরদিন একই থেকেছে এবং কোনো দিন এ সত্যের মধ্যে পরিবর্তন আসেনি, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের (রসূল) মধ্যে বা কোনো রসূলের শিক্ষায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। আসমানী কেতাবেও এসব বিষয়ের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

যেসব মৌলিক শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেগুলো লেখা রয়েছে স্থায়ীভাবে একটি কেতাবের মধ্যে। যেমন আমাদের মহা বিজ্ঞানময়, সর্ববিষয়ে খবর রাখনেওয়ালা আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন।

আর যদি ওসব বৈজ্ঞানিক বলতো, রসূলরা যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করার যোগ্যতা একজন রসূল থেকে অপর একজন রসূল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করেছে। জাহেলী যমানায় গড়ে ওঠা মূর্তিপূজার চেতনা ওই তাওহীদী অনুভূতিকেও প্রভাবিত করেছে, অবশেষে, সাধারণভাবে মানুষের কাছে তাওহীদের দাওয়াত একের পর এক লোকদের গ্রহণ করার মাধ্যমে তাওহীদের বার্তা গৃহীত হয়েছে। .... যদি ওই বৈজ্ঞানিকরা এ ধরনের যুক্তি দিতো তাহলে তো কিছু বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতো ... কিন্তু তারা নিছক প্রাচীন ইউরোপের গির্জার পূজারীদের অনুসরণে শুধু শত্রুতার উদ্দেশেই এসব কথা বলে। যদিও বর্তমানের বৈজ্ঞানিকরা এসব কথায় তাদের সাথে একমত নয়। আসলে তাদের গোপন ইচ্ছা হচ্ছে ধর্মীয় চিন্তাধারাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, কিন্তু তাদের এ গোপন ইচ্ছা অনেক সময় প্রকাশিতও হয়ে পড়ে।

তারা সচেতন অথবা অচেতনভাবে মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ধ্বংস করে দিতে চায়। অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা সব কিছু দেখছেন শুনছেন, তিনি মানুষের জীবন পরিচালনার জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং পরকালে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এ চেতনার কারণে মানুষের মধ্যে নীতি নৈতিকতা থাকবে, এটাই তারা বরদাশত করতে পারে না। এ জন্যে তারা প্রমাণ করতে চায়, কোনো দিন কোনো আসমানী কেতাব নাযিল হয়নি এবং ওহী বলতে কোনো বাণী কখনও আসেনি। তাদের কথায় ওহী বলতে যা কিছু বলা হয় তা মানুষের চিন্তা গবেষণার ফল ছাড়া আর কিছু নয়, এ সব চিন্তা গবেষণাকেই তারা ওহী বলে চালাতে চায়। ধর্মীয় চেতনার সাথে তাদের প্রাচীন শত্রুতা এবং বর্তমানে মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ করার গোপন বাসনার কারণে তারা যে অভিযান চালিয়েছে, তাকেই তারা নাম দিয়েছে বিজ্ঞান। এর ফলে বহু মানুষ আজ বিজ্ঞানের নামে এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহকে বুঝতে গিয়ে ধোকা খাচ্ছে!

এভাবে যখন মানুষ বিজ্ঞানের নামে ধোকা খাচ্ছে, সে অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষেও দ্বীন ইসলামের দেয়া জীবনব্যবস্থার ওপরে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত তাদের মাথায় একথা ঢুকানো হচ্ছে যে, অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও অবৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরোধী এক ব্যবস্থা, এর দ্বারা মানুষের কোনো কল্যাণ হয় না।

পথভ্রষ্ট এসব বস্তুবাদীরা যতো চেষ্টাই করুক না কেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে, যুগে যুগে, দেশে দেশে যে সকল নবী রসূল এসেছেন তাঁরা পথহারা মানুষকে একই তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন এবং তাঁদের চরিত্র, বাস্তব ব্যবহার ও কাজকর্ম দ্বারা তারা মানুষকে সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য জাহেলিয়াতও চুপ করে বসে থাকেনি। মিথ্যা এবং দুর্নীতির ধ্বজাধারীরাও ধর্মীয়

চেতনা ধ্বংস করার জন্যে বরাবর সংগ্রাম চালিয়েছে। এ অসহনীয় পরিস্থিতিতে আল কোরআনের দাওয়াত এসেছে এবং সর্বত্র সেই একই দাওয়াতের অমিয় বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে ইসলাম দিকে দিকে তার বাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছে। আর এটাও সত্য কথা, রসূলদের দাওয়াতের মধ্যে যেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি, তেমনি জাহেলিয়াতের ধারক বাহকদের বিরোধিতাপূর্ণ তৎপরতায়ও কোনো ভাটা পড়েনি।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘর্ষ এমন এক অনিবার্য সত্য, যার প্রকৃতি সর্বযুগে একই প্রকার। ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই এ মূর্খতা থেমে থাকেনি; এটা হচ্ছে চিন্তা ও বিশ্বাসের এক মহাবিপর্যয় এবং বিপর্যস্ত চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক বিপথগামী সমাজের ছবি।

আল্লাহর গোলামী বাদ দিয়ে মানুষের ও কুপ্রবৃত্তির গোলামীর মধ্য দিয়েই এ জাহেলিয়াতের সূচনা। উচ্চাভিলাষী অহংকারী মানুষদের চিন্তাপ্রসূত নিয়ম কানুনের সামনে যেদিন দুর্বল ও মযলুম মানুষ মাথা নত করতে শুরু করেছিলো, অথবা তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো মানুষকে আইনদাতা মেনে নিয়েছিলো, তখন থেকেই এই অবক্ষয় শুরু হয়েছে।

জীবন মৃত্যুর মালিকানা এবং আইন রচনা, প্রতিপালন ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, এসব ক্ষমতার অধিকারী দ্বিতীয় আর কেউ নয়, এ দাবী ও শিক্ষা নিয়ে সকল নবী রসূলের আগমন ঘটেছে। একথার অর্থ দাঁড়ায়, এসব ক্ষমতার মেকি ও মিথ্যা দাবীদারদের অস্বীকার করা এবং নিরংকুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর– একনিষ্ঠভাবে এ কথা মেনে নেয়া। আল্লাহকেই সর্বপ্রকার শক্তি-ক্ষমতার মালিক জেনে একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ও আইন মানা এবং তাঁকেই প্রতিপালক জেনে শুধু তাঁরই কাছে নতিস্বীকার করা। এভাবে মানুষ যখন আল্লাহকেই সর্বশক্তিমান, জীবন মৃত্যুর মালিক, প্রতিপালক, বাদশাহ ও আইনদাতা বলে মেনে নিয়ে শুধু তাঁকেই ভয় করে, তাঁর সামনে মাথা নত করে এবং একমাত্র তাঁরই আইন অনুসারে জীবন যাপন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তাঁরই ওপর ভরসা করে এবং বিপদ আপদে ও সংকট সমস্যায় তাঁরই কাছে সাহায্য চায়, অন্য কারো মতের তোয়াক্কা করে না, তখনই পৃথিবীর শক্তি ক্ষমতার দাবীদারদের সাথে তার শুরু হয়ে যায় দ্বন্দ্ব সংগ্রাম। তখনই সমকালীন শাসকশ্রেণী তাদের এই সত্য সঠিক চেতনাকে দমন করার জন্যে এবং তাদের আইন মানার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। ইসলামী দাওয়াত নস্যাৎ করার জন্যে তারা ষড়যন্ত্র করে এবং তখনই মানুষের চিন্তা চেতনাকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

উপরোক্ত দুই ধরনের মানুষের মধ্যে যে সংঘাত তা কখনও শেষ হবার নয়, আপসও কোনো অবস্থাতেই হতে পারে না, ফলে কিছুতেই কোনো স্থায়ী শান্তি এদের মাঝে স্থাপিত হতে পারে না। তাওহীদী জনতা ও বিদ্রোহী অহংকারী এবং শেরেককারী জনতা পরস্পর বিরোধী। এরা কখনো এক হতে পারে না, এক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা মানুসকেই আইনদাতা মনে করে। এর মধ্য দিয়ে আসলে

তারা একক বা একাধিক ব্যক্তিকে 'রব' স্বীকার করে, এ কারণেই তারা বিভিন্নজনের আইন মানা দরকার মনে করে। আর এখান থেকেই তারা মানুষ হয়েও মানুষের গোলামী করার ঘৃণ্য কাজ শুরু করে। অপরদিকে তাওহীদবাদী বা একত্ববাদী এক আল্লাহকেই জীবন মৃত্যুর মালিক জানে ও মানে এবং একমাত্র তাঁকেই পালনকর্তা ও আইনদাতা মেনে নিয়ে তাঁর হুকুমমতো জীবন যাপন করে– এ কারণেই তাদের মধ্যে দেখা দেয় এক অমীমাংসিত পার্থক্য। রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনেও এ পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে এবং ইসলামের দাওয়াতী কাজ যখন অগ্রগতি লাভ করলো, তখন আরব বেদুইনরা জাহেলিয়াতের অবসান হয়ে যাবে ভেবে আতংকিত হয়ে উঠলো। অপরদিকে ইসলামের সম্মোহনী দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে জাহেলী সমাজের স্বচ্ছ চিন্তার লোকজন ক্রমান্বয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলো এবং জাহেলী ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকলো, তাদের নেতৃত্বে জাহেলী ব্যবস্থার সহযোগীদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো। ইসলামের দাওয়াত যখন যেখানেই সঠিকভাবে দেয়া হয় সেখানেই পরিবেশ এভাবে পাল্টে যায়।

জাহেলী সমাজ ও ইসলামী সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। এদের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই সমঝোতা বা সন্ধি হতে পারে না। যেহেতু দুই পক্ষ দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং মূলনীতি বিবেচনায় তাদের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিরোধী। জাহেলী সমাজ একাধিক আইনদাতায় বিশ্বাসী, অপরদিকে ইসলাম একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, ফলে সেখানে কেউ কোনো বান্দার গোলামী করবে এটা সম্ভব নয়।

ইসলামী সমাজ যেখানেই কায়েম হয়েছে সেখানে প্রতিদিনই জাহেলী সমাজের দেহ থেকে কেটে কেটে ইসলামের দিকে মানুষ দলে দলে চলে এসেছে। প্রথম প্রথম যখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন ছিলো, তখনও এভাবে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর ইসলামী সমাজের কাছে জাহেলিয়াতের নেতৃত্ব সমর্পণের দাবী অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং ইসলামী সমাজ সকল মানুষকেই বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীতে আবদ্ধ করেছে। এভাবে যে সময়ে সাধারণভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ আল্লাহর গোলামী বরণ করে নিলো, তখনই সত্যিকার অর্থে শান্তির সন্ধান পেয়েছে।

শুরু থেকেই জাহেলী সমাজের পক্ষে ইসলামী সম্মোহনী দাওয়াতের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। আর এ অবস্থা থেকেই আমরা বুঝতে পারি, কেন সকল যমানায় জাহেলিয়াত সম্মানিত রসূলদের বিরোধিতা করেছে।.......... আসলে প্রত্যেক যমানায় নবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রকৃত অর্থ ছিলো অন্যায়কারী, হঠকারী, যুক্তিবিরোধী এবং কুক্ষিগত স্বার্থবাজদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক ব্যর্থ প্রয়াস। আর অন্যায়ভাবে ক্ষমতা আত্মসাৎকারীদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার পেছনে ছিলো বান্দাদের ওপর তাদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব টিকিয়ে রেখে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখার এক চূড়ান্ত অপচেষ্টা।

ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু হয়ে গেলে জাহেলিয়াতের ধারক বাহকরা প্রমাদ গুনতে শুরু করে এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের আশংকা হতে থাকে, তাদের কোনো জারিজুরি এবার আর টিকবে না। এজন্যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মরণপণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, যেহেতু এটাকে তারা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বলেই বুঝে। তারা বুঝে, ইসলাম তাদের পরিপূর্ণ উৎখাত চায়। তা কোনো শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাযি হবে না, কোনো সন্ধি বা আপস করবে না, কোনো সহাবস্থানেও রাযি হবে না। এ জন্যে এ সংঘাত চিন্তায় আসলে জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা কোনো ধোকা খায় না। তারা ঠিকই বুঝে নেয়, ইসলাম তাদের সম্পূর্ণভাবে মূলোৎপাটিত করে ছাড়বে। এজন্যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল করে না। রসূল এবং মোমেনরাও তাদের সাথে সংঘর্ষের অর্থ বুঝতে ভুল করেননি। সে অবস্থারই চিত্র ফুটে উঠছে নীচের আয়াতে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

'কাফেররা তাদের রসূলদের বললো, আমাদের (ধর্মীয়) গোত্রে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবো, অতপর (ঘটনা চরমে পৌঁছুলে) তাদের মালিক তাদের কাছে (এই বলে) ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের বিনাশ করে দেবো।' (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-১৩)

ওপরের আয়াতটির দিকে খেয়াল করে দেখুন। ওই কাফেররা রসূলদের সাথে এবং মোমেনদের সাথে কোনো আপস করার প্রস্তাব দিচ্ছে না বা নেতৃত্বের ব্যাপারেও কোনো প্রশ্ন তুলছে না। একত্রে বাস করারও কোনো প্রস্তাব দিচ্ছে না। তাদের প্রস্তাব একটাই, আর তা হচ্ছে, রসূলরা যেন ওদের ধর্মে ফিরে যায় এবং ওদের সমাজে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এতে রাযি না হলে তাদের প্রতি চূড়ান্ত কথা, তাদের এলাকা থেকে বের করে দেয়া হবে এবং আর কখনো ওই এলাকায় ফিরে আসতে দেয়া হবে না।

রসূলরাও তাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া অথবা নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে তাদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া বা নিজেদের পরিচয় ভুলে যাওয়া কখনোই কবুল করেননি। তারা তো ভালো করেই জানতেন, তাদের পরিচয় এবং জাহেলিয়াতের অনুসারীদের পরিচয় কখনোই এক নয়। জাহেলিয়াতের রীতি নীতি এবং তাদের রীতি নীতি সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামের সঠিক তাৎপর্য যারা বুঝেনি, বা ইসলামী সমাজ কোন নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সেটা যারা জানে না, তারা যেমন করে বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, ওদের সাথে মিশে গিয়েও তো আমরা ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবো এবং তাদের মধ্যে থেকেই আমরা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রচারের খেদমত আঞ্জাম দেবো'– এটাও তারা বলেননি!!!

এটা স্পষ্ট হতে হবে, জাহেলী সমাজের মধ্যে মুসলমানদের অবশ্যই তাদের আকীদার কারণেই পৃথক করে চেনা যাবে এবং ওদের থেকে পার্থক্য করা যাবে। কোনো প্রকারের জাহেলী সমাজের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকা তাদের কাজ নয়। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা ইসলামী সমাজ হিসাবে বেঁচে থাকবে, গড়ে তুলবে ইসলামী সমাজের নিয়ম পদ্ধতি এবং তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের স্বার্থেই নেতৃত্ব কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে ইসলামের আইন কানুন সমাজ রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে চালু করবে।

এভাবে ইসলামী সমাজব্যবস্থা, আইন কানুনের মর্যাদা ও সুফল ভোগ করে মানুষ শান্তি পাবে এবং অপরকে শান্তি দেবে। যেন এসব দেখে জাহেলী সমাজের মানুষেরা প্রভাবিত হয়, কায়েমী স্বার্থবাজরা যদি প্রভাবিত নাও হয়– সাধারণ অবহেলিত, মযলুম ও বিবেকবান ব্যক্তিরা যেন ইসলামের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে। আর এভাবেই মানুষ মানুষের গোলামী থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিজেদের সোপর্দ করতে পারে এবং নিজেদের মেকি প্রভুদের নাগপাশ ও শাসন কর্তৃত্বের বন্ধন থেকে, তাদের ভুয়া আধিপত্যের দাবী থেকে মুক্ত করতে পারে। ইসলামী আন্দোলনকর্মীদের আর এক দায়িত্ব হচ্ছে, ওইসব মুসলমানদেরও জাহেলী সমাজ থেকে বের করে নেয়া, যারা ওই সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজেদের রীতি নীতি, আইন কানুন, রুচি সভ্যতা, সাহিত্য কৃষ্টি, আচার ব্যবহার সব কিছু হারাতে বসেছে। আজ তারা ইসলামের খাদেম হওয়ার পরিবর্তে জাহেলিয়াতের খাদেম হতে বাধ্য হয়ে গেছে এবং যারা বহু আত্মবিস্মৃত মানুষকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারতো, তারা আজ উপরোক্ত অবস্থাকে স্বাভাবিক মনে করে ধোকার মধ্যে রয়েছে।

এরপর বাকী থেকে যায় তাকদীরের বিষয়টি, যা ইসলামের দাওয়াতদানকারীদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বন্ধুদের সাহায্য ও ক্ষমতাদানের যে ওয়াদা করেছেন তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন, মোমেনদের তাদের স্বজাতীয় জাহেলদের থেকে পৃথক করে দেবেন। তবে ততোদিন এ অবস্থা আসবে না এবং তাদের এ মর্যাদা ততোক্ষণ পর্যন্ত দেয়া হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতদানকারীদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে নেন এবং না দেখে নেন যে, তারা আল্লাহর পথে এককেন্দ্রিক হয়ে গেছে। ঈমানের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই তখন তিনি তাদের নিজ (জাহেল) জাতি থেকে পৃথক করে দেবেন। এ পৃথকীকরণের কাজটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতোক্ষণ না তারা জাহেলী সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে আসবে। যতোদিন তারা জাহেলী সমাজে বাস করে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকবে, আনন্দের মধ্যে ও ভোগবিলাসের মধ্যে থাকবে এবং ওই জাহেলী সমাজের গঠন ও সৌন্দর্য বর্ধন করতে থাকবে, তারা যতোদিন তাদের নিজ জাতির মধ্যে থেকে এভাবে ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকবে, ততোদিন আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব হবে, ততোদিন তাদের হাতে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাও দেবেন

না। যারা নিজেদের মনে প্রাণে আল্লাহর বান্দা মনে করে, এভাবে জাহেলী সমাজে তাবেদার হয়ে বসবাস করা তাদের শোভা পায় না। যারা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত অপরের কাছে তুলে ধরতে চায় তাদের মনে রাখতে হবে, তারা সবাই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতদানকারী।

পরিশেষে......... ঈমানের মিছিলে কোরআনুল করীম প্রাণ মাতানো যে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে এখন আমরা সেই সুন্দরের সমারোহের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি। আল কোরআন তার এ অভূতপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে যুগ যুগ ধরে জাহেলিয়াতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এ হচ্ছে সত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। এ সত্য সুপ্রশস্ত বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা গভীর ও তুলনাহীন সৌন্দর্যের প্রতীক, এ সৌন্দর্য শান্ত, স্নিগ্ধ, অম্লান ও অতুলনীয়।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى

'তাদের রসূলরা (তাদের) বললো, তোমাদের কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আছে– যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের (তাঁর নিজের দিকে) ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিতে পারেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ (দিয়ে সংশোধনের সুযোগ) দিতে পারেন? (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-১০)

দেখুন, আল কোরআন সীমা লংঘনকারী ও হতভাগা মানবজাতিকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে রসূল (স.)-এর যবানীতে কী মহব্বতের সাথে, কী আবেগভরা কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে!

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُونَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ع

'নবীরা তাদের বললো (এটা ঠিক), আমরা তোমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান (নবুওতের দায়িত্ব দিয়ে) তার ওপর তিনি অনুগ্রহ করেন; আর আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতিরেকে দলীল উপস্থাপনের কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই; আর ঈমানদারদের তো (এসব ব্যাপারে) আল্লাহর (ফয়সালার) ওপরই নির্ভর করা উচিত। (তাছাড়া) আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করবোই না কেন? তিনিই আমাদের (জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে আলোর) পথসমূহে হেদায়াত দান করেছেন, (এই

আলোর পথে) তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছো তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো, (সর্বশেষে কারো ওপর) নির্ভর করতে হলে সবার আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।' (সূরা ইবরাহীম, ১১-১২)

এ চমৎকার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তখন, যখন আল্লাহর একত্বের বিরোধী জাহেলী শক্তির মোকাবেলায় একের পর এক রসূল এসে যে দাওয়াত দিয়েছেন, যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত দৃশ্যাবলীর দিকে অংগুলি সংকেতের মাধ্যমে আবেদন রেখেছেন, তার মধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর প্রতীকগুলো তুলে ধরে তাদের দ্বীনের দিকে ডেকেছেন, কিন্তু জাহেলী সমাজের লোকেরা তা অগ্রাহ্য করার কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি, তবুও ওই হঠকারীর দল শিক্ষা নেয়নি।

এরপর চির সুন্দর মহান আল্লাহর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে আল কোরআনের মধুর বাণীতে, ফুটে উঠেছে আল্লাহর রসূলদের উপস্থাপিত সত্যের মধ্যে এবং ফুটে উঠেছে সৃষ্টির বুকে লুকিয়ে থাকা পরম সত্যের মধ্যে!

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

'তাদের রসূলরা (তাদের) বললো, তোমাদের কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আছে– যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা?' (ইবরাহীম, ১০)

'(তাছাড়া) আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করবোই না কেন? তিনিই আমাদের (জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে আলোর) পথসমূহে হেদায়াত দান করেছেন,'

এভাবে এ দাওয়াতের মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে এবং সৃষ্টির মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তা ভাস্বর হয়ে উঠছে এবং স্পষ্ট হয়ে উঠছে সত্য বলতে যেখানে যা কিছু আছে। এসব কিছু মিলে একথাই জানাচ্ছে, সকল কিছুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হচ্ছে এক আল্লাহর সাথে। এ সত্য চিরস্থায়ী ও মযবুত, যার শিকড় বহু বহু গভীরে! যেমন একটি পবিত্র গাছ, যার মূল দৃঢ়ভাবে স্থাপিত গভীর মাটির নীচে এবং তার শাখাগুলো ছড়িয়ে আছে সুউচ্চ আকাশে ... এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে সবই বাতিল এবং ধ্বংসশীল। যেমন মন্দ গাছ, যার শিকড় ওপরে ভেসে বেড়ায়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

এভাবে রসূলদের চেতনায় তাদের প্রতিপালক আল্লাহর যে সত্যতা, তারই সুন্দর রূপ বিধৃত হয়েছে আল কোরআনে। এ সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সত্যতার মধ্যে, যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ওইসব নেক বান্দার অন্তরের মধ্যে।

'আর আমাদের কী হলো, আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করছি না, অথচ তিনি তো আমাদের বহু পথ দেখিয়েছেন, আর তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিয়েছো তার ওপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো, আর তাওয়াক্কুল যারা করে তাদের আল্লাহর ওপরেই তাওয়াক্কুল করা দরকার।'

আর এসবগুলোই হচ্ছে ওই চমৎকার সৌন্দর্যের দৃশ্য, যার ব্যাখ্যা দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কিছু ইংগিত দেয়া যায় মাত্র, যেমন দূর আকাশের তারকারাজির প্রতি ইংগিতই করা যায়, এ ইংগিত দ্বারা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না; বরং শুধুমাত্র এতোটুকু বলা যায়, চোখ তার কিছু আলোক ছটা দেখতে পেয়েছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۙ - جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ - وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّارِ

'(হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করোনি যারা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত অস্বীকার করার মাধ্যমে (তা) বদলে দিয়েছে, পরিণামে তারা নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের (এক চরম) স্তরে নামিয়ে এনেছে, জাহান্নামের (অতলে), যেখানে তারা সবাই প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান! এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে তার কিছু সমকক্ষ উদ্ভাবন করে নিয়েছে, যাতে করে (সাধারণ মানুষদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে; (হে নবী, এদের) তুমি বলো, (সামান্য কিছুদিনের জন্যে) তোমরা ভোগ করে নাও, কেননা (অচিরেই জাহান্নামের) আগুনের দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ২৮-৩০)

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا أَنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ

'এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহা) পয়গাম, যাতে করে এ (গ্রন্থ) দিয়ে পরকালীন আযাবের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে) এও জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (ইবরাহীম, ৫২)

বাধা বিপত্তি ও ইসলামী আন্দোলনে গতিশীলতা

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

'এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে অপরাধীদের মধ্য থেকে একজন শত্রু তৈরী করে রেখেছি। তবে তোমার প্রভুই তোমার সুপথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।' (সূরা আল ফোরকান, আয়াত ৩১)

আলোচ্যে আয়াতে কাফের মোশরেকদের প্রচন্ড বাধা বিপত্তি ও যুলুম নির্যাতনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ও সমবেদনা জানাচ্ছেন যে, প্রত্যেক নবীরই কিছু শত্রু থাকতো, যারা তার কাছে আগত হেদায়াতের বাণীকে পরিত্যাগ করতো এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দিতো। তবে আল্লাহ

তায়ালা তাঁর নবী ও রসূলদের কিভাবে তাঁর শত্রুদের ওপর বিজয়ী হওয়া যায়, তা শিক্ষা দিয়েছেন। সূক্ষ্ম ও অব্যর্থ কৌশল একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই প্রয়োগ করে থাকেন।

ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে শত্রু সৃষ্টিও আল্লাহ তায়ালার এক সুনিপুণ কৌশল। এসব শত্রুর আবির্ভাব দাওয়াতকে শক্তিশালী করে এবং আন্দোলনকর্মীদের সংকল্পকে দৃঢ়তা দান করে। দাওয়াতে নিয়োজিত লোকেরা যখন এসব শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন এতে তাদের যতো কষ্টই হোক এবং দাওয়াত যতোই বাধাগ্রস্ত হোক, তখন এ সংগ্রামই সত্য দাওয়াতকে মিথ্যা ও মেকি দাওয়াত থেকে পৃথক করে। এ সংগ্রামই একনিষ্ঠ দাওয়াতদাতাদের ভন্ড ও প্রতারকদের থেকে বাছাই করে আলাদা করে। ফলে সংগ্রামের পর মুসলমানদের মধ্যে কোনো লোভী ও ভন্ড থাকতে পারে না, সবাই একনিষ্ঠ ও খাঁটি মোমেন হয়ে যায়, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু চায় না।

দাওয়াত যদি সহজ কাজ হতো, তার পথ যদি কুসুমাস্তীর্ণ হতো, তার পথে যদি শত্রু ও বিরোধী না থাকতো, তাকে প্রত্যাখ্যান ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করার মতো লোক না থাকতো, কায়েমী স্বার্থবাদী বাতিল শক্তির সাথে সহাবস্থান করে সুখে শান্তিতে দাওয়াতী অভিযান পরিচালনার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই দা'য়ী হয়ে যাওয়া সহজ হতো। হক ও বাতিলের সাথে মিশ্রিত হয়ে দাওয়াত একাকার হয়ে যেতো এবং সন্দেহ সংশয় ও ফেতনা বেড়ে যেতো। দাওয়াতের সামনে শত্রু ও বিরোধীর আবির্ভাব তার বিজয়ের সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে এবং তার জন্যে দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষাকে তার বিজয়ের সহায়কে পরিণত করে। এ জন্যেই একনিষ্ঠ, দৃঢ়সংকল্প ও আপসহীন মোমেনরা ছাড়া সংগ্রাম করতে পারে না, দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। কারণ তারা তাদের দাওয়াতকে আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। এমনকি দাওয়াতের জন্যে যখন শাহাদাতলাভ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদের জীবনের ওপরও দাওয়াতকে অগ্রাধিকার দেয়। তিক্ত ও কষ্টকর সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে শুধু তারাই, যারা সবচেয়ে দৃঢ় ও মযবুত ঈমানের অধিকারী, যারা সবচেয়ে কঠিন, অনমনীয় ও অবিচল মনোবলের অধিকারী, যারা আল্লাহর পুরস্কার লাভে অধিকতর আগ্রহী এবং মানুষের কাছ থেকে স্বার্থোদ্ধারে যাদের সর্বাধিক অনীহা। এভাবেই সত্যের দাওয়াত বাতিলের দাওয়াত থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবেই দৃঢ় ঈমানধারী লোকেরা দুর্বল ঈমানধারী লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবেই ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনে দুঃখ কষ্ট, বাধাবিপত্তি ও ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দৃঢ়চেতা লোকদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন সামনে এগুতে থাকে। এসব লোকই ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের বিশ্বস্ত পতাকাবাহী। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনকে বিজয়ী করতে যা কিছু করা দরকার, তা তারাই করে থাকে। অতীতে এ ধরনের অমিততেজা লোকেরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অনেক মূল্য দিয়ে বিজয় অর্জন

করেছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অগ্নি পরীক্ষা তাদের শিখিয়েছে পর্বত প্রমাণ বাধা ডিংগিয়ে কিভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হয়। ভয়ভীতি, বাধা-বিপত্তি তাদের শক্তি ও মনোবলই শুধু নয়, তাদের জ্ঞানও বহুগুণ বৃদ্ধি করে। ঈমানী শক্তির সাথে বাস্তব ময়দানে সঞ্চিত শক্তি ও জ্ঞানের এ পুঁজিই তাদের দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রেরণার উৎস এবং এ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই তারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকা সমুন্নত রাখে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে তা হচ্ছে, অপরাধীদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের সংঘর্ষ অধিকাংশ মানুষ প্রথমে নীরব দর্শক হয়ে উপভোগ করে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন ইসলামী শিবিরে ক্ষয়-ক্ষতি, কোরবানী ও দুঃখ কষ্টের মাত্রা বেড়ে যায় এবং তখনো তারা দাওয়াতের কাজে অবিচল থেকে সামনে এগুতে থাকে, তখন নীরব দর্শক জনতা বলে বা ধারণা করে, হয়তো এতো ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখকষ্টের পর এরা আর দাওয়াতের ওপর টিকে থাকতে পারবে না। তবে এ পর্যায়ে এসেও যখন তারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ পথে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তখন তাদের এ বিশ্বাস জন্মে যে, এ দাওয়াত ও আন্দোলনে নিয়োজিত লোকেরা যা কিছু হারাচ্ছে, তার চেয়েও মূল্যবান একটা কিছু নিশ্চয়ই তারা অর্জন করছে। যা তাদের কাছে দুনিয়ার যাবতীয় সহায় সম্পত্তি এমনকি তাদের জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয় ও মূল্যবান। অবশেষে তারা সেই আকীদা ও আদর্শের সন্ধান পেয়ে যায় যা জীবন ও সহায় সম্পদের চেয়ে মূল্যবান এবং দীর্ঘকাল নীরব দর্শক হয়ে লড়াই দেখার পর দলে দলে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ গ্রহণ করে।

এ উদ্দেশেই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীর জন্যে অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু সৃষ্টি করেছেন। এ উদ্দেশেই অপরাধীদের ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধক শক্তিতে পরিণত করেছেন, আর আন্দোলনকারীদের অপরাধীদের বিরুদ্ধে করেছেন সংগ্রামমুখর। এতে তাদের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ যতোই হোক, দাওয়াতকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে। ফলাফল আগে থেকেই নির্ধারিত ও জানা। আল্লাহর ওপর যাদের অটুট আস্থা রয়েছে, তারা নির্ভুলভাবে জানে, এর ফলে আর যাই হোক, সত্যের সন্ধানলাভ এবং বিজয় অর্জন তাদের জন্যে সুনিশ্চিত। আল্লাহ তায়ালা তাই বলেছেন–

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيرًا

'হেদায়াতকারী ও বিজয়দানকারী হিসেবে তোমার প্রভুই যথেষ্ট।' (আল ফোরকান, ৩১)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী আন্দোলনের পথে অপরাধী গোষ্ঠীর বাধা হয়ে দাঁড়ানো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা ইসলামের দাওয়াত ঠিক এমন সময়ই আবির্ভূত হয়, যখন সমাজে বা সমগ্র মানবজাতির ভেতরে পুঞ্জীভূত বিকৃতি শোধরানোর জন্যে তার আগমন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ বিকৃতি তাদের মনমগয, চরিত্র ও গোটা সমাজ ব্যবস্থায় সংক্রমিত হয়। অপরাধীরাই এ বিকৃতির মূল সংগঠক। তারাই সমাজে বিকৃতি ও দুষ্কৃতির জন্ম দেয় এবং তাকে কাজেও লাগায়। সমস্ত বিকৃতি ও দুষ্কৃতির ধারক

বাহকরা ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকে এবং দুষ্কৃতিতে ভরা নোংরা অসুস্থ সামাজিক পরিবেশেই জীবন ধারণ করে। কেননা এ সামাজিক পরিবেশেই তাদের বিকৃত মূল্যবোধ টিকে থাকে, আর সে বিকৃত মূল্যবোধ ও বাতিল ধারণা বিশ্বাসই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। কাজেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই দ্বীনী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ স্বাভাবিক। যে ধরনের সামাজিক পরিবেশ ছাড়া তারা জীবন ধারণ করতে অপারগ, সে পরিবেশ টিকিয়ে রাখতে তারা যে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, তা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। এটা সুবিদিত, কোনো কোনো পোকা-মাকড় ফুলের সুগন্ধে দম আটকে মরে যায় এবং ময়লা আবর্জনা ছাড়া তারা জীবন ধারণই করতে পারে না। কোনো কোনো কীটপতংগ বহমান পবিত্র পানিতে মারা যায় এবং নোংরা নর্দমা বা আঁস্তাকুড় ছাড়া বাঁচে না। মানবসমাজে যারা পাপী ও অপরাধী, তারাও তদ্রপ। তাই তারা যে ইসলামের দাওয়াতের শত্রু হবে এবং তার মরণপণ প্রতিরোধে লিপ্ত হবে, সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আর শেষ পরিণতিতে ইসলামের দাওয়াতই যে বিজয়ী হবে, তাও স্বাভাবিক। কেননা তা জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর সাথে তার মিলিত হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তার সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করা অবধারিত।

পঞ্চম অধ্যায়

দাওয়াতের কাজে আপসের নীতি

রসূলুল্লাহ (স.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পুরো বিধান পুংখানুপুংখ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন। আর তিনি এ হকের বাণী প্রচার করতে গিয়ে পার্থিব কোনো বিবেচনা যেন সামনে না রাখেন। এমনটি করলে মনে করতে হবে তিনি যেন রেসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি আঞ্জাম দেননি এবং তাঁর পয়গাম সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাননি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মানুষের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করবেন। যার হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং রব্বুল আলামীন নিজ হাতে গ্রহণ করেন, অন্য মানুষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

নিসন্দেহে ঈমানের বাণী প্রচারে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগা আদৌ উচিত নয়; বরং তা পুরোপুরি নিসংকোচে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিত। এতে বিরুদ্ধাচরণকারীরা যা বলার বলুক এবং দ্বীনের শত্রুরা যা করার করুক। কারণ ঈমান আকীদার সত্য বাণী কারো কামনা বাসনার তোষামোদ ও তাবেদারী করে না। অনুরূপভাবে তা মনের অনাকাংখিত ইচ্ছার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না; বরং তা একমাত্র এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে যে, ঈমানের প্রচার এমনভাবে হোক যেন তা মানব অন্তরের অন্তস্তলে কার্যকরি অবস্থায় পৌঁছে।

ঈমান আকীদার এ সত্যবাণী বলিষ্ঠ ও চূড়ান্তভাবে প্রচার করার অর্থ কর্কশতা নিষ্ঠুরতা নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর পথে আহবান করার জন্যে নির্দেশ করেছেন। এক্ষেত্রে কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন নির্দেশের মাঝে পারস্পরিক কোনো বিরোধিতা ও সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়নি। হেকমত এবং উত্তম উপদেশ স্বয়ং বর্ণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অকাট্য সত্য নির্দেশের পরিপন্থী নয়। প্রচারের মাধ্যম এবং পদ্ধতি আর খোদ প্রচার ও তার বিষয়বস্তু এক নয়। এক্ষেত্রে কাম্য হচ্ছে পরিপূর্ণ আকীদার সত্য বাণী বর্ণনার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, তোষামোদ ও নমনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ না করা। আকীদাগত বাস্তব সত্যের ক্ষেত্রে আংশিক সমাধান এবং আপসমূলক বক্তব্য বলতে কিছুই নেই। দাওয়াতের সূচনালগ্ন থেকে রসূল (স.) হেকমত ও উত্তম উপদেশের পন্থা অবলম্বন করে দাওয়াত দিতেন। আবার তিনি আকীদার ক্ষেত্রে সব সময়ই চূড়ান্ত বক্তব্য রাখতেন, কোন প্রকার আপসমূলক বক্তব্য থেকে বিরত থাকতেন। রসূল (স.) স্পষ্টভাবে নেককার বান্দা ও নাফরমান বান্দাদের কাজের ভিন্নতা বর্ণনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের

উপস্থাপিত আংশিক সমাধান গ্রহণ করেননি এবং তাদের ইচ্ছামাফিক তোষামোদও করেননি। এমনকি তিনি তাদের এমন কথাও বলেননি যে, তিনি তাদের অবস্থানের সামান্য কিছু পরিবর্তন চান; বরং তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, তারা নিসন্দেহে নির্ভেজাল বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তিনি পরিপূর্ণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি হকের বাণী উঁচু, বলিষ্ঠ, পূর্ণাংগ ও চূড়ান্তরূপে এমন বাচনভংগিতে উপস্থাপন করেছেন, যাতে কোনো প্রকার কর্কশতা ও কঠোরতা ছিলো না।

আপসের প্রস্তাবে আল্লাহর রসূলের জবাব

এই বিশাল বিশ্বজগতে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, তাদের আচরণটা কেমন একগুঁয়েমি! কোন ধরনের হঠকারিতা! যেখানে আকাশ ও পৃথিবী তাদের প্রতিপালকের কাছে নতি স্বীকার করে বলে; 'আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে এসেছি', সেখানে এই ক্ষুদ্র ও অক্ষম মানুষ কিনা আল্লাহর সাথে কুফরী করার ধৃষ্টতা দেখায়? শুধু তা-ই নয়; বরং তারা আল্লাহর নবী ও দ্বীনের পথের আহবানকারীদের তাদের দাওয়াত বন্ধ করে জাহেলিয়াতের সাথে আপস করার প্রস্তাব দেয়। এ ধৃষ্টতা ও স্পর্ধার শাস্তি কী হওয়া উচিত? মহান আল্লাহ আ'দ ও সামূদের ইতিহাস বর্ণনা করে এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন–

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ۝ - اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۝ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ - فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۝ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ - فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۝ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ - وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ج

'(এতো করে বুঝানোর পরও) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তো তোমাদের এক ভয়াবহ (ধ্বংসাত্মক) আযাব থেকে সতর্ক করলাম মাত্র– ঠিক যেরূপ ভয়াবহ আযাব (এসেছিলো) আদ ও সামুদের (ওপর), যখন তাদের কাছে ও তাদের আগের লোকদের কাছে আমার রসূলরা এসে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী করো না, (জবাবে) তারা বলেছিলো, আমাদের মালিক যদি চাইতেন তাহলে তিনি ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, তোমাদের

যা কিছু দিয়েই পাঠানো হোক না কেন, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম। আ'দ (জাতির ঘটনা) ছিলো এই, তারা (আল্লাহ তায়ালার) যমীনে অন্যায়ভাবে দম্ভভরে ঘুরে বেড়াতো এবং বলতো, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? অথচ ওরা কি চিন্তা করে দেখেনি, যে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি শক্তির দিক থেকে তাদের চাইতে অনেক বেশী প্রবল; (আসলে) ওরা আমার আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করতো। অতপর আমি কতিপয় অশুভ দিনে তাদের ওপর এক প্রচন্ড তুফান পাঠালাম, যেন আমি তাদের দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাদায়ক একটি শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়ে দিতে পারি, আর আখেরাতের আযাব তো আরো বেশী অপমানকর, সেদিন তাদের তো কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না, আর সামুদ (জাতির অবস্থা ছিলো এই যে), আমি তাদেরও সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের বদলে অন্ধকারের ওপর থাকাকেই বেশী পছন্দ করলো, অতপর তাদের অন্যায় কাজ কর্মের জন্যে আমি তাদের ওপর অপমানজনক শাস্তির কষাঘাত হানলাম।' (হা-মীম আস সাজদা, আয়াত ১৩-১৮)

'তাহলে বলে দাও, আমি তোমাদের আ'দ ও সামূদের ন্যায় দুর্যোগ থেকে সাবধান করে দিয়েছি'- এ ভয়ংকর সতর্কবাণী কাফেরদের ধৃষ্টতা ও অপরাধের ভয়াবহতার সাথে সংগতিপূর্ণ। আলোচ্য সূরার শুরুতেই তাদের এই অপরাধ ও ধৃষ্টতার উল্লেখ রয়েছে। সেই সাথে মানবজাতির মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা যে গোটা সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন, এ সতর্কবাণী উচ্চারণের আগে সে কথাও জানানো হয়েছে।

এ সতর্কবাণী কি পরিবেশে উচ্চারিত হয়েছিলো সে সম্পর্কে ইবনে ইসহাক একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটা হলো-

'বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা ওতবা ইবনে রবিয়া একদিন কোরায়শদের এক বৈঠকে বসে ছিলো। সে সময় রসূল (স.) মাসজিদুল হারামে একাকী বসে ছিলেন। ওতবা বললো, 'শোনো কোরায়শ বংশধররা! যদি আমি মোহাম্মদের (স.) কাছে গিয়ে একটু কথা বলি এবং তার কাছে আপসের কিছু প্রস্তাব দেই, সেটাকে তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করো না? সে হয় তো এসব প্রস্তাবের কোনো কোনোটা গ্রহণ করবে এবং আমরা তার মধ্যে যা যা তাকে দেয়া পছন্দ করি দেবো। এর বিনিময়ে সে হয় তো আমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকবে।' উল্লেখ্য, এ সময় হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূল (স.)-এর সাথীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো। লোকেরা ওতবাকে বললো, ঠিক আছে, আপনি গিয়ে আলোচনা করুন। ওতবা রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে বললো, শোনো ভাতিজা, তুমি আমাদের গোত্রের মধ্যে কতোটা মর্যাদা রাখো, তা তুমি ভালো করেই জানো, কিন্তু তুমি এমন একটা গুরুতর বাণী নিয়ে এসেছো যা দ্বারা তুমি তাদের ঐক্যে ভাংগন ধরিয়েছো, তাদের সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দিয়েছো, তাদের উপাস্যদের ও তাদের ধর্মের খুঁত বের করেছো এবং তাদের মৃত পূর্ব-পুরুষদের বিধর্মী আখ্যায়িত করেছো। এমতাবস্থায় আমি তোমার কাছে কয়েকটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, তুমি তা মন দিয়ে শোন ও বিবেচনা করো। হয় তো তুমি এগুলোর ভেতরে অন্তত কিছু না কিছু গ্রহণ করতে

পারবে। রসূল (স.) তাকে বললেন, আচ্ছা বলুন, আমি শুনবো। সে বললো! ভাতিজা, তুমি যে বাণী নিয়ে এসেছো, তা দ্বারা তুমি যদি অর্থ উপার্জন করতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে অনেক অর্থ সংগ্রহ করে দেবো, যাতে তুমি আমাদের ভেতরে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবে। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও, তাহলে আমরা তোমাকে নেতা বানিয়ে নেবো। কোনো কাজই তোমাকে বাদ দিয়ে করবো না। আর যদি তোমার রাজা হবার শখ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানাবো। আর যদি ব্যাপারটা এমন কিছু হয়ে থাকে যে, তোমার কাছে যে অশরীরী আত্মা আসে, তাকে তুমি দেখতে পাও, কিন্তু তুমি ঠেকাতে পারো না, তাহলে আমরা তোমার জন্যে ডাক্তার কবিরাজ ডাকবো এবং যতো টাকা লাগুক খরচ করবো। তবু তোমাকে সুস্থ না করে ছাড়বো না। জানি, এমন ঘটনাও কখনো কখনো ঘটে, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অনুগত বানাতে চায়, সে নিজেই তার কাছে পরাভূত হয়ে যায় এবং চিকিৎসা না করালে সে আর তা থেকে মুক্তি পায় না।

এ পর্যন্ত বলে ওতবা যখন কথা শেষ করলো, তখন রসূল (স.) বললেন, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বললো, 'হাঁ। আমার কথা শেষ।' রসূল (স.) বললেন, এখন তাহলে আমি যা বলি শুনুন। সে বললো, বলো। রসূল (স.) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম' বলে এ সূরার শুরু থেকে পড়তে শুরু করলেন। ওতবা চুপচাপ করে পিঠের পেছনে হাত দুখানা রেখে তার ওপর ভর দিয়ে শুনতে লাগলো। রসূল (স.) যখন সাজদার আয়াতে পৌঁছলেন, অমনি সাজদা করলেন। তারপর বললেন, যা শুনলেন, তাতো শুনলেনই। এখন আপনি ভেবে দেখুন কী করবেন। ওতবা উঠে লোকজনের কাছে চলে গেলো। ওতবাকে আসতে দেখে কোরায়শরা বলাবলি করতে লাগলো, আল্লাহর কসম, ওলীদের বাবা যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো, এখন আর সে চেহারা নেই। ওতবা তাদের কাছে এসে বসলে সবাই তাকে বললো, আপনার কী হয়েছে। সে বললো, কী আর হবে? আমি, আজ যে বাণী শুনেছি, তেমন বাণী আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, এটা যাদুও নয়, কবিতাও নয়, জ্যোতিষীর বাণীও নয়। হে কোরায়শ, তোমরা আমার কথা শোনো এবং এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, এ লোকটা যা করছে করুক। ওর পথ থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও। তার যে কথাবার্তা আমি শুনেছি, তার কিছু না কিছু ফল ফলবেই। আরবরা যদি তাকে দমন করে তাহলে তোমাদের কিছু করতে হলো না। তোমরা নিজেরা কিছু না করেই তার কবল থেকে রেহাই পেয়ে গেলে। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে। তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান হবে। তোমরা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী জাতি। তারা বললো, আল্লাহর কসম, হে আবুল ওলীদ, সে এবার তোমার ওপরও যাদু করেছে। ওতবা বললো, এ হলো আমার মত। এখন তোমরা যা ভালো বুঝ করো।

ইমাম বাগাওয়ী বর্ণনা করেন, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, রসূল (স.) আ'দ ও সামূদের বিবরণ সম্বলিত আয়াত পড়তে শুরু করামাত্রই ওতবা

তার মুখ চেপে ধরলো, তাঁর করুণা ভিক্ষা করলো এবং কোরায়শদের বৈঠকে ফিরে না গিয়ে সোজা নিজের বাড়ীতে চলে গেলো এবং কোরায়শদের থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে লাগলো।

পরে যখন ওরা এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো তখন ওতবা বলতে শুরু করলো, 'আমি সংগে সংগে তার মুখের ওপর হাত রেখে দিলাম এবং তার জাতির ওপর রহম করার জন্যে তাকে অনুরোধ করলাম। তাকে মিনতি করে বললাম, যেন সে থেমে যায়। অতপর সে বললো, তোমরা তো জানোই, মোহাম্মদ যখন যা কিছু বলেছে কখনোই মিথ্যা কথা বলেনি। এ জন্যে আমার ভয় হলো, অবশ্যই তোমাদের ওপর আযাব নাযিল হয়ে যাবে।'

এটা ছিলো একটা বাস্তব ঘটনা, তারা জানতো এবং বিশ্বাস করতো যে, রসূল (স.)-এর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলে তা কখনো মিথ্যা হয় না। যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি তার অন্তরেও এ কথাটা জাগ্রত ছিলো। এ বর্ণনাটি আমরা আরও একটু গভীরভাবে বুঝতে চাই। বাহ্যিক দিক দিয়ে যে কথাগুলো বুঝা যাচ্ছে তার ওপরেই আমরা কথাটা ছেড়ে দিতে চাই না। আসুন, আমরাও আমাদের প্রিয় নবী (স.)-এর চেহারার সামনে একবার দাঁড়াই।

ওতবা যখন এ কথাগুলো বলছিলো এবং সেই ছোট্ট ঘটনাটি উল্লেখ করছিলো, তখন তার চেহারায় যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিলো, তার থেকে তার অন্তরের অবস্থা ছিলো আরও বেশী প্রভাবিত, যার কারণে তার মুখ দিয়ে সেই কথাগুলো বের হচ্ছিলো। তার হৃদয় মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছিলো, যার চিহ্ন তার চেহারায় ফুটে উঠছিলো, কিন্তু রসূল (স.) ধীর স্থিরভাবে ও নির্লিপ্ত মনে এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, প্রশান্ত বদনে তার কথাগুলো শুনছিলেন। সত্যের মধুর পরশে তিনি ছিলেন পরিতৃপ্ত। তিনি ছিলেন ধীরস্থির ও দরদী। তিনি ওতবার সাথে কথা বলার সময় কোনো ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন না। তার কথাগুলো পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন ও শান্তভাবে তার জবাব দিচ্ছিলেন। ওতবার কথা শেষ হলে তখন অত্যন্ত শান্তভাবে ও দৃঢ়কণ্ঠে খুবই শালীনতার সাথে বললেন, 'আবু ওলীদ, আপনার কথা শেষ হয়েছে কি?' সে বললো, 'হাঁ। তখন রসূল (স.) বললেন, তা হলে এবার আমার কথা শুনুন। এরপর নবী করীম (স.) নিজের থেকে আর কোনো কথা না বলে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও গভীর আবেগের সাথে সূরা হা-মীম আস সাজদা তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। প্রশান্ত বদনে ও মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত মহান আল্লাহর বাণী দিগন্তবলয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ছড়িয়ে পড়ছিলো। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হামীম....... উচ্চারিত সে আয়াতগুলে ওতবার ভীত প্রকম্পিত বিহ্বল চিত্তো মধুর পরশ বুলিয়ে দিলো। সে শুনছিলো আর তার মন ডেকে বলছিলো, আহা, একি মধুর বাণী, অপূর্ব এর সুরলহরী, কী মায়াভরা কথা, কী সম্মোহনী মমতা বহন করছে এ বাণীর প্রতিটি ছত্র। সে আপনহারা হয়ে শুনছিলো আর ভাবের আবেগে দুলছিলো। হাঁ, এ বাণী চিরদিন সকল শ্রোতার হৃদয়ে মধু ঝরায়। যারা এ বাণী উপেক্ষা করে, ঠাট্টা মস্কারা

করে, কিন্তু এ বাণী শোনার পর তাদের হঠকারী হৃদয়েগুলোও বিগলিত হয়ে যায়। অতএব দ্বীনের পথে আহবানকারীদেরও মনে রাখতে হবে, বাতিলের আপস প্রস্তাব শুনে তারা যেন সে প্রস্তাবের সুবিধা অসুবিধা যাচাই করতে লেগে না যান; বরং যে ধরনের সুযোগ সুবিধার প্রস্তাবই আসুক না কেন, সর্বাবস্থায় দ্বীনের শাশ্বত বাণী তাদের সামনে রসূলের আদর্শ অনুযায়ী তুলে ধরতে হবে। এতেই কল্যাণ নিহিত, এতেই রয়েছে সফলতা।

বাতিলের সাথে আপস

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ق وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ق وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ

'অতএব তোমরা কখনো হতোদ্যম হয়ে পড়ো না এবং (গায়ে পড়ে) সন্ধির দিকে এগিয়ে যেয়ো না, (কেননা শেষতক) বিজয়ী তোমরাই হবে, আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের সাথেই রয়েছেন, তিনি কখনো তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না।' (সূরা মোহাম্মাদ, আয়াত ৩৫)

আলোচ্য আয়াতে কঠিন পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে গিয়ে মুসলমানদের হীনবল হয়ে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে তাদের সামনে রসূলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কাফেরদের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মোমেনরা যেন দূর থেকে এ দানবরূপী পরিণতিকে ভয় করে চলে।

এ সাবধানবাণী ইংগিত বহন করে যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে এমন বেশ কিছু লোকও ছিলো যারা জেহাদের মতো দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য দায়িত্ব পালনকে একটা বোঝা মনে করতো। এ বোঝা বহন করতে গিয়ে তারা হীনবল ও ধৈর্যহারা হয়ে পড়তো এবং যুদ্ধ বিগ্রহের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি করতে আগ্রহবোধ করতো। তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলো যাতে জেহাদের মতো এতো কষ্টসাধ্য কোনো কাজে না জড়াতে হয়। তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা চাইতো না তা নয়, তবে চাইতো 'যেন সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাংগে'।

তাছাড়া মোশরেকদের সাথে তাদের অনেকেরই আত্মীয়তার সম্পর্কসহ ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থ জড়িত ছিলো। এসব কারণে তারা সন্ধি ও শান্তিচুক্তির জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠতো। এটাই মানবিক দুর্বলতা। এ দুর্বলতা এবং স্বভাবজাত মনোবৃত্তি কাটিয়ে ওঠার জন্যে ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা অভাবনীয় সফলতা দেখাতেও সক্ষম হয়েছে। তা সত্ত্বেও মাদানী যুগের সেই গোড়ার দিকে দুর্বলচিত্তের কিছু লোকের অস্তিত্ব থাকাটা বিচিত্র ছিলো না। এসব আয়াত তাদের সংশোধন করার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই দুর্বলচিত্তের লোকদের সংশোধন পবিত্র কোরআন কিভাবে করে তা লক্ষণীয়। কোরআনের এ শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানবীয় দুর্বলতা সব যুগে একই ধরনের থাকে।

আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরাই বিজয়ী হবে, কাজেই হীনবল হয়ে সন্ধি ও শান্তিচুক্তির পেছনে পড়ো না। কারণ তোমরা ওদের তুলনায় জীবনবোধ, বিশ্বাস ও জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে উন্নত, মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর সাথে যোগসূত্রের ক্ষেত্রেও তোমরা উন্নত। আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও তোমরা উন্নত। শক্তির দিক থেকে, অবস্থানের দিক থেকে এবং সাহায্য সহযোগিতার দিক থেকে তোমরাই উন্নত ও প্রবল। কারণ তোমাদের সাথে রয়েছেন মহাশক্তিধর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তোমরা একা নও। তোমরা রয়েছো সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমতাধর সত্তার তত্ত্বাবধানে। তিনিই তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের সাথে সর্বদা বিচরণকারী। তিনিই তোমাদের রক্ষক ও সহায়ক। কাজেই যখন আল্লাহ তায়ালা নিজে তোমাদের সাথে রয়েছেন তখন শত্রুরা তোমাদের কি ক্ষতি করতে পারবে? তাছাড়া এই জেহাদের জন্যে তোমরা যা কিছু খরচ করছো, যে শ্রম দিচ্ছো এবং যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করছো, এর সব কিছুই তোমাদের আমলনামায় লেখা হচ্ছে। এর একটিও বৃথা যাবে না। তাই বলা হয়েছে, 'তিনি কখনও তোমাদের (নেক) আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না।' অর্থাৎ তোমাদের কর্মের প্রতিদান, ফল ও বিনিময় থেকে আল্লাহ তায়ালা বিন্দুমাত্র হ্রাস করবেন না।

যার সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন, সেই প্রবল, যার সাথে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা রয়েছে, তার কোনো কর্মই বৃথা যাবে না এবং সে সম্মানিত হবে, সমাদৃত হবে, সাহায্যপুষ্ট হবে এবং পুরস্কৃত হবে, তাহলে এমন ব্যক্তি কি কারণে হীনবল হবে এবং সন্ধি ও শান্তিচুক্তির জন্যে অধীর হয়ে পড়বে?

আপসহীনতা ও ইসলামী আন্দোলন

মক্কার মোশরেকরা তাদের আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের অনেক কিছু বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলো, যদি রসূল (স.) তাঁর আনীত আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের সামান্য কিছু অংশ শুধু বাহ্যিকভাবে ছেড়ে দিতে রাযি হতেন। তারা তাদের পৌত্তলিক ধ্যান ধারণার ব্যাপারে আপস করতে, শিথিল হতে প্রস্তুত ছিলো, যাতে রসূল (স.)-ও তাঁর আদর্শ ও আকীদার ব্যাপারে তদ্রূপ করতে প্রস্তুত হয়ে যান।

অর্থাৎ তাদের অবস্থা হচ্ছে, তারা এমন কোনো আকীদার ধারক বাহক নয়, যা তারা আন্তরিকভাবে সত্য সঠিক বলে মানে। তারা কেবল তার বাহ্যিক দিকটাই মানে এবং তা গোপন করে রাখাই সমীচীন মনে করে। নিচের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সে কথাই বলছেন–

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ - وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ

'তুমি এই মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করো না। তারা (তো তোমার এই নমনীয়তাটুকুই) চায় যে, তুমি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো অতপর তারাও (তোমার কিছু) গ্রহণ করবে।' (আল ক্বালাম, ৮-৯)

এটা ছিলো একটা দরকষাকষির ব্যাপার। এ যেন পথের মাঝখানে সাক্ষাতকার, যা ব্যবসায়ীরা সচরাচর করেই থাকে। অথচ ব্যবসায় ও আকীদা বিশ্বাসে অনেক পার্থক্য। আকীদা বিশ্বাসের কিছুই বাদ দেয়া যায় না। কেননা তার ছোটো বড়ো সবটাই সমান।

বরঞ্চ প্রকৃত সত্য, আকীদায় আদৌ কোনো ছোটো বড়ো নেই। আকীদা সবই পরস্পরের পরিপূরক। এর কোনো একটির ব্যাপারেও কেউ অন্যের কথামতো কাজ করে না এবং কখনো তার কিছুই বর্জন করে না।

ইসলাম ও জাহেলিয়াত পরস্পরের সাথে মিলিত হবে কিংবা সহাবস্থান করবে, এটা অসম্ভব। জাহেলিয়াতের প্রতি ইসলামের এই আপসহীন ভূমিকা সকল দেশে ও সকল কালে অব্যাহত। অতীতের জাহেলিয়াত, বর্তমানের জাহেলিয়াত ও ভবিষ্যতের জাহেলিয়াত সবই এখানে সমান। জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝখানে যে দূরত্ব, তা অতিক্রম করার কোনো উপায় নেই, এ দুয়ের মাঝখানে কোনো পুল বা সাঁকোও নেই। কোনো ভাগ বাটোয়ারা বা জোড়াতালি দিয়েও এ ব্যবধান ঘোচানো যায় না। উভয়ে উভয়কে নিশ্চিহ্ন করতে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত। এ সংগ্রামে কোনো মীমাংসা বা সন্ধির অবকাশ নেই।

বহুসংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূল (স.) যাতে আপস রফায় প্রস্তুত হয়ে যান, তাদের দেবদেবীর, তাদের নীতি আদর্শের নিন্দা না করেন, তাদের নীতি আদর্শ, পূজা উপাসনাকে ভুল কাজ না বলেন, অথবা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সহযোগিতা করেন এবং প্রয়োজনে তার বিনিময়ে তারাও রসূলের আনীত দ্বীনী কার্যক্রমে কোনো কোনো বিষয়ে সহযোগিতা করে, তাতে আরব জনসাধারণের সামনে মোশরেক নেতাদের মানসম্ভ্রম কিছুটা রক্ষা পায়, এ জন্যে তারা রসূল (স.)-এর কাছে বিভিন্ন রকমের আপস প্রস্তাব দিতো।

সামাজিক দ্বন্দ্ব মীমাংসার এটা অবশ্যই একটা চিরাচরিত রীতি, কিন্তু রসূল (স.) তার দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। কোনোমতেই আপস মীমাংসা বা নতি স্বীকারে তিনি প্রস্তুত হননি। অথচ এ দ্বীনী বিষয় ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী, সবচেয়ে আপস প্রয়াসী, সবচেয়ে সদাচারী এবং সহজ সরল আচরণে সবচেয়ে অগ্রগামী, কিন্তু দ্বীন দ্বীনই। ইসলাম ইসলামই। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি অবিকল আল্লাহর এ নির্দেশের অনুগত ছিলেন–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ج

'সুতরাং (এদের ব্যাপারে ধীরে ধীরে) তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা করো, আর এদের মধ্যে যারা পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী, কখনো তাদের কথা শুনবে না।' (আদ দাহর, ২৪)

এমনকি যে সময়ে রসূল (স.) মক্কায় সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন, যখন শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের দায়ে তাঁকে ও তাঁর মুষ্টিমেয় সংগীদেরকে দুর্বিষহ নির্যাতনসহ অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হচ্ছিলো, তখনও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। যে কথা বলা উচিত, তা তিনি ক্ষমতাদর্পী, প্রতাপশালী যুলুমবাজদের মুখের সামনেও বলতে কুণ্ঠিত হননি। অত্যাচারীদের মন একটু গলবে ও সদয় হবে কিংবা যুলুমের মাত্রা কিছুটা লাঘব হবে, এ আশায় তিনি দ্বীন প্রচারের কাজে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরতি দেননি কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামী আকীদা ও আদর্শের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন একটি কথা থেকেও নীরবতা অবলম্বন করেননি।

ইবনে হিশাম স্বীয় সীরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূল (স.) যখন তাঁর জাতির কাছে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন প্রথম প্রথম জাতি তাঁকে এড়িয়ে চলেনি, তাঁর ওপর ক্ষিপ্তও হয়নি, কিন্তু আমার জানা মতে, তিনি যেই তাদের দেবদেবীর, তাদের সমাজব্যবস্থা ও নীতি আদর্শের নিন্দা সমালোচনা শুরু করলেন, অমনি তারা তাঁর বিরোধী হয়ে গেলো এবং সবাই এক হয়ে তাঁর শত্রুতা শুরু করলো। কেবল মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাও কারো কাছে প্রকাশ করতো না। রসূল (স.)-এর চাচা আবু তালেব অবশ্য যথারীতি তাঁর প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন এবং তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ফলে রসূল (স.) আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কেউ তাঁর পথ রোধ করতে পারলো না।

কোরায়শ নেতারা যখন দেখলো, তাদের শেরেক, কুফুর ও দেবদেবীদের নিন্দা সমালোচনায় রসূল (স.) কিছুতেই দমছেন না, আর তাঁর চাচা আবু তালেব তাঁকে স্নেহ আদরে লালন করে চলেছেন, তাঁকে তাদের কাছে সমর্পণ না করে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, তখন কতিপয় শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতা আবু তালেবের কাছে উপস্থিত হলো। এদের মধ্যে ছিলো রবিয়ার দুই ছেলে ওতবা ও শায়বা, আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবুল বাখতারী আস বিন হিশাম, আসওয়াদ ইবনুল মোত্তালেব, ইবনে আসাদ, আবু জাহল ওরফে আবুল হেকাম আমর ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে মুগীরা, হাজ্জাজের দুই ছেলে নবীহ ও মোনাব্বেহ প্রমুখ।

তারা বললো, 'হে আবু তালেব, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা এবং আমাদের ধর্মের সমালোচনা করেছে। শুধু তাই নয়, সে আমাদের বোকা ঠাওরিয়েছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের বিপথগামী সাব্যস্ত করছে। আপনি পারলে ওকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করুন, নচেত ওকে শায়েস্তা করতে আমাদের সুযোগ দিন। আপনিও তো ওর বিপক্ষে আমাদের সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মমতের অনুসারী। কাজেই আমরা যদি ওকে শায়েস্তা করে দেই, তবে আপনারও কাজ হবে, অথচ আপনার নিজের কিছুই করতে হলো না।'

আবু তালেব তাদের সৌজন্যপূর্ণ ও বিনম্র ভাষায় বুঝিয়ে সুজিয়ে বিদায় করলেন।

এ ঘটনার পরও রসূল (স.) ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখলেন। ফলে রসূলের (স.)-এর সাথে তাদের বিরোধ আরো গুরুতর আকার ধারণ করলো। উভয়ের পারস্পরিক দূরত্ব ও ঘৃণা বিদ্বেষ বেড়ে গেলো। কোরায়শের লোকেরা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলো এবং একে অপরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কে দিতে লাগলো। এরূপ বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে তারা পুনরায় আবু তালেবের কাছে হাযির হলো।

তারা বললো, 'হে আবু তালেব! আমাদের ভেতরে আপনি যেমন বয়সে প্রবীণ, তেমনি মান মর্যাদায়ও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আমরা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিবৃত্ত রাখতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আপনি তার কাজ বন্ধ করতে পারেননি। আল্লাহর কসম, আমরা এ অবস্থা সহ্য করতে পারবো না। আমাদের পূর্বপুরুষদের তিরস্কার করা হতে থাকবে, আমাদের বোকা ঠাওরানো হতে থাকবে এবং আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা করা হতে থাকবে, আমাদের দ্বীন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে শেরেক কুফুর বলতে হবে, এটা আমরা চলতে দেবো না। এখন হয় আপনি ওকে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত রাখুন, নচেত আমরা আপনার ও ওর বিরুদ্ধে একসাথে লড়াইতে লিপ্ত হবো। যতক্ষণ দু'পক্ষের এক পক্ষ নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় ততক্ষণ এ লড়াই থামবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

এ কথাগুলো বলেই তারা চলে গেলো। এবার আবু তালেব প্রমাদ গুণলেন। কোরায়শের লোকেরা এভাবে শত্রু হয়ে যাওয়ায় তিনি খুবই বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। অথচ রসূল (স.)-কে তাদের হাতে তুলে দিতেও তার মন সাড়া দিলো না, আবার তারা এভাবে এসে অপমানসূচক আচরণ করে যেতে থাকবে তাও তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অগত্যা তিনি রসূল (স.)-কে ডেকে বললেন–

'ভাতিজা! তোমার স্বগোত্রীয় লোকেরা আমার কাছে এসেছিলো এবং এসব কথা বলে গেছে (তিনি তাদের বক্তব্যের বিবরণ দিলেন)। এখন তুমি নিজেকে এবং আমাকে উভয়কেই রক্ষা করো। আমার সাধ্যাতীত বোঝা আমার ওপর চাপিও না।'

এ কথা শুনে রসূল (স.) ভাবলেন, তার চাচা বুঝি একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তিনি হয় তো তাঁকে অপদস্থ হবার জন্যে তাদের হাতে তুলে দেবেন এবং হয় তো তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাঁকে আর রক্ষা করতে পারছেন না। তাই তিনি বললেন–

'চাচাজান! আল্লাহর কসম, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ তুলে দেয় এবং আমাকে এ কাজ ত্যাগ করতে বলে, তথাপি আমি তা ত্যাগ করবো না, যতোক্ষণ না আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে বিজয়ী হয় অথবা আমি এ কাজ করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাই।'

এ কথা বলার সাথে সাথে রসূল (স.)-এর চোখে অশ্রু এলো, তিনি কেঁদে ফেললেন। অতপর যেই চলে যেতে উদ্যত হলেন, আবু তালেব তাঁকে ডেকে বললেন–

'ভাতিজা! আমার কাছে এসো।'

তিনি কাছে এগিয়ে গেলে আবু তালেব বললেন–

'ভাতিজা! তুমি যাও, তোমার যা ভালো লাগে তা বলতে থাকো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কোনো কারণেই কারো কাছে সোপর্দ করবো না।'

এই ছিলো ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজে রসূল (স.)-এর দৃঢ়তা অবিচলতার চিত্র। আর এ দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখিয়েছিলেন এমন সময়, যখন পৃথিবীতে তাঁর সর্বশেষ রক্ষক, সহায় ও দুর্গরূপী চাচা তার দায়িত্ব ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অথচ এ চাচাই তাকে তার রক্তপিপাসু দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছিলেন।

মূলত এ চিত্র তাৎপর্য, প্রভাব, অভিব্যক্তি এবং শব্দ– সব কিছুর দিক দিয়েই অভিনব, অতুলনীয়, বিস্ময়কর ও তেজোদ্দীপ্ত। যে আকীদা বিশ্বাসের জন্যে তাঁর এই দৃঢ়তা, তা যতোখানি নতুন ও অভিনব, এটিও ততোখানি অভিনব। সে আকীদা বিশ্বাস যতোখানি বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর, এটিও ততোখানি মনোমুগ্ধকর। সে আকীদা যতোখানি তেজস্বী ও শক্তিশালী, এটিও ততোখানি শক্তিশালী। তাই এ চিত্র আল্লাহর এই সুমহান উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করে–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'নিশ্চয় তুমি মহৎ চরিত্রের অধিকারী।' (আল ক্বালাম, ৪)

ইবনে ইসহাকের আরেকটি বর্ণনায় দরকষাকষির তৃতীয় একটি রূপও দেখতে পাওয়া যায়। সেটি নিম্নরূপ–

'একদিন রসূল (স.) কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। এ সময় তাঁর সামনে উপস্থিত হলো আসওয়াদ ইবনুল মোত্তালেব, ওলীদ ইবনুল মুগীরা, উমাইয়া ইবনুল খালাফ এবং আ'স ইবনুল ওয়ায়েল।' এরা সবাই নিজ নিজ গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন।

তারা বললেন, 'হে মোহাম্মদ, এসো, আমরা এই মর্মে আপস করি যে, তুমি যার গোলামী করো আমরাও তার কিছু গোলামী ও আনুগত্য করবো, আর আমরা যার গোলামী করি তুমিও তার কিছুটা গোলামী ও আনুগত্য করবে। তাহলে এ কাজে তুমি ও আমরা সমঅংশীদার হয়ে যাবো। তুমি যার গোলামী ও আনুগত্য করো সে যদি আমরা যার গোলামী ও আনুগত্য করি তার চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তার গোলামী করার কিছু কৃতিত্ব আমরাও অর্জন করবো। আর যদি আমাদের দেব-দেবীরা তোমার মাবুদের চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তুমিও আমাদের দেব-দেবীদের কল্যাণের কিছু অংশ পাবে।' এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন–

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ٢ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ٤ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

'(হে নবী) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা, আমি (তাদের) এবাদাত করি না যাদের এবাদাত তোমরা করো, না তোমরা (তাঁর) এবাদাত করো যার এবাদাত আমি করি। এবং আমি (কখনোই তাদের) এবাদাত করবো না যাদের তোমরা এবাদাত করো, না তোমরা কখনো (তার) এবাদাত করবে যার এবাদাত আমি করি (এ দ্বীনের মধ্যে কোনো মিশ্রণ সম্ভব নয়, অতএব), তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে, আর আমার পথ আমার জন্যে।' (সূরা আল কাফেরূন।)

এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের হাস্যকর আপস প্রস্তাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জানিয়ে দিলেন আর রসূল (স.) স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মোতাবেক তাদের জবাব দিয়ে দিলেন।

বাতিলের সাথে আপসের পরিণতি

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِیْلًا - وَلَوْلَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَیْهِمْ شَیْــًٔا قَلِیْلًا ۖ - اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَیٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیْرًا

(হে নবী,) আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, তার (প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়) পদস্খলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনো প্রকার চেষ্টা থেকেই বিরত থাকেনি, যাতে করে তুমি (ওহীর বদলে) আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বানাতে শুরু করো, (যদি তেমন কিছু করতে) তাহলে এরা তোমাকে (তাদের ঘনিষ্ঠ) বন্ধু বানিয়ে নিতো। যদি আমি তোমাকে (তখন) অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের দিকে সামান্য কিছুটা (হলেও) ঝুঁকে পড়তে, (আর এমনটি যদি হতো) তাহলে (এ) জীবনে (যেমন) আমি তোমাকে দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাতাম, তেমনি পরকালেও আমি তোমাকে দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাতাম, তুমি আমার বিরুদ্ধে তখন কোনোই সাহায্যকারী পেতে না। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭৩-৭৫)

উল্লেখিত আয়াতগুলোর বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাঁর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্যে মোশরেকদের নানা প্রকার অপচেষ্টার বিবরণ পাওয়া যায়। এ সব তৎপরতার মধ্যে প্রথম বিষয়টিই হচ্ছে, তাঁর কাছে যে ওহী নাযিল হয়েছে সেই ওহীর ব্যাপারে তাঁর মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তিনি কিছু মিথ্যা কথা তৈরী করে বলে ফেলেন; অথচ তিনি তো সেই মহান ব্যক্তি যাঁকে সবাই সাদেকুল আমীন–অবিসংবাদিত সত্যবাদী–মহা আমানতদার ও বিশ্বস্ত খেতাব দিয়েছিলো।

বিভিন্নভাবে তারা এ অপচেষ্টা চালিয়েছিলো ....এসব নিকৃষ্ট তৎপরতার মধ্যে একটি ছিলো তাঁর সাথে এ ব্যাপারে দরকষাকষি করা যে, ওদের বাপদাদা এবং তাদের পূজ্য দেব-দেবীদের সমালোচনা ও তাদের প্রতি কটাক্ষ বন্ধ করতে হবে, তাহলে তারা তাঁর মনিব আল্লাহর হুকুম পালন করবে। আর একটি শর্ত তারা আরোপ করেছিলো,

তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যে পবিত্র ঘরটিকে নিরাপদ স্থান বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাদের ঘরগুলোকেও সেই ঘরের মতোই পবিত্র ও নিরাপত্তার স্থান এবং পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা দিতে হবে। উপরন্তু তাদের আর একটি দাবীও মেনে নিতে হবে। তা হচ্ছে, তাদের বিশেষ বিশেষ নেতৃবৃন্দকে যে বৈঠকে ডাকা হবে সেখানে সাধারণ গরীব-মেসকীন লোকেরা বসতে পারবে না। কারণ ....এতে তাদের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়, নেতৃবৃন্দের এমন বে-ইযযতী মেনে নেয়া যায় না।

এ সম্পর্কে আল কোরআনে কোনো ফয়সালা দেয়া হয়নি; বরং তাদের দাবীগুলোর দিকে ইংগিত করা হয়েছে মাত্র। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের ওপরে মযবুতীর সাথে টিকে থাকার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাঁকে অযৌক্তিক অন্যায় কাজ থেকে বাঁচানো। আসলে যেভাবে তারা ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিলো, তাতে আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁকে সত্যের পথে টিকে থাকার জন্যে দৃঢ়তা না দিতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতেন এবং ওদের দিকে ঝুঁকে পড়তেন, যার ফলে তারা তাঁকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিতো এবং মোশরেকদের দিকে ঝুঁকে পড়ার ফলে মোশরেকদের ফাঁদে তাঁর পা দেয়া হয়ে যেতো। এর অর্থ দাঁড়াতো, দুনিয়া ও আখেরাত– উভয় স্থানেই তিনি দ্বিগুণ আযাবের উপযুক্ত হয়ে যেতেন এবং সে অবস্থায় আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর মতো কোনো সাহায্যই ওইসব দেবদেবীরা করতে পারতো না।

এসব নানাবিধ ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে বাঁচিয়ে ছিলেন। এসব চক্রান্তকারীরা ছিলো তৎকালীন সমাজে শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী। এরা দাওয়াতদানকারীদের বিরুদ্ধে সর্বদা অসৎ তৎপরতায় লিপ্ত ছিলো। সত্যের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্যে ওরা মানুষকে নানাভাবে উস্কানি দিতো এবং তাদের উস্কানিতে কিছু না কিছু লোক তো প্ররোচিত হতোই– তা সংখ্যায় তারা যতো কমই হোক না কেন। এমনকি এ দাওয়াতে সাড়াদানকারীদেরও তারা নানা কুপরামর্শ দিয়ে তাদের দৃঢ়তা নষ্ট করার চেষ্টা করতো, যার ফলে তারা যুদ্ধে যোগ দিয়ে বহু মালে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করা থেকে পেছনে থেকে যাওয়াকেই বেশী পছন্দ করতো। ইসলামী দাওয়াত থেকে পিছিয়ে রাখার জন্যে ওইসব কাফেররা অন্য যেসব চক্রান্ত করতো তা হচ্ছে, তারা মানুষকে বুঝাতো– ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কী হবে! অপর দিকে শক্তি ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা ইসলামী দাওয়াত পুরোপুরি গ্রহণ করতো না; বরং তারা সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিতো, কারণ এটাকেই তারা সহজ পথ মনে করতো। এরা ছিলো বেশী চালাক, সত্য-মিথ্যা কখন কোনটার বিজয় হয় কে জানে, কাজেই সবার সাথে সম্পর্ক রাখা দরকার, যাতে যেদিকেই বিজয় আসুক না কেন তারা যেন সুযোগ না হারায়– এ ছিলো তাদের অন্তরের মধ্যে যুক্তি। প্রকৃতপক্ষে এই চোরাপথে বহু সৎ চিন্তাশীল, এমনকি ইসলামী দাওয়াত গ্রহণকারী বহু মানুষকে শয়তান বিপথগামী করতে সফল হয়েছে। এরা এতেই কল্যাণ মনে করেছে যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থার নীতিআদর্শের মধ্যে কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও ক্ষমতাসীনদের কাছাকাছি থাকাটাই শ্রেয়।

কিন্তু চিরদিনের জন্যেই একথা মনে রাখতে হবে, সত্য পথে প্রবেশের প্রথম ধাপে এতোটুকু পদস্খলন বা ঢিলেমি শেষ পরিণতিতে সত্য থেকে মানুষকে এতো বেশী দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো উপায় থাকে না। আর ইসলাম গ্রহণকারী যে কোনো ব্যক্তি একবার অন্যায়ের সাথে আপস করতে রাযি হয়ে গেলে, সে ধীরে ধীরে অন্যায়ের সর্বগ্রাসী ছোবলের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ, ছোটো বা বড়ো যে কোনো অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলে মানুষের মনের বল শুধু দুর্বলই হয় না; বরং আস্তে আস্তে একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। একবার পরাজয় স্বীকার করার পর সত্যের পথে দৃঢ় হয়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না এবং আল্লাহর সাহায্য থেকেও সে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আসলে নবীর আহ্বান ছিলো দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা, কিন্তু যে ব্যক্তি একবার নীতিভ্রষ্ট হয়ে যায়, তা সে যতো ছোটো কারণেই হোক না কেন, অথবা কোনো ব্যক্তি যখন সত্যের ব্যাপারে সামান্যতম আপসও করে বসে বা চুপ থেকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে চায়, তখন প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানের হক আর আদায় করতে পারে না। একজন মোমেন দ্বীনের দাওয়াতের ছোটো বড়ো প্রতিটি বিষয়কে সমধিক গুরুত্ব দেয়। দ্বীনের কাজের কোনোটিই তার কাছে ছোট বা তুচ্ছ নয়, তার কাছে কোনোটা অত্যাবশ্যকীয় বা বেশী জরুরী এবং কোনোটা নফল তা নয়। সে গভীরভাবে অনুভব করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো কথা এমন নয় যে তা উপেক্ষা করা যেতে পারে! দ্বীনের নিয়ম-কানুন সবগুলোই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগভাবে মানুষের জীবনের প্রয়োজনগুলো মেটানোর ব্যাপারে নিয়োজিত এবং প্রতিটি বিষয় পরস্পরের সাথে এমন অংগাংগিভাবে জড়িত যে, এগুলোর কোনো একটি বাদ দিলে অপরগুলোর কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হয়। এতে বুঝা যায়, ইসলামী বিধান একটি আর একটির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তি পেতে হলে এর প্রত্যেকটি বিধান একই সাথে চালু হতে হবে। মানুষের তৈরী যে কোনো কারখানায়ও দেখা যায়, প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ অপর যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরশীল– একটি বন্ধ হলে অপরগুলো আর কর্মক্ষম থাকতে পারে না। চিরদিন পৃথিবীর বুকে একই নিয়ম চলে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এ একই নিয়ম চলবে বলে বুঝা যায়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি সত্যের নিশানবর্দারদের পর্যায়ক্রমে ও ধীরে ধীরে বশীভূত করতে চায়; তারা সত্য পথের পথিকদের সামনে নানা প্রকার লোভের টোপ ফেলে। এমনই কোনো লোভনীয় জিনিসের কাছে যখন কোনো মোমেন আংশিকভাবে হলেও আত্মসমর্পণ করে বসে, তখন তার ভাব মর্যাদা একধাপ নেমে যায়, তার মর্যাদা ও তার দুর্ভেদ্যতা হ্রাস পায় এবং শক্তিদর্পীরা বুঝে ফেলে, আর একটু দরকষাকষি করলে বা লোভনীয় জিনিসের মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে দিলে এসব নীতিবান (?)-দের খরিদ করতে আর বেগ পাওয়ার কথা নয় এবং তারা নিশ্চিত হয়ে যায়, পর্যায়ক্রমে ক্রমবর্ধমান দরকষাকষির মাধ্যমে এদের পুরোপুরি বশীভূত করে ফেলা যাবে!

এভাবে বাতিল শক্তির প্রস্তাবের অংশবিশেষ মেনে নেয়া– হোক সে পূর্ণাংগ ইসলামের তুলনায় অতি সামান্য বিষয়, কিন্তু তা অন্যায় অপশক্তির বিজয়ের পথকেই ত্বরান্বিত করে। এ প্রক্রিয়ায় এসব তথাকথিত দ্বীনদার (!) ব্যক্তিদের ওপর তাদের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অপর দিকে সত্যের নিশানবর্দাররা যখন অন্যায় অপশক্তির সাথে কোনো ব্যাপারে আপস করে, তখন তারা আত্মিকভাবে মরে যায়–আল্লাহর সাহায্য সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ প্রকৃত মোমেনরা তো তাদের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে, কিন্তু যখন পরাজয় একবার হামাগুড়ি দিয়ে কারও ঘরে ঢুকে পড়ে, তখন সে পরাজয়ের গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলে আবার বিজয়ের কেতন ওড়ানো সম্ভব হয় না।

এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলদের প্রতি তাঁর এহসানের কথা স্মরণ করিয়ে মোমেনদের মযবুত হওয়ার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন। বলছেন, যা কিছু আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করেছেন, তিনি যেন তার ওপর পুরোপুরি মযবুত হয়ে থাকেন, তাহলেই তিনি তাদের মোশরেকদের ফেতনা ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন, যেমন করে অতীতে করেছেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-কে পেছনের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেন, এ পর্যন্ত তাঁকে কাফেরদের যাবতীয় আক্রমণ থেকে শুধু রক্ষাই করেছেন তা নয়; বরং ওই সমাজের শক্তিমান ব্যক্তিদের একে একে টেনে এনে তাঁর পদতলে রেখে দিয়েছেন এবং তাঁর সংগী-সাথীতে পরিণত করেছেন। অতপর সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও আল্লাহর রহমতধন্য হয়ে ওইসব ব্যক্তি ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের মতো তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। অপর দিকে মোশরেকদের ওপর এসেছে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব, হারিয়েছে তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারীদের এবং তারা ক্রমান্বয়ে পরাজিত হয়ে এসেছে।

মোশরেকরা যখন রসূল (স.)-কে তাদের কথা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারলো না, তখন তাঁকে নানাভাবে ভয় দেখাতে শুরু করলো, যেন তিনি মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি তাদের ভয়ে বা তাদের খাহেশমতো মক্কা ত্যাগ করলেন না। দীর্ঘ তের বছর অবিরাম গতিতে দাওয়াতী কাজ চালাতে থাকলেন। তারপর যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন সেই নির্দেশ পালনের জন্যে তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন। কারণ সর্বান্তকরণে তিনি চাইছিলেন যেন কোরায়শরা সামগ্রিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। তিনি জানতেন, তাঁর দেশবাসী তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিলে তারা সামগ্রিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা পূর্ববর্তী উম্মতরা নবীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার কারণে একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও জানতে পেরেছিলেন, তিনি হিজরত করে চলে গেলে তাঁর দেশবাসী ধীরে ধীরে এবং অচিরেই ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ কথার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলছেন–

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا - سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

'(হে নবী,) এরা এ ব্যাপারেও কোনো চেষ্টার ত্রুটি করেনি যে, তোমাকে এ ভূখন্ড থেকে উৎখাত করে এর বাইরে কোথাও ফেলে দেবে, যদি তেমনটি হতো তাহলে তোমার পরে তারা নিজেরাও (সেখানে) সামান্য কিছুক্ষণই মাত্র টিকে থাকতে পারতো! তোমার আগে আমি যতো নবী রসুল পাঠিয়েছিলাম তাদের ব্যাপারে এই ছিলো আমার নিয়ম, আর তুমি আমার সে নিয়মের কখনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।' (বনী ইসরাঈল, ৭৬-৭৭)

আল্লাহর নবীকে বহিষ্কার করলে আযাব নাযিল হওয়া আল্লাহর এমন এক নিয়ম, যা চিরদিন বহাল থাকবে। এ নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবার নয়। কারণ রসূলদের ঘরছাড়া করা এমন এক জঘন্য অপরাধ, যার চূড়ান্ত ও সমুচিত শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা রসূলরা বিশ্ব সম্রাটের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তাঁদের দেশান্তর করার অর্থ হচ্ছে খোদা আল্লাহকে তাঁর রাজ্যের মধ্যে অপমান করা। যেহেতু স্বার্থান্ধরা রসূলদের আল্লাহর খাস প্রতিনিধি বলে জানতো ও বুঝতো তা সত্ত্বেও অপরিণামদর্শী ও অহংকারী কাফেররা ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের কারণে তাঁদের প্রতি ওই দুর্ব্যবহার করতে দ্বিধা করতো না। এমতাবস্থায় তাদের সাজা না দেয়ার অর্থ হতো চূড়ান্ত মাপের পাপাচারকে প্রশ্রয় দেয়া। সুতরাং এ মহাবিশ্বে আল্লাহর অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম অপ্রতিহতভাবে চলবেই চলবে; কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্যে বা বিশেষ কারণে সে নিয়ম থেমে যেতে পারে না। এমন কেউ নেই বা কোথাও এমন কিছু নেই, যা এ নিয়ম-বিধানের স্বাভাবিক গতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। এখন আখেরী নবীর মহব্বতেই হোক বা শেষ ও চূড়ান্ত নবীর উম্মতদের শেষ সুযোগ দেয়ার জন্যেই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চাননি যে, সর্বগ্রাসী আযাব এসে নবী করীম (স.)-এর জাতিকে সামগ্রিকভাবে ধ্বংস করে দিক। যে মহান নবী শুধু তাঁর নিজ জাতির জন্যেই কাঁদেননি, তিনি কেঁদেছেন বিশ্ব মানবতার জন্যে যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তায়েফের পথ-প্রান্তরে রক্তাক্ত অবস্থায় আসন্ন আযাব নাযিল হওয়ার আশংকায় নবী করীম (স.)-এর বার বার কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করার মধ্যে দিয়ে। তখনও ওই নিরাশার আঁধারে জোরালো আশার আলো তাঁর হৃদয়ে প্রদীপ্ত ছিলো যে, ওরা যদি ঈমান না-ই আনে– হয় তো ওদের বংশধররা ঈমান আনবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন–তিনি রহমানুর রহীম, তাঁর দরবার থেকে তাঁর প্রিয়তম রসূলের এ আকুল আবেদন ঠোকর খেয়ে ফিরে আসতে পারে না। আবার তাঁর চিরন্তন নিয়মও গতি হারাতে পারে না। এ জন্যে যে তাৎক্ষণিক কারণে অতীতে আযাব নাযিল হয়েছে– সে কারণটিই তিনি দূরে সরিয়ে রাখলেন, অর্থাৎ রসূল (স.)-কে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযা দিলেন না। কাফেরদের দাবী অনুসারে এ মোজেযা প্রদর্শন করার পরও যদি জনপদ একে উপেক্ষা করে, তখন এ মহামারীর ওষুধ আযাব ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুকৌশলে মহানবী (স.)-কে মদীনায় হিজরত করিয়ে দিলেন। এ হিজরত ছিলো আল্লাহর ফয়সালা। নচেত কোরায়শদের আল্লাহ তায়ালা এমন শক্তি-ক্ষমতা দেন নি যে, তারা শক্তিবলে তাঁকে বহিষ্কার করতে

পারতো। দেশ ত্যাগ করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিজেরও কোনো ফয়সালা ছিলো না বা তিনি কোনো ভয়ও পান নাই। তায়েফে গমন-সে তো ছিলো দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার এক নমুনা মাত্র।

ইসলামী আন্দোলনে আপসকামিতা

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۖ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ - وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (এবাদাতের কিছু অচার) অনুষ্ঠান ঠিক করে দিয়েছি (যা তারা পালন করে), এ ব্যাপারে তারা যেন অবশ্যই তোমার সাথে কোনো তর্ক না করে; (মানুষদের) তুমি তোমার মালিকের দিকে ডাকতে থাকো, অবশ্যই তুমি সঠিক পথের ওপর রয়েছো। (তারপরও) তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতন্ডা করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা (আমার সাথে) যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।' (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৬৭-৬৮)

আলোচ্য আয়াতে একটি ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য তুলে ধরা হয়েছে। সে সত্য হলো, প্রত্যেক জাতির জীবন যাপন, চিন্তা চেতনা, আচার আচরণ এবং বোধ বিশ্বাসের একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও আদর্শ থাকে। এই আদর্শ আল্লাহর সেই চিরন্তন নীতিরই অধীন যার মাধ্যমে মানবীয় স্বভাব ও মানসিকতা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই যে জাতি জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সত্যের সন্ধানদাতা অগণিত প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীর ডাকে সাড়া দিয়ে খোলা মনে তা গ্রহণ করে নেয়, সে জাতিই আল্লাহর পথের সন্ধান পায়, হেদায়াতলাভে ধন্য হয়। অপরদিকে যে জাতি এসব প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীর ডাকে সাড়ে দেয় না, ভ্রুক্ষেপ করে না, সে জাতি পথভ্রষ্ট জাতি। কাজেই সে জাতির এ তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্য তাদের সত্যের পথ থেকে, ন্যায়ের পথ থেকে আরো দূরে সরিয়ে রাখবে।

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতি সম্প্রদায়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পথ ও আদর্শ সৃষ্টি করে রেখেছেন। কাজেই এসব বিষয় নিয়ে নবীর ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং এগুলো নিয়ে মোশরেকদের সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, ওরা ইচ্ছা করেই সত্যের পথ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং উৎসাহভরে নিজেদের ভুল পথেই চালিয়ে নিচ্ছে। নবীর আদর্শের ব্যাপারে এবং মত ও পথের ব্যাপারে ওরা যাতে নবীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ না পায়, সে নির্দেশ তাঁকে দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে তাঁকে আরো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন নিজের আদর্শের ওপরই অটল থাকেন এবং কাফের মোশরেকদের তর্ক বিতর্কের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন; বরং তর্ক বিতর্কের সুযোগই যেন ওদের না দেন। কারণ তিনি যে আদর্শের ধারক ও প্রচারক, সেটাই হচ্ছে প্রকৃত আদর্শ এবং সত্য আদর্শ। তাই নবীকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে–

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ، اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ

'(মানুষদের) তুমি তোমার মালিকের দিকে ডাকতে থাকো, অবশ্যই তুমি সঠিক পথের ওপর রয়েছো।' (আল হাজ্জ, ৬৭)

অতএব নবীকে নিশ্চিত হতে হবে, তিনি সঠিক আদর্শের ওপরই আছেন এবং সত্য পথই অনুসরণ করে চলেছেন। এরপরও যদি কাফের মোশরেক সম্প্রদায় তাঁর সাথে তর্ক করতে আসে, তাহলে তিনি যেন অহেতুক সময় ও শ্রমের অপচয় না করেন। এ প্রসংগে বলা হয়েছে–

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'(তারপরও) তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতন্ডা করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা (আমার সাথে) যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।' (আল হাজ্জ, ৬৮)

যারা সত্য জানার জন্যে বোঝার জন্যে তর্ক করে এবং যাদের মাঝে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা আছে, কেবল তাদের সাথেই তর্ক করা যায়। এতে কাজও হয়, কিন্তু যারা গোঁয়ার প্রকৃতির, দাম্ভিক ও অহংকারী; যারা নিজেদের ভুল পথ ও মত থেকে সরতে রাযি নয়, তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করে কোনো লাভ নেই। কারণ, ওদের চোখের সামনে শত শত আলামত ও নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা লা-শরীক আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু এসব কিছু দেখেও ওরা সত্যকে মেনে নেয় না। কাজেই ওদের ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। তিনিই ওদের ফয়সালা করবেন। কারণ, সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে এবং বিভিন্ন মত ও পথের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেয়ার মালিক একমাত্র তিনিই। তাই বলা হচ্ছে–

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

'তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে (নিজেদের মধ্যে) মতবিরোধ করছো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন।' (আল হাজ্জ, ৬৯)

কারণ, তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তি করার কারও ক্ষমতা নেই। সেই কেয়ামতের দিন কারো তর্ক করার সাহস হবে না। তাঁর চূড়ান্ত রায়ের ব্যাপারে কারো দ্বিমত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ে রায় দেন, তখন পরিপূর্ণভাবে জেনে শুনেই দেন। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী। কোনো দলীল প্রমাণ ও কার্যকারণই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়। যমীন ও আসমানে যা কিছু ঘটছে তিনি তা সবই জানেন। এমনকি মানুষের অন্তরে কি ঘটছে তাও জানেন। মানুষের নিয়তের খবরও তিনি রাখেন। তাই বলা হচ্ছে–

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

'তুমি কি জানো না আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, এর সবকিছু একটি কেতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে, এ (সংরক্ষণ প্রক্রিয়া) আল্লাহ তায়ালার কাছে (অত্যন্ত) সহজ একটি কাজ।' (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ৭০)

আল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে পরিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম। কাজেই জগতের কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নেই। যেসব কারণে মানুষ ভুলে যায় বা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেগুলো আল্লাহর মাঝে নেই। কাজেই তাঁর সত্তাকে একটি বিশাল গ্রন্থের সাথেই তুলনা করা যায়, যার মাঝে সব কিছুর তথ্যই সন্নিবেশিত রয়েছে।

অপরদিকে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধি খুবই সীমিত। কাজেই তার পক্ষে আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতা পরিমাপ করা, এমনকি তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাই জগতের সকল বস্তু, সকল ব্যক্তি, সকল কর্ম, সকল অনুভূতি এবং সকল গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ণাংগ ও সুক্ষ্ম জ্ঞানের বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়েও মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ বিষয়টা তার জন্যে অসম্ভব হলেও আল্লাহর জন্যে নয়; বরং আল্লাহর জন্যে তা খুবই সহজ।

হক ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে চেনা

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

'এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'(আল আনয়াম, ৫৫)

উল্লেখিত আয়াতটিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইসলামী আন্দোলনকর্মীদের জন্যে একটি খুবই জরুরী বিষয়ে নির্দেশনা দান করেছেন। আয়াতে রেসালাত ও রসূলের স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ইসলামী আকীদা ও আদর্শ নির্ভেজালভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসলাম যে ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের উচ্ছেদ চায় এবং যে ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা কামনা করে, তার বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ জন্যেই বলা হয়েছে, 'এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি ......'।

অর্থাৎ এতোটা বিশদভাবে বর্ণনা করি যে, ইসলামের দাওয়াতের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে আর কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহই অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুত সত্য একেবারেই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

সূরা আল আনয়ামে ইতিপূর্বে যেসব যুক্তি ও প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে, তা আল্লাহর এই উক্তির আওতাভুক্ত, 'এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করি .....'।

তবে এই ক্ষুদ্র আয়াতের শেষাংশ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। অংশটি হলো–

وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ع

'যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।' (আল আনয়াম, ৫৫)

এ কথাটার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্ময়কর। ইসলামী আকীদা ও আদর্শের প্রচার এবং তার বাস্তবায়নের আন্দোলনে কোরআন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সে পদ্ধতিটা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনের অনুসৃত এই পদ্ধতি শুধু সৎকর্মশীল মোমেনদের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে সত্য ও ন্যায়ের বর্ণনাই দেয় না; বরং বাতিলেরও পরিচয় দেয়, যাতে অপরাধী ও বিপথগামী লোকদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা মোমেনদের পথ সুস্পষ্টভাবে জানতে হলে অপরাধী অসৎ লোকদের পথ কোনটা তাও জানা দরকার। দু'টি পথের মাঝে পার্থক্য করার জন্যে যেমন 'ডিভাইডার' করে দেয়া হয়, এটা ঠিক তেমনি।

ইসলামী আন্দোলনকর্মীদের জন্যে এ পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তৈরী করেছেন। কেননা তিনি জানেন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যে এর বিপরীত বাতিল ও অসত্যের সাথেও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের জানা দরকার, এ জিনিসটা পুরোপুরি বাতিল ও পুরাপুরি ক্ষতিকর, আর ওই জিনিসটা পুরোপুরি ভালো ও পুরোপুরি কল্যাণকর। যে ব্যক্তি সত্যের ওপর আছে, সে শুধু নিজে সত্যের ওপর আছে জানলেই সত্যকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রাম করতে পারে না; বরং যে তার বিরোধী সে যে বাতিলের ওপর আছে, সেটাও তাকে সমানভাবে জানতে হবে। সত্যের বিরোধীরা যে অপরাধীদের পথই অনুসরণ করে থাকে তা না জানলে সত্যের জন্যে লড়াই করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি অপর এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط

'এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে অপরাধীদের মধ্য থেকে একজন শত্রু সৃষ্টি করেছি।' (আল ফোরকান, ৩১)

এর উদ্দেশ্য রসূল (স.) ও মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, তাদের সাথে যারা শত্রুতা করে, তারা নিশ্চয়ই অপরাধী।

ঈমান, সততা ও ন্যায়নীতিকে সুস্পষ্টভাবে চিনবার জন্যে কুফুর, শেরেক ও অপরাধকে সুস্পষ্টভাবে চেনা অপরিহার্য। আর অপরাধীদের পথ পরিষ্কারভাবে চিনিয়ে দেয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বুঝিয়ে দেয়ার অন্যতম লক্ষ্য। কেননা অপরাধীদের পথ ও অবস্থান সম্পর্কে যে কোনো অস্পষ্টতা এবং সংশয় স্বয়ং মোমেনদের নিজেদের পথ ও অবস্থান সংশয়াপন্ন করে তোলে। এ দুটো আসলে একই পাতার দুই পিঠ। তাই এ দুটোই চেনা ও জানা অপরিহার্য।

এ কারণেই প্রত্যেক ইসলামী আন্দোলনের উচিত মোমেনদের পথ ও অপরাধীদের পথ চিহ্নিত করা। উভয় পথ চিহ্নিত করেই তাদের কাজ শুরু করা উচিত। শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়; বরং বাস্তবিকভাবে মোমেনদের এবং অপরাধীদের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা চাই। যাতে দাওয়াতদাতারা বুঝতে পারে, তাদের পার্শ্ববর্তীদের মধ্যে কারা মোমেন এবং কারা অপরাধী। মোমেনদের পথ, আলামত ও জীবনপদ্ধতি এবং অপরাধীদের পথ, আলামত ও জীবনপদ্ধতি চিহ্নিত করা চাই, যাতে মোমেনদের ও অপরাধীদের ঠিকানা, পথ, জীবনপদ্ধতি ও আলামত মিলে-মিশে একাকার হয়ে না যায়।

যেদিন ইসলাম আরব উপদ্বীপে পৌত্তলিকদের সাথে সংঘর্ষরত ছিলো, সেদিন এ পার্থক্যটা চিহ্নিত ও স্পষ্ট ছিলো। সেদিন সবাই জানতো, মোমেন ও সৎ লোকদের পথ রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরই পথ, অন্য কিছু নয়। আর অপরাধী ও মোশরেকদের পথ অমুসলিমদেরই পথ, অন্য কিছু নয়। আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা উভয় পথের নিদর্শনাবলী বিশদভাবে তুলে ধরেছেন, যার নমুনা এই সূরা ও অন্যান্য সূরায় বিপুল পরিমাণে রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের পথ চিহ্নিত করা।

পৃথিবীর যেখানেই এবং যে কালেই ইসলামের সাথে শেরেক, পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা, বিকৃত ধর্মসমূহ ইত্যাদি বাতিল মতাদর্শের মোকাবেলা হবে, সেখানেই সৎ মোমেনদের পথ এবং অপরাধী মোশরেক ও কাফেরদের পথ স্পষ্ট হতে হবে। উভয় পথের মধ্যে কোনো রকমে মিশ্রণের অবকাশ থাকবে না।

ইসলামের প্রথম যুগে রসূল ও তাঁর সাহাবারা যে ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করেছেন তা অনেক কঠিন সমস্যা ছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে বর্তমান যুগের সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনগুলো যে কঠিনতম ও জটিলতম সমস্যার সম্মুখীন– তার স্বরূপ অনেক দিক থেকেই ভিন্ন ও জটিল ধরনের। বর্তমান কালের সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে অন্যভাবে। যে সব দেশ একদিন ইসলামী দেশ ছিলো, ইসলামী আইন ও শাসনের অধীন ছিলো, সে সব দেশে মুসলিম জাতিরই ঔরসে এমন সব মানবগোষ্ঠী এখন জন্মেছে, যারা ওইসব দেশেই রয়েছে, নিজেদের মুসলমান নামে পরিচয়ও দিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে তারা ইসলামকে ত্যাগ করেছে, ইসলামের মূলনীতিগুলো তারা তাদের কর্মে ও বিশ্বাসে বর্জন করেছে। অথচ তারা মনে করছে, তারা ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী।

ইসলাম হচ্ছে এই মর্মে সাক্ষ্য বা ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়ার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহকেই সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা, শাসক ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর বান্দারা একমাত্র তাঁরই হুকুম অনুসারে আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও জীবনের অন্য সমস্ত কাজ সমাধা করার অধিকারী বলে স্বীকার করতে হবে এবং এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর বান্দাদের একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আইন কানুন গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক,

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড সে অনুসারে পরিচালনা করতে হবে। যে ব্যক্তি এ অর্থ ও মর্ম সহকারে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে ঘোষণা দেয় না, তার নাম ও বংশ পরিচয় যাই হোক না কেন, সে ইসলাম থেকে যোজন যোজন দুরে অবস্থান করছে। আর যে দেশ ও জাতি এ অর্থ ও মর্ম সহকারে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে ঘোষণা দেয় না, সে দেশ ও জাতি সঠিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে বলে গণ্য হবে না এবং ইসলামের প্রকৃত অনুসারী বলেও স্বীকৃত হবে না।

আজকের পৃথিবীতে এমন অনেক মানবগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের নাম মুসলমানদের নামের মতোই। জন্মগতভাবে তারা মুসলমানদেরই বংশধর, তাদের দেশও এক সময় দারুল ইসলাম তথা ইসলাম শাসিত দেশ ছিলো, কিন্তু তারা উল্লেখিত মর্ম ও অর্থ সহকারে সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই।

সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনগুলো এ সব দেশে এই সব নামসর্বস্ব মুসলিম শাসক ও জনতার মোকাবেলায় যে সমস্যার সম্মুখীন, সেটাই হচ্ছে তাদের জন্যে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা। একদিকে ইসলাম ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মার্থ, অপরদিকে শেরক ও জাহেলিয়াতের মর্মার্থকে ঘিরে যে অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা বিরাজ করছে, সেটাই আজকের ইসলামী আন্দোলনের পথে সবচেয়ে কঠিন বাধা। সৎ মুসলমানদের পথ এবং অপরাধী অ-মুসলিমদের পথ ও পরিচয় অস্পষ্ট থাকাটা ইসলামী আন্দোলনের পথের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা। ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা আমাদের এই সমস্যাটার কথা জানে। তাই তারা এই সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে এমন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে যে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর না করে শুধু আপসহীন ও সুস্পষ্টভাবে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরলেও মুসলমানকে 'কাফের' ফতোয়া দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে কাকে কাফের আর কাকে মুসলমান বলতে হবে, সেটা জনগণের প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও পরিভাষা অনুসারেই বলতে হচ্ছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল যা বলেছেন, সে অনুসারে কোথাও বলা যাচ্ছে না।

ইসলামী আন্দোলনকারীদের সর্বকালেই এ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় এবং এটাই তাদের পথের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তাই আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াতের কাজ শুরুই করা উচিত মোমেনদের পথ আর অপরাধীদের পথ আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে। যারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করে তাদের উচিত স্পষ্ট কথা বলা এবং হক ও বাতিলকে চিহ্নিত করে কথা বলা। এ ব্যাপারে না কাউকে ভয় পাওয়া উচিত, না কোনো নমনীয়তা প্রদর্শন ও আপস করা উচিত। আর না কারো নিন্দা সমালোচনার তোয়াক্কা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্যটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরলেই দেখা যাবে এক ধরনের সুবিধাভোগী ধর্মব্যবসায়ীরা বলতে শুরু করবে, 'ওই দেখো, উনারা কেমন ইসলাম প্রচার করছেন, মুসলমানদেরকেই ইসলাম থেকে খারিজ বলে ফতোয়াবাজি করে চলেছেন।'

প্রতারিত লোকেরা ইসলামকে যেমন নমনীয় আদর্শ মনে করছে, ইসলাম আসলে তা নয়। ইসলাম সুস্পষ্ট এবং কুফরীও সুস্পষ্ট। ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়া, এ অর্থে যে, বাস্তব জীবনের সর্বত্র একমাত্র আল্লাহরই আইন ও বিধান মেনে চলা জরুরী। যারা এ অর্থে ওই সাক্ষ্য দেয় না এবং যারা নিজেদের জীবনে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে নেয় না, তারা ইসলাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

ইসলামের আহবায়কদের এই বাধা অতিক্রম না করে কাজ শুরু করার উপায় নেই। হক ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেই এ কাজে নামতে হয়। তাহলে আল্লাহর পথে সর্বশক্তি নিয়োগ করা সহজ হয়। কোনো সন্দেহ সংশয় বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। যখন তাদের মনে অটল বিশ্বাস জন্মাবে যে, তারা 'মুসলমান' এবং মানুষকে তাদের পথ এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধাদানকারীরা 'অপরাধী' ও অমুসলিম, তখনই তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে। যতোক্ষণ তাদের এ বিশ্বাস না হবে যে, তারা যে পথে নেমেছেন তা ঈমান ও কুফুর বাছাই করে চলারই পথ, ততোক্ষণ তারা পথের বাধা বিপত্তি ও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হবে না। তাদের ধর্ম ও আদর্শ এবং তাদের দেশবাসীর ধর্ম ও আদর্শ যে আলাদা, তা না জানা ও না বুঝা পর্যন্ত তারা এই পথে জানমাল বাজি রেখে অগ্রসর হতে পারবে না।

ইসলামবিদ্বেষীদের সাথে একই বৈঠকে বসা

ইসলাম একটি ক্রমবিকাশমান সক্রিয় ও জীবন্ত আন্দোলন। ইসলামের আকীদা বিশ্বাসে ও মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই কোনো রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন কিংবা আপস যদিও সম্ভব নয়, তাই বলে কৌশলগত অবস্থানকেও ইসলাম অস্বীকার করে না। স্থানকাল পাত্রভেদে দাওয়াতী কাজে উপায় উপকরণ ও পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আসতে পারে। এটা যেমন প্রথম যুগের মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য যুগ যুগান্তরের প্রতিটি মুসলিম কাফেলার ক্ষেত্রে। কেননা দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্ব স্থান ও কালের সীমানা ডিংগিয়ে সকল মুসলমানের ওপরই সমানভাবে ফরয। একবার ভেবে দেখুন, কোরায়শ জাতির মিথ্যারোপের মোকাবেলায় ইসলামের দিকে দাওয়াতের যে গুরুত্ব ছিলো, আজও কি অনুরূপভাবে দ্বীন ইসলামের যথার্থতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা চলছে না! সুতরাং যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করবে তাদের নিজ গোত্রও যদি হঠকারী হয়, তাহলে তাদেরও নাফরমান পরিবার থেকে দূরে থাকতে হবে, সইতে হবে নানা প্রকার দুখ কষ্ট ও কঠোরতা এবং অত্যাচার। এসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই একমাত্র স্থায়ী শান্তি ও নিশ্চিন্ততা আসবে বলে আল কোরআন জানাচ্ছে এবং মুসলমানদের মনে এর জন্যে প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি করছে।

তারপর যখন এ সত্য বাণী পৌঁছে দেয়া তাদের কাছে অপছন্দনীয় হলো এবং সত্য দ্বীনকে সরাসরি অস্বীকার ও উপেক্ষা করা হলো, তখন নবী করীর (স.)-কে

নির্দেশ দেয়া হলো যেন তিনি তাদের সাথে কোনো ওঠাবসা না করেন, এমন কি যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে কিংবা কোনো অশ্লীল মন্তব্য করবে, তখন তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের উপদেশ দেয়ার জন্যেও যেন তাদের সাথে কোনো বৈঠকে না বসা হয়। কারণ দ্বীনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয় না থাকলে তাদের কাছে এ মূল্যবান দাওয়াত পৌঁছানোতে আসলে কোনোই ফায়দা নেই। তারা তো দ্বীনকে কথায় ও কাজে ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে– এ জন্যে তাদের সাথে কোনো বৈঠকেই বসা উচিত নয়। তারা যেসব জাহেলী ধ্যান ধারণার মধ্যে ডুবে রয়েছে, তার মধ্যেই যখন তারা টিকে থাকতে চায়, সে অবস্থায় তাদের সাথে ওঠা বসার অর্থ দাঁড়াবে তাদের 'দ্বীন'কে স্বীকার করা এবং দ্বীন ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা, অথবা দ্বীন ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির কমতি দেখানো। এসব নিষেধাজ্ঞা আসার পরও এমন হতে পারে যে, শয়তান কাউকে ভুলিয়ে দেবে এবং তাদের সাথে ওঠা বসা করা হবে, কিন্তু যখনই মনে পড়বে তখনই সেখান থেকে উঠে আসতে হবে এবং তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

'তুমি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করছে, তাহলে তুমি তাদের কাছ থেকে সরে এসো, যতোক্ষণ না তারা অন্য কিছু বলতে শুরু করে; যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে আর (এক মুহূর্তও) বসে থেকো না। (আল আনয়াম, ৬৮)

এ নির্দেশ তখন যদিও রসূল (স.)-এর জন্যে ছিলো, তবে আলোচ্য আয়াতের মধ্যে বর্ণিত কথাগুলোর আওতায় সকল যুগের সকল মুসলমান জনসাধারণও পড়ে। অর্থাৎ মুসলমানদেরও ওই একই নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, যেন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যেখানেই কোরআনুল করীমের বা তার কোনো আয়াতের সমালোচনা করা হয়, তা প্রতিহত করার মতো অবস্থা বা অনুকূল পরিবেশ যদি না থাকে, তাহলে সে বৈঠক থেকে অবশ্যই সরে আসা দরকার। এ আচরণের মাধ্যমেও ওদের প্রতি কিছু না কিছু ঘৃণা প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। রসূল (স.) যখন মক্কায় দাওয়াতী স্তরে অবস্থান করছিলেন, তখনই তাঁর প্রতি এ নির্দেশ দেয়া হয়। এসময়ে আল্লাহরই ইচ্ছা ও বিশেষ হেকমতের কারণে তাঁকে মক্কার ওই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়নি। অথচ মোশরেকদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়েও তাদের দৌরাত্মের কিছু না কিছু জবাব অবশ্যই দেয়া প্রয়োজন ছিলো; এ কারণেই তাদের বৈঠক থেকে উঠে আসার মাধ্যমে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা প্রয়োজন ছিলো এবং তাদের কাজের মৌন

প্রতিবাদ জানানো দরকার ছিলো। এ জন্যেই নবী করীম (স.)-এর প্রতি নির্দেশ ছিলো যেন তিনি মোশরেকদের বৈঠকাদিতে সে সময়ে না বসেন, যখন তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অসংগত চিন্তা ভাবনা করতে বা অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখতে পান। আর এসব বৈঠকাদি পরিত্যাগ করার কথা যদি শয়তান ভুলিয়ে দেয়, তখন আল্লাহর বিধি নিষেধ মানার আবশ্যকতা স্মরণ করতে হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে জানা যায়, মুসলমানদের এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে যালেম জাতি বলতে মোশরেকদেরই বুঝানো হয়েছে, যেহেতু কোরআন করীমেও মোশরেকদের যালেম আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরপর মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, যেখানে মোশরেকদের সাথে ব্যবহারে নবী করীম (স.)-এর চরিত্রের আর একটি দিক ফুটে উঠলো। সে সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে জেহাদ করার নির্দেশ এসে গেলো। এ নির্দেশে বলা হলো, অশান্তি, বিশৃংখলা ও ফেতনা ফাসাদ দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহর রাজ্যে নিরংকুশভাবে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর এটি বাস্তব সত্য যে, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানে আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে আজে বাজে কথা বলা বা মন্তব্য করার কোনো সাহস কেউ করেনি।

এই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর কথা, এ দ্বীন বহির্ভূত যে কোনো কথা যার মনে যা আসে এবং যে যা বলতে চায় বলুক, তবে তার মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এ জীবনব্যবস্থার সমালোচনায় বা এর ক্রটি সন্ধানে কেউ যদি কোনো কথা বলে, তাহলে অবশ্যই সে দ্বীন ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

ওই সকল বে-আদব মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত আলোচনা প্রসংগে তাদের সাথে লেনদেনের কথাও এসে গেছে। এরশাদ হচ্ছে–

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ق لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ج وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ع

‘সেসব লোকের সংগ তুমি বর্জন করো, যারা তাদের দ্বীনকে নিছক খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছে এবং এই পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে। তুমি এ কোরআন দিয়ে (তাদের আমার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ এই পার্থিব কর্মকান্ডের ফলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে, (মহা বিচারের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো সাহায্যকারী বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবে না, সে যদি নিজের সব কিছু মুক্তিপণ হিসেবেও দিতে চায়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন) কিছুই গ্রহণ করা হবে না, এরাই হচ্ছে সে হতভাগ্য মানুষ,

যারা নিজেদের অর্জিত গুনাহের কারণে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্যে (আরো থাকবে) ফুটন্ত পানি ও মর্মন্তুদ শাস্তি। (আল আনয়াম, ৭০)

এ আয়াতের শিক্ষার আলোকে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ের মুখোমুখি হই।

প্রথমত, রসূল (স.)-কে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা হলেও কথাগুলো সকল মুসলমানের জন্যেই প্রযোজ্য। সবাইকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যেন তারা জাহেলিয়াতের ওপর টিকে থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ওইসব হতভাগা লোকদের নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দেয় এবং তাদের কুকীর্তির উচিত সাজা পাওয়ার জন্যে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়, যারা ধর্মকে নিছক গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ও অনুষ্ঠানসর্বস্ব বাজে কাজের আসর বানিয়ে নিয়েছে। তাদের পরিত্যাগ করা হতে হবে কথায় ও কাজে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থাকে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে ও আনুগত্যের মাধ্যমে এবং চরিত্র ও ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ না করবে, গ্রহণ না করবে জীবনের নিয়ম নীতি ও আইন কানুনের ক্ষেত্রে, সে-ই এ জীবনব্যবস্থাকে খেল তামাশা ও স্রেফ সামাজিক কিছু অনুষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে বোঝা যাবে। আর কিছু লোক এমনও আছে, যারা এই জীবনব্যবস্থা, মূলনীতি ও আইন কানুন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এমন এমন কথা বলে বসে, যাতে এ জীবনব্যবস্থা উপহাস বিদ্রূপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ইসলামী আকীদার বিষয়গুলোর মধ্যে গায়েবে বিশ্বাস অন্যতম। অনেকে এই বিষয়ে ঠাট্টা মস্কারি করে এই বিশ্বাসের বিষয়টিকে উড়িয়ে দিতে চায়। আর কিছু লোক আছে, তারা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ যাকাত সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এ ব্যবস্থা 'সেকেলে এবং আধুনিক যুগের সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়' বলে মন্তব্য করে। আবার কিছু সংখ্যক লোক দ্বীন ইসলামের অন্যতম মূলনীতি মানুষের লজ্জা-শরম, চরিত্র ও পবিত্রতা সম্পর্কে কটাক্ষপাত করে বলে, কৃষিজীবীদের সামাজিক জীবনে অথবা যৌথ সংসারে অথবা পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজে এ সব লজ্জা শরমের কথা অবান্তর। যারা ইসলামী নিয়মে বিবাহিত জীবনের বন্ধনকে অপছন্দ করে বা এসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে চায়, যারা নারীদের চারিত্রিক হেফাযতের জন্যে পর্দার বিধানকে শৃংখলিত জীবন মনে করে, যারা মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব মানতে পছন্দ করে না, পছন্দ করে না রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে, তারা বলে, 'ধর্ম ধর্মের জায়গায় থাকুক, রাজনীতিতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনা অপ্রয়োজনীয়। এসব ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিরাই আইন কানুন তৈরী করে নেবে'। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধি বিধান মানতেই হবে এটা কোনো জরুরী বিষয় হতে পারে না। এ সকল কথার সবগুলোরই অর্থ হচ্ছে, 'তারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশা ও আনন্দ উল্লাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কথাটাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। এদের সবার সাথেই মুসলমানদের দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে এবং এদের সবার সাথে সর্ম্পচ্ছেদ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র

তাদের উপদেশ দেয়ার প্রয়োজনেই যেটুকু মেলামেশা প্রয়োজন সেটুকুর অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। আর যালেম বলতে এসব মোশরেক ও কাফেরদেরই বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের নিজেদের কীর্তিকলাপের জালে নিজেরাই আবদ্ধ হয়ে চরম লাঞ্ছিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রসূল ও সকল মুসলমানকে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হুকুম দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের ধর্মকে খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসবের বিষয় বানিয়ে নিয়েছে, তাদের কথা বাদ দেয়ার পর মুসলমানদের প্রতি হুকুম হয়েছে যেন তাদের উপদেশ দেয়া হয় এবং যেসব অন্যায় কাজ তারা করে চলেছে তার প্রতিদানে তাদের আযাবের ভয়ও যেন দেখানো হয়। যেহেতু তাদের কাজের ফলে এ আযাবই তাদের পাওনা। তাদের উপদেশ দিতে গিয়ে একথাও জানিয়ে দেয়া দরকার, যদি তারা এভাবেই চলতে থাকে তাহলে কেয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করার জন্যে কোনো বন্ধু বা শাফায়াতকারী থাকবে না, যেমন করে কর্মের ফল ভোগ করার ব্যাপারে কোনো ওযর আপত্তি শোনা হবে না, বা তার বিপরীতে অন্য কোনো বদলাও গ্রহণ করা হবে না।

কোরআন করীমের বর্ণনাভংগিতে যেমন রয়েছে অনাবিল সৌন্দর্য, তেমনি রয়েছে অর্থের গভীরতা। বলা হচ্ছে–

وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ق لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ج

وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط

‘তুমি এ কোরআন দিয়ে (তাদের আমার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ এই পার্থিব কর্মকান্ডের ফলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে, (মহা বিচারের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো সাহায্যকারী বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবে না, সে যদি নিজের সব কিছু মুক্তিপণ হিসেবেও দিতে চায়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন) কিছুই গ্রহণ করা হবে না’। (আল আনয়াম, ৭০)

আলোচ্য অংশটুকুর বর্ণনাভংগিতে বুঝা যাচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে তার অতীতের মন্দ কর্মকান্ডের জন্যে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে যে, তার মুখ অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন তার এমন কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তখন বন্ধু হিসেবে কেউ কোনো সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে না বা আসতে পারবে না। সেদিন কারো কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, আর ওই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যে কারো কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না।

নাচ, গান, খেল তামাশা এবং নিছক কিছু মনগড়া আনুষ্ঠানিকতাকে যারা দ্বীন ধর্ম বুঝে নিয়েছে, আতশবাজি, আনন্দ উল্লাস, বেদয়াতী কর্মকান্ড ইত্যাদির মতো পাপ কাজের জন্যে তাদের শাস্তি পাওনা হয়ে গেছে, তাদের জন্যে রয়েছে ওপরে বর্ণিত

কঠিন শাস্তি। ওই শাস্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে লিখিত হয়ে গেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে–

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

'এরাই হচ্ছে সে হতভাগ্য মানুষ, যারা নিজেদের অর্জিত গুনাহের কারণে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের জন্যে (আরো থাকবে) ফুটন্ত পানি ও মর্মন্তুদ শাস্তি।' (আল আনয়াম, ৭০)

পৃথিবীতে তারা যা করেছে তার কারণেই তাদের চরমভাবে পাকড়াও করা হবে– আর এটিই হবে তাদের জন্যে সমুচিত প্রতিদান। এমন গরম পানি, যা তাদের হলকুম ও পেট ঝলসে দেবে, আর তাদের কুফরীর কারণে দেয়া হবে চরম শাস্তি। এ কুফরীর মনোভাবই তো তাদের সত্য সঠিক জীবনব্যবস্থা গ্রহণের দাওয়াতের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

তৃতীয়ত, মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, 'যারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশা ও উপহাস বিদ্রূপের বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

তাহলে ওই আনন্দ উল্লাস ও খেল তামাশাই কি ছিলো ওদের 'দ্বীন'?

আল কোরআনের বর্ণনা থেকে একথাই বুঝা যায়, এ কথা সে ব্যক্তির জন্যেও প্রযোজ্য যে মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেও এই সত্য 'দ্বীন'-এর প্রতি কটাক্ষপাত এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চলেছে। মুসলমান সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অবশ্যই এ নিকৃষ্ট খাসলাতটি পাওয়া যায় এবং তাদের মোনাফেক বলে অভিহিত করা হয়েছে, যেহেতু এসব ব্যক্তি মদীনাতে ছিলো।

আবার যেসব ব্যক্তি ইসলামের শান্তির ঘরে প্রবেশ করেনি, তাদের জন্যেও কি এ আয়াতটি প্রযোজ্য? অবশ্য ইসলামই তো প্রকৃতপক্ষে সত্য দ্বীন বা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা .... দ্বীন অর্থই হলো আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। দ্বীন শব্দটি দ্বারা আসলে কখনোই মানবনির্মিত জীবনব্যবস্থা বুঝানো হয় না। এখন এসব ব্যবস্থাকে কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। সুতরাং তার 'দ্বীন' পরিত্যাগ করার অর্থে সেই 'দ্বীন' পরিত্যাগ করা বুঝায় যা আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

এ জন্যেই আলোচ্য আয়াতে সেই 'দ্বীনের' দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পাঠিয়েছেন। এ জন্যেই এরশাদ হচ্ছে–

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا

'আর ওইসব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করো যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল তামাশা, ঠাট্টা মস্কারি ও উপহাস বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। (আল আনয়াম, ৭০)

আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন ওদের পরিণতি সম্পর্কে। তবে আমাদের কাছে মনে হয়, গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে অবতীর্ণ 'দ্বীন' ইসলামকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এ দ্বীনকে উপহাস বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে তার নিজের 'দ্বীন'-কে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, তা সে যেই হোক না কেন।

আর মোশরেক যে কারা তার বর্ণনা দেয়ার তেমন কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তবু বলছি, এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে। যেমন তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে দেব-দেবীদের অংশীদার বলে বিশ্বাস করে বা আল্লাহর দাসত্ব করার জন্যে পূর্বে আরও কারো দাসত্ব করার প্রয়োজন বোধ করে, অথবা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শাসন ক্ষমতা ও তাঁর আইন রচনার ক্ষমতার সাথে আরও কাউকে শাসনকর্তা হিসেবে কবুল করে। আর যারা বুঝে শুনে স্বেচ্ছাচারিতার কারণে এসব কাজের কোনো একটিও করবে, তাদের যে ধরনের মুসলমানই বলা হোক না কেন, তারা সবাই মোশরেক। সুতরাং দ্বীন শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, যালেম বা মোশরেক এবং যারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশার বিষয় বানায়, তাদের সাথে কতোক্ষণ পর্যন্ত ওঠাবসা করা যায়? ইতিমধ্যে আলোচনা এসে গেছে যে, উপদেশ দেয়া ও সতর্ক করার উদ্দেশে তাদের সাথে যতোটুকু ওঠাবসা বা মেলা মেশার প্রয়োজন হয় তা করতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে তাদের সাথে ওঠা বসা করা যাবে না। আর যখনই তাদের কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহের ভালোমন্দ বিচার করার দুঃসাহসিকতা দেখাবে, অথবা আল্লাহর আয়াতগুলোকে হাসি তামাশার বিষয়ে পরিণত করবে, তখনই তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের মজলিস থেকে উঠে পড়তে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিমধ্যে এসে গেছে।

এ প্রসংগে কুরতুবীর মতামত তাঁর কেতাব 'আল জামেউল আহ্কামিল কোরআন' নামক কেতাবে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–

'এ আয়াতটির মধ্যে ওই সকল যুক্তিবাদী আলেমদের কথা রদ করা হয়েছে, যারা বলে, মত বিনিময়, দাওয়াতদান বা আলোচনার জন্যে ওই সকল ফাসেকের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এক বৈঠকে বসা যেতে পারে এবং তাদের মতের ওপর ইসলামের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মেলামেশা করা যেতে পারে। উপদেশ দান ও আল্লাহর কথা স্মরণ করানোর উদ্দেশে, কারো ভুল সংশোধনের জন্যে এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মত পরিবর্তনের ইচ্ছা নিয়ে কারো সাথে মেলামেশা করা জায়েয। কেননা ফাসেক লোকদের সাথে মেলামেশা করা এবং তারা অন্যায় কথা বললে বা অন্যায় কোনো কাজ করলে প্রতিবাদ না করে চুপ থাকাটা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। কারণ এতে বাতিল বা অন্যায়কে মেনে নেয়া বুঝায় এবং সত্যের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া প্রতীয়মান হয়, সাধারণ লোকেরাও এ কাজকে মোনাফেকের কাজ বলে

মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ওদের সাথে মেলামেশা করায় আল্লাহর দ্বীনকে এবং যারা দ্বীনের ওপর টিকে আছে তাদেরকে হেয় করা হয়। এ ধরনের অবস্থায় মেলামেশার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছে ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

এভাবে কুরতুবী তাঁর কেতাবে নিম্নলিখিত কথাগুলোও বলেছেন–

ইবনে খুওয়ায়েয ইবনে মেকদাদ বলেন, আল্লাহর আয়াতকে যারা সমালোচনার বিষয় বানিয়েছে, সে মুখে মুসলমান দাবীদার বা কাফের যেই হোক না কেন, তাকে আমি পরিত্যাগ করেছি এবং তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। তিনি আরও বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী আলেমরা দুশমনের দেশে প্রবেশ করতেও মানা করেছেন, মানা করেছেন তাদের গির্জা এবং এবাদাতখানায়ও যেতে। কাফের ও বেদয়াতীদের সাথে ওঠা বসা করতেও নিষেধ করেছেন। তাদের প্রদি ভালোবাসা প্রদর্শন ও তাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। তাদের কথা শুনতে এবং তাদের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হতেও নিষেধ করেছেন, এমনকি তাদের নিজেদের পারস্পরিক তর্ক বিতর্কে কান দিতেও নিষেধ করেছেন।

এ ব্যাপারে একটি ঘটনা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। আবু ইমরান আন্নাখয়ীকে লক্ষ্য করে কোনো এক বেদয়াতকারী বলেছিলো, 'আমার একটি কথা শুনুন, কিন্তু তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'না, একটি কথাও শুনবো না, এমনকি তোমার কোনো কথার অর্ধেকও শুনবো না। অনুরূপ বর্ণনা আবু আইয়ুব আস সুখতিয়ানী থেকেও পাওয়া যায়। ফোযায়ল ইবনে ইয়াযও বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বেদয়াতকারীকে ভালোবাসে, আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত নেক কাজ পন্ড করে দেবেন এবং তার অন্তর থেকে ইসলামকে বের করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো বেদয়াতকারীর সাথে নিজ কন্যাকে বিয়ে দেবে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। যে ব্যক্তি কোনো বেদয়াতকারীর সাথে ওঠাবসা করবে, তাকে 'প্রজ্ঞা' বলতে কোনো জিনিস দেয়া হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি বেদয়াতকারীকে ঘৃণা করে, আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে মুক্ত রাখবেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আবু আবদুল্লাহ আল হাকেম রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বেদয়াতকারীকে সম্মান দেখালো, সে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো।'

সুতরাং কোনো ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ওপর থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো বেদয়াত কাজ করে, তাহলে তার সম্পর্কে এ সব কঠিন কথা উচ্চারিত হয়েছে। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো শাসনকর্তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে এবং কোরআন হাদীসের দলীল প্রমাণ তার সামনে উপস্থাপনের পরও যদি এ দাবীর ওপর সে দৃঢ় হয়ে থাকে, সে অবস্থায় সে শুধু বেদয়াতকারীই হবে না; বরং সে তো প্রকাশ্য কুফরী করছে এবং সে হবে নির্জলা কাফের, সে হবে মোশরেক ও তার কাজ হবে পরিষ্কার শেরেক।

এ বিষয়টি নিয়ে বর্তমান সমাজের আলেম ওলামাদের মাঝে খুবই জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তাদের এই জটিলতা ও অস্পষ্ট বক্তব্যের পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কেননা এ ধরনের লোক ইসলামের প্রথম যুগে না থাকায় তাদের সম্পর্কে সরাসরি তেমন কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের পর থেকে মুসলমান দাবীদার কোনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এ ধরনের দাবী কখনও শোনা যায়নি যে, মানুষই মানুষের জন্যে আইন রচনার নিরংকুশ ক্ষমতা রাখতে পারে, মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতা রাখতে পারে। অথচ বর্তমান সময়ের প্রায় সব মুসলমান দেশগুলোতেই সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী পরিষদ কিংবা পার্লামেন্ট সদস্যদের হাতে যে কোনো আইন রচনার ক্ষমতা তুলে দেয়া হয়েছে। তাতে সে আইন যদি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধেও যায় তবুও তা পাস হয়ে যায় ও বাস্তবায়ন হয়। এ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ একটি নতুন অবস্থা যার সাথে সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীন পরিচিত ছিলেন না। তাদের যমানায় সর্বোচ্চ যা হয়েছে তা হলো অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকরা স্বজনপ্রীতি ও যুলুম নির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আল্লাহর আইনের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন সব সময়ই ছিলো। তাই আমাদের পূর্বসূরি আলেমদের থেকে এ ধরনের অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। আর ফরাসী বিপ্লবের পরে ছাড়া এ ধরনের দাবীও কখনো উত্থাপিত হয়নি। ওই বিপ্লবের পরই গণহারে মুসলমানরা ইসলামের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে, তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে বাঁচিয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলেমদের কথায় সেই সমুচিত ও সিদ্ধান্তকর কথাটি আসেনি, যা আজকের নাফরমানদের জন্যে শরীয়তসম্মতভাবে প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী ফাসেক লোকদের পাপাচার সম্পর্কে যতো কথাই জানা যায়, আজকের সীমালংঘনকারীরা অপরাধের দিক দিয়ে সে সময়ের সকল সীমা পার হয়ে গেছে। তাদের পাপাচারের সর্বশেষ সীমা ছিলো শেরেক, শেরেকের সীমানায় তারা কখনো সাধারণভাবে প্রবেশ করেনি। অথচ বর্তমান সময়ে নামসর্বস্ব মুসলিম জাতির জীবনযাত্রার মূলনীতিই শেরেকের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

জাহেলী নেতৃত্বের সাথে সর্বাত্মক অসহযোগিতা করা

সূরাটি শুরু হয়েছে অত্যন্ত আবেগ ও মহব্বতপূর্ণ এক আহবান দ্বারা 'হে ঈমানদাররা', এ ডাক সেই পাক পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে, যাঁর ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যে ঈমান তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সেই ঈমান গ্রহণ করার নামেই ডাকা হচ্ছে। তিনি তাদের নিজেদের অবস্থানের যথার্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে আহবান জানাচ্ছেন এবং তাদের দুশমনদের কাছ থেকে কোনো প্রকার সাহায্য সহানুভূতির আশা পোষণ থেকে সতর্ক করছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের আরো স্মরণ করাচ্ছেন, ইসলামবিরোধী এসব দুশমনের কাঁধে ভর করে কোনো সফলতা পাওয়ার আশা করা দুরাশা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানে যে মহাগুরুত্বপুর্ণ কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মোমেনদের আল্লাহ তায়ালা আহবান জানাচ্ছেন যেন তাঁর দুশমনকে ওরা দুশমন মনে করে এবং ওদের দুশমনকে তাঁর দুশমন মনে করে। তাই এরশাদ হচ্ছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না (এটা কেমন কথা যে), তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছো!' (আল মোমতাহানা, ১)

এরপর মোমেনদের বলা হচ্ছে, তারা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। যে তাঁর সাথে শত্রুতা করছে সে তাদের সাথেও শত্রুতা করবে, কিন্তু তারা তো সেসব ব্যক্তি যারা আল্লাহর পছন্দমতো গুণাবলী ও ধাঁচে নিজেকে গড়ে তুলেছে, পৃথিবীতে তাঁর খলীফা হওয়ার দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে এবং তারাই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রিয়পাত্র ও বন্ধু। সুতরাং তাদের জন্যে আল্লাহর দুশমন ও তাদের নিজেদের দুশমনদের দিকে মহব্বতের হাত প্রসারিত করা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে স্মরণ করাচ্ছেন এবং তাদের আরও জানাচ্ছেন, তারা তো সেসব ব্যক্তি যারা তাদের নিজেদের দুশমন, তাদের দ্বীনের দুশমন এবং তাদের রসূলের দুশমন। তাদের পক্ষ থেকে রসূলকে পাগল খেতাব দেয়া ও তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচারের মাধ্যমে এই দুশমনী প্রকাশ পেয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে–

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ

'(অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তা অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহর রসূল এবং তোমাদের (জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে শুধু এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহর ওপর ইমান এনেছো।' (আল মোমতাহানা, ১)

আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে এ নির্যাতন ও পাপপূর্ণ আচরণ এবং হিংস্র ব্যবহারের পর তাদের মধ্যে মানবতার আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে?

তারা তো জেনে বুঝে সত্য অস্বীকার করেছে এবং রসূল ও মোমেনদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, কিন্তু এই বের করার পেছনে কারণ তো এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা তাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে। আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে মোমেনদের অন্তরের মধ্যে একটি আন্দোলন গড়ে দিয়েছেন যা তাদের ঈমান ও আকীদার সাথে একান্তভাবে জড়িত। একমাত্র এ কারণেই এ মোশরেকরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, দ্বিতীয় অন্য কোনো কারণে নয়। আর যে কারণে মতভেদ, ঝগড়া ও যুদ্ধ বেধেছে তা একমাত্র আকীদার বিভিন্নতার কারণেই বেধেছে। সত্য-সঠিক বিষয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ঝগড়া বেধেছে এবং আল্লাহর রসূলকে তারা দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, আর ঈমান আঁকড়ে ধরার কারণেই ওরা তাদের দেশছাড়া করেছে।

বিবাদ শুধু এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এ বিবাদ যখন চরম আকার ধারণ করেছে তখনই তাদের স্মরণ করানো হয়েছে, তাদের ও মোশরেকদের মধ্যে কোনো ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না– যদি প্রকৃতপক্ষেই তারা তাদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্তি ও তাঁর পথে জেহাদ করার উদ্দেশে বের হয়ে এসে থাকে। তাই এরশাদ হচ্ছে–

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ق

'যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদের উদ্দেশে ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘর বাড়ী থেকে) বেরিয়ে থাকো।' (আল মোমতাহানা, ১)

সুতরাং কোনো ঈমানদারের হৃদয়ে এমন দ্বিমুখী চিন্তা একত্রিত হতে পারে না যে, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কথা জানাবে, আবার সাহায্যের জন্যে মানুষের ওপর নির্ভর করবে। আর নিছক আল্লাহর জন্যে যারা সব কিছু ত্যাগ করেছে এবং তাদের সকল কাজ ও ব্যবহারে তা ফুটে উঠেছে, তখনই তাদের তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তি ও তাঁর পথে জেহাদের জন্যে ঘর-বাড়ী জীবনের মতো ত্যাগ করে বেরিয়ে তাদের পক্ষে পেছনের দিকে তাকানো ও মোশরেকদের সাথে কোনো প্রকার সখ্যতা গড়ে তোলার আর কোনো সুযোগ নেই।

এমতাবস্থায় কোন্ এমন জিনিস থাকতে পারে যা আল্লাহ্র পথে জেহাদের উদ্দেশে হিজরত করা হৃদয়ের মধ্যে এ ব্যক্তির জন্যে এতটুকু মহব্বত পয়দা করবে, যে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। সে তো আল্লাহ তায়ালা ও রসূল উভয়ের দুশমন!

এরপর মনের গোপন কন্দরে যে কথা গোপন করে রাখা হয়েছিলো তার জন্যে মৃদুভাবে ও গোপনে তিরস্কার করা হচ্ছে। এ জন্যেও তিরস্কার করা হচ্ছে যে, তাদের নিজেদের দুশমন, আল্লাহর দুশমন ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর দুশমনের কাছ থেকে অনুকম্পা লাভ করার জন্যে মনে আকাংখা পোষণ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহর কাছে অন্তরের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সব কিছু সমানভাবেই জানা রয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে–

تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ق وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ط

'যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদের উদ্দেশে ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘর বাড়ী থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে (আবার) বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যে কাজ গোপনে করো যে কাজ প্রকাশ্যে করো আমি তা সম্যক অবগত আছি।' (আল মোমতাহানা, ১)

এরপর এমন ভয়ংকরভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ধমক দিচ্ছেন যে, যে কোনো মোমেন ব্যক্তির অন্তরই এতে ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বলা হচ্ছে–

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজ করে, তাহলে (বুঝতে হবে) সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।।' (আল মোমতাহানা, ১)

হেদায়াত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার পর সে পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয় থেকে বড় ভয় কি আর কিছু হতে পারে! আর এই ধমক এবং হুশিয়ারী সংকেত তাদের শত্রুদের প্রকৃতি বুঝার জন্যে এক প্রকৃষ্ট উসিলা হিসেবে কাজ করেছে। আয়াতটি নিখুঁতভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, দুশমনেরা তাদের বিরুদ্ধে গোপনে কি ধরনের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের জাল বিছিয়ে রেখেছিলো। অবশেষে আরও কিছু কথা আসছে। এরশাদ হচ্ছে,

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ

' অথচ এরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে (শুধু তাই নয়); এরা নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে।' (আল মোমতাহানা, ২)

তখন তারা একেবারে জাত শত্রুর মতো ব্যবহার করবে এবং কাজ, কথা, ব্যবহার ও সর্ব উপায়ে, সকল অজুহাতে তোমাদের যথাসম্ভব কষ্ট দেবে, আর এসব থেকে আরও ধ্বংসাত্মক আরও কঠিন যে আচরণ তারা করবে তা হচ্ছে, সর্বতোভাবে তারা চাইবে, তোমরা (ঈমানের মহামূল্যবান রত্নটুকু হারিয়ে) কাফের হয়ে যাও। এরশাদ হচ্ছে–

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

'(আসলে) এরা এটাই চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও!' (আল মোমতাহানা, ২)

একজন মোমেনের জন্যে এ অবস্থা হচ্ছে সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে বড়ো। শারীরিক নির্যাতন এবং ঠাট্টা বিদ্রূপের চেয়েও এ কষ্ট অনেক কঠিন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার এই প্রিয় ধন কেড়ে নিতে চাইবে এবং চাইবে সে মোরতাদ হয়ে, দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যাক, সে ওই সকল শত্রু থেকে বড়ো শত্রু, যারা হাত ও কথা দ্বারা কষ্ট দেয়!

আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার ফলে কুফরী অবস্থা থেকে ফিরে এসে ঈমানী যিন্দেগীর স্বাদ পেয়েছে এবং ভুল পথ পরিত্যাগ করে সত্য পথের দিকে এগিয়ে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, সবচাইতে বড়ো কথা, একজন মোমেনের জীবন যাপন করতে পেরে ধন্য হয়েছে, কথা, কাজ, ব্যবহার ও চিন্তা-চেতনায় নিজেকে মোমেন হিসেবে পরিচিত করেছে এবং যে এ পথে দৃঢ়তা অবলম্বনে শান্তি লাভ করেছে, প্রশান্তিতে তার অন্তর-প্রাণ ভরে গেছে, সে এই ঈমানী যিন্দেগী পরিত্যাগ করে পুনরায় কুফরী জীবনের দিকে ফিরে যেতে তেমনি অপছন্দ করবে, যেমন কেউ আগুনে নিক্ষিপ্ত

হওয়া অপছন্দ করে। অথবা এর থেকে আরও বেশী অপছন্দ করবে। সুতরাং একথা অতীব সত্য যে, আল্লাহর দুশমনের সব চাওয়ার বড় চাওয়া হচ্ছে, একজন মোমেন ঈমানরূপী জান্নাত থেকে বেরিয়ে এসে কুফরীরূপী জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাক এবং আল্লাহর নেয়ামতে ভরপুর ঈমানী যিন্দেগী ত্যাগ করে এগিয়ে যাক কুফরীর পূতিগন্ধময় জীবনের দিকে।

এভাবেই আল কোরআন ধীরে ধীরে কাফেরদের বিরুদ্ধে মোমেনদের উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের আন্দোলনমুখী বানিয়ে অবশেষে চূড়ান্ত বাসনা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। কোরআন বলছে, '(আসলে) এরা এটাই চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও।'

যে ধ্বংসের দিকে কাফেররা এগিয়ে যাচ্ছে সেই দিকেই ঈমানদারদের টেনে নেয়ার জন্যে তারা বিভিন্ন কায়দায় নিরন্তর যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার প্রথম বিবরণ এখানে পেশ করা হলো। এরপর আসছে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার যে প্রবণতা বিরাজ করে, যার আকর্ষণ অনেক সময় তাকে কর্তব্য থেকে গাফেল করে দেয়, অবশেষে তাকে তার ঈমান আকীদার পরিপন্থী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে– তার বিবরণ। এ পর্যায়ে সতর্ক করতে গিয়ে ঈমানদারদের প্রতি যে কথাগুলো এসেছে তা হচ্ছে–

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না। সেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন; তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।' (আল মোমতাহানা, ৩)

একজন মোমেনের কাজ হচ্ছে, সে যে কাজই করুক না কেন, তার ফল সে এখানে যতোটা পাবে বলে আশা করে, তার থেকে বেশী আখেরাতে পাওয়ার আশা রাখে। সে এখানে চাষাবাদ করে, কিন্তু কার্যত তার জমির ফসল সে চায় আখেরাতে। সুতরাং যে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে তার আকীদা বিশ্বাসের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তা থেকে অবশ্যই সে বিরত থাকে। দুনিয়ার এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের সম্পর্কের খাতিরে বা আত্মীয়তার বন্ধন টিকিয়ে রাখার উদ্দেশে সে কিছুতেই তার ঈমান আকীদা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না; বরং সে স্থায়ী সম্পর্কই সে গড়ে তুলতে চায় যার বন্ধন দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই টিকে থাকবে। এ কারণে সে এমন কোনো সম্পর্ক রাখবে না যার ফলে আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে। এ জন্যেই তাদের সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না।'

অথচ এদের দিকেই সর্বদা তোমরা ঝুঁকে থাক এবং এদেরই জন্যে তোমাদের অন্তর ব্যাকুল হয়ে থাকে, আর এদেরই নিরাপত্তার জন্যে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের সাথে মহব্বত দেখানোর জন্যে অস্থির হয়ে যাও! হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার ঘটনাও তার সন্তান সম্পত্তির নিরাপত্তার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং হিজরত করে আসা এলাকায় তার আত্মীয়স্বজন, সম্পদ সম্পত্তি ও অপর ব্যক্তিদের নিরাপত্তার কথা বেমালুম তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, কেয়ামতের দিন এসব আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্ততি তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না।

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ

'কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।' (আল মোমতাহানা, ৩)

এর কারণ হচ্ছে, সেদিন যে সম্পর্কের কারণে তাদের প্রতি আকর্ষণ ছিলো সেই সম্পর্কই ভেংগে যাবে। আল্লাহ্‌র কাছে সেদিন আজকের এই সম্পর্কের কোনোই মূল্য থাকবে না।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'আর যা কিছু তোমরা করছো আল্লাহ তায়ালা তা সবই দেখছেন।' (আল মোমতাহানা, ৩)

তিনি মানুষের বাহ্যিক কাজ সম্পর্কে যেমন ওয়াকেফহাল, তেমনি তার অন্তরের গভীরে যে গোপন ইচ্ছা এরাদা বিরাজ করে, তাও তিনি পুরোপুরিভাবে অবগত।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদাহরণ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِيْدُ

'তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের (ঘটনার) মাঝে রয়েছে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ, তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে উপাসনা করো, তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্বীকার করি, আমাদের ও তোমাদের মাঝে (এখন থেকে) চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো– যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ বলে স্বীকার না করবে, কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম, যখন সে বলেছিলো), আমি তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছে থেকে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই এখতিয়ার নেই; (ইবরাহীম ও তার অনুসারীরা বললো,) হে আমাদের মালিক, আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং (আমাদের) তো তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের গুনাহখাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী। তাদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এবং সেসব লোকের জন্যে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে শেষ বিচারের দিনে কিছু পাবার আশা করে; আর যদি কেউ আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।' (আল মোমতাহানা, ৪-৬)

উল্লিখিত আয়াতটি সূরা মোমতাহানার তৃতীয় অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে প্রথম পর্যায়ের সে সকল মুসলমানের মর্যাদার কথা পেশ করা হয়েছে, যারা তাওহীদের ধারক বাহক হিসেবে ছিলেন প্রথম কাতারে। এরা ছিলেন ঈমান আকীদার আলোকবাহী প্রথম কাফেলা, যারা সকল যমানার সকল মানুষের সেরা মানুষ, তাদের ঈমানী মর্যাদা সবার উপরে, যেহেতু তারা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতে ঈমানের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। এ ছিলো সেই জাতি, যাদের নিগূঢ় সম্পর্ক বিস্তৃত ছিলো তাদের মহান পিতা, সত্যের ধারক ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত। শুধু আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়েই প্রথম দিকের এই সাহাবারা ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসুরি ছিলেন না; বরং চরিত্র বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তারা ছিলেন প্রথম সত্যাশ্রয়ী, ইবরাহীম (আ.)-এর সঠিক অনুসারী। ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আসা বিভিন্ন পরীক্ষার মতোই চূড়ান্ত বিপদ আপদ সহ্য করে তারা তাদের পূর্বপুরুষের আদর্শকে সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ছিলেন বদ্ধপরিকর। দ্বীনের খাতিরে তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দৃষ্টান্ত পর্যন্ত স্থাপন করেছেন। তারপর একমাত্র তাদের সাথে সম্পর্ক জুড়েছেন, যারা তাদের সাথে ঈমান গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের ঈমান আকীদা ও বিশ্বাস টিকিয়ে রাখার জন্যে অন্য সকল বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

এরপর যখন মুসলমানরা তাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের দিকে তাকায় তখন যেন অবাক বিস্ময়ে তারা দেখতে পায়, অতীত মুসলমানরা গভীর এক সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ,

তাদের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য, রয়েছে তাদের যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সুবিস্তীর্ণ আদর্শ, যা ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ আদর্শ শুধু মনে মনে বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাস্তব কার্যক্রমের মধ্যে একইভাবে এ আদর্শের প্রতিফলন পাওয়া যায়। আর তখন মানুষ অনুভব করে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত ইসলামের এ আদর্শ যতোটুকু ফলপ্রসূ, তার থেকে অনেক বেশী সুফলদায়ক হয় সামাজিক জীবনে, যেখানে সবার সাথে মিলে মিশে মানুষ বাস করে। আল্লাহর পতাকাতলে সমবেত থাকার ফলে আজও অসংখ্য মুসলমান বিভিন্ন শক্তিধরদের ভ্রকুটি উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের ওপর টিকে রয়েছে। ভবিষ্যতে যত প্রকার প্রতিকূলতা আসতে পারে তার সকল ভয়াবহতাই এ পর্যন্ত আঘাত হেনেছে এবং ইসলামী কাফেলা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে চলেছে। নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া এবং নতুন এমন কোনো সংকট আর আসার মতো নেই, যার অভিজ্ঞতা পেছনে হয়নি। মোমেনদের জীবনের ওপর অভূতপূর্ব আর কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে না যা তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিতে পারে। এ জাতির সামনে রয়েছে ঈমান আকীদার ওপর টিকে থাকার সংগ্রাম সংঘাতের এক দীর্ঘ ইতিহাস। যখনই ইসলামের দুশমনদের সাথে ইসলামী বিশ্বাসের মোকাবেলা হয়, তখনই ইসলামের বিজয় ডংকা বেজে ওঠে এবং এই মহান জীবনব্যবস্থার সুবিস্তীর্ণ শাখা প্রশাখা ছেয়ে যায় গোটা পরিবেশের ওপর। এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্যে সকল দিক থেকে এগিয়ে আসে শ্রান্ত ক্লান্ত যাযাবরের দল। আর এ মহান মহীরুহের বীজ বপন করে গেছেন প্রথম যুগের মুসলমানরা, যারা ছিলেন মহানবী ইবরাহীম (আ.)-এর যথার্থ অনুসারী।

ইবরাহীম (আ.) ও তার সংগী-সাথীরা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলে গেছেন, ঈমানদারদের জন্যে রেখে গেছেন উজ্জ্বলতম পথের দিশা। আর রয়েছে প্রথম যুগের সেসব মুসলমানের মধ্যে আজকের শতধাবিভক্ত মুসলমানদের জন্যে উৎকৃষ্ট আদর্শ। এরশাদ হচ্ছে—

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ

'তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর বদলে যাদের গোলামী করো তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্বীকার করি, আমাদের ও তোমাদের মাঝে (এখন থেকে) চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো— যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ বলে স্বীকার না করবে, কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম, যখন সে বলেছিলো), আমি তোমার জন্যে

(আল্লাহর দরবারে) ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছ থেকে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই এখতিয়ার নেই।' (আল মোমতাহানা, ৪)

বাতিলপন্থী জাতি ও তাদের মনগড়া অলীক মাবুদ এবং নেতাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এ-ই ছিলো স্পষ্ট ঘোষণা। ক্ষমতাগর্বী, মিথ্যার ধ্বজাধারী ও তাদের শক্তিকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা জানানোই ছিলো এ ঘোষণার উদ্দেশ্য। তারা এক আল্লাহর ওপর ঈমান না আনা পর্যন্ত এই শত্রুতা, বিদ্বেষ ও সম্পর্কচ্ছেদ চলতে থাকবে। এ হচ্ছে সেই চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদ, যা ঈমান আকীদার পার্থক্যের কারণে হয় এবং যার কারণে পারিবারিক বন্ধন ও আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই কারণে প্রত্যেক যুগে মোমেনদের এই অভিজ্ঞতার আলোকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং ইতিহাস সাক্ষী, ইবরাহীম (আ.) ও তার অনুসারীরা কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্যে সুন্দরতম আদর্শ হয়ে থাকবেন।

কোনো কোনো মুসলমানের মনে একথা জাগে যে, ইবরাহীম (আ.) তার মোশরেক বাপের জন্যে কিভাবে ক্ষমা চাইলেন! এর দ্বারা তো মোশরেক আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাদের জন্যে দরদ-সহানুভূতি দেখানোর একটি সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। এজন্যে ইবরাহীম (আ.)-এর উচ্চারিত বাক্য, 'অবশ্যই আপনার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী হবো' কথাটির পেছনে কি দৃষ্টিভংগি ছিলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে, ইবরাহীম (আ.) এ কথা তখন বলেছিলেন যখন তার পিতা আযরের শেরেকের ওপর যিদ ধরে টিকে থাকাটা নিশ্চিতভাবে তিনি বুঝতে পারেননি। যখন তিনি কথা বলেছিলেন, তখন চাচ্ছিলেন, পিতা ঈমান আনুক এবং এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন। সূরা তাওবায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন–

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ أَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ط إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

'ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্যে মাগফেরাত চাওয়ার ব্যাপার একটি ওয়াদার প্রতিপালন ছাড়া আর কিছুই ছিলো না– যা সে তার পিতার কাছে (আগেই) করে রেখেছিলো, এ (ব্যতিক্রম)-টা ছিলো শুধু তার একার জন্যেই, কিন্তু তারপরও যখন একথা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সে অবশ্যই আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো, অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো একজন কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ।' (আত তাওবা, ১১৪)

এখানে প্রমাণ হয়ে গেলো যে, ইবরাহীম (আ.) বিষয়টি পুরোপুরিভাবে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ওপরই পরিপূর্ণভাবে ভরসা করেছিলেন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর দিকে রুজু করেছিলেন।

وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

'না, আপনাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর মতো কোনো ক্ষমতা আমার নেই; হে আমাদের রব, তোমার ওপর আমরা ভরসা করেছি, তোমারই দিকে আমরা রুজু করেছি এবং তোমার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।' (আল মোমতাহানা, ৪)

এভাবেই তিনি আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে এভাবে ঈমানের দিকটি দেদীপ্যমান হয়ে ফুটে উঠেছে যেন তাঁর উত্তরসুরি মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের দিকটিই যথাযথভাবে গুরুত্ব লাভ করে। প্রশিক্ষণদান ও মানুষের মন মগযকে আল্লাহর দিকে ফেরানোর জন্যে এ ঘটনা এক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। এ বিষয়ে পাকড়াও করারও দৃষ্টান্ত রয়েছে, যাতে করে বিষয়টি ইবরাহীম (আ.) যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন এবং আল কোরআনের দৃষ্টিভংগি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এরপরই ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনার অপর অংশ আসছে, যার মধ্যে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলছেন–

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

'হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না।' (আল মোমতাহানা, ৫)

আমাদের ওপর ওদের জয়যুক্ত করো না, তাহলেই তাদের এ বিজয়ী অবস্থা আমাদের জন্যে একটা পরীক্ষার বিষয় হয়ে যাবে। তখন তারা বলতে শুরু করবে, ঈমান যদি তাদের সহায়তা করে থাকে, তাহলে আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হই কেমন করে এবং তাদের প্রতি জবরদস্তিপূর্ণ ব্যবহার করি কেমন করে! তাদের সামনে আমরা হেয় হয়ে গেলে অন্তরের মধ্যে নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সাময়িকভাবে সত্যের ওপর মিথ্যার বিজয়ী হওয়া এবং অহংকারী ও আল্লাহদ্রোহীদের ঈমানদারদের ওপর শক্তিমান হওয়া– এর মধ্যে রয়েছে এমন এক রহস্য, যা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। মোমেন যে কোনো বিপদ আপদে অবশ্যই সবর করবে, তবে তার অর্থ এ নয় যে, বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাবে না। যেসব কারণে মনের মধ্যে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়ে মনকে দুর্বল করতে পারে, তা থেকে বাঁচার জন্যে অবশ্যই সে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। দোয়ার অবশিষ্ট অংশ হচ্ছে–

وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا

'এবং হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের মাফ করে দাও।' (আল মোমতাহানা, ৫)

কথাগুলো উচ্চারণ করছেন মহাদয়াময় প্রভুর বন্ধু ইবরাহীম (আ.)। এ দোয়া করার সময় তিনি অবশ্যই অনুভব করছেন যে, তিনি সেভাবেই আল্লাহর আনুগত্য করে চলেছেন যা তাঁর পাওনা। আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমত লাভ করার জন্যে যোগ্যতা হিসেবে মানুষের পক্ষে যে বিনয় প্রকাশ করা প্রয়োজন এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় যে ব্যবহার আশা করা যেতে পারে, তা সবই ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে বর্তমান ছিলো, যার কারণে তিনি তাঁর রবের কাছে বড় আশা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এই প্রার্থনার ভাষা ও ভংগি এমন মধুর, যা বড়োই হৃদয়স্পর্শী এবং যে কোনো ব্যক্তির জন্যে অনুকরণীয়।

এরপর ইবরাহীম (আ.) তাঁর দোয়া শেষ করতে গিয়ে আল্লাহর সেই গুণাবলী তুলে ধরছেন যা দোয়া কবুলের জন্যে বড়ই উপযোগী।

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।' (আল মোমতাহানা, ৫)

'আল্ আযীয' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, তিনি যে কোনো কাজ করতে সক্ষম এবং 'আল-হাকীম' বলতে বুঝায়, হেকমতের সাথে কর্ম সম্পাদনকারী।

ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সংগীরা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অবশেষে অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে এবং পুরোপুরিভাবে নিজেদের আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে এমন হৃদয়াবেগ নিয়ে প্রার্থনা করছেন, যা অনুসরণের জন্যে মোমেনদের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক সে মহান ব্যক্তিদের কথা বলতে গিয়ে এরশাদ করছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

'তাদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এবং সেসব লোকের জন্যে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে শেষ বিচারের দিনে কিছু পাবার আশা করে; আর যদি কেউ আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।' (আল মোমতাহানা, ৬)

তাহলে বুঝা গেলো, ইবরাহীম (আ.) ও তার সংগী সাথীদের জীবন তাদের জন্যেই আদর্শ, যারা আল্লাহকে পেতে চায় ও আখেরাতের শান্তিময় জীবন লাভ করতে আগ্রহী। এরাই হচ্ছেন সেসব মহান ব্যক্তি, যারা সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তার সুফলও লাভ করেন। এ পরীক্ষার মধ্যেই তারা অনুসরণযোগ্য আদর্শ লাভ করেন এবং সঠিক পথে চলার ব্যাপারে অগ্রগামী হন। অতএব, যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে পেতে চাইবে ও আখেরাতের জীবনে শান্তি কামনা করবে, সে যেন এ মহান ব্যক্তিদের

আদর্শ অনুসরণ করে। আজকের যুগের মোমেনদের জন্যে অবশ্যই এটা একটা সুসংবাদ।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ পথ পরিহার করবে, ইসলামের এ কাফেলার বাইরে যে যেতে চাইবে এবং এই ঈমানী সম্পর্ক ছিন্ন করে যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে, মহান আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই তাকে জোর করে কাছে টেনে আনার। কারণ,

فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

'আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক'। (আল মোমতাহানা, ৬)

ইসলামের প্রথম যুগ যখন সমাপ্তি পর্যায়ে এসে গেলো এবং ইতিহাসের শুরুতে মোমেনরা সকল দিক থেকে উন্নতি লাভ করলো, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো তাদের সুনাম, তাদের ওপর আসা পরীক্ষা এবং সেগুলো বলিষ্ঠভাবে অতিক্রম করার ইতিহাস পৃথিবীর জাতিসমূহের কাছে সংরক্ষিত হলো এবং এসব পরীক্ষা শেষে তাদের সুমহান মর্যাদার আসনে সমাসীন হতে দেখা গেলো। যারা কোনো দিন মানুষকে সাফল্যের পথে কিছুমাত্র দিকদর্শন দিতে দেখেনি, তাদের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শন করা হতে লাগলো।

কোরআনুল করীম তাদের সম্পর্কে এ গুরুত্বের ধারণা দিয়ে বার বার তাদের আনুগত্য করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলেছে। সুতরাং পরিচালকের আসনে সমাসীন এ জাতি যেন মানুষের কাছে কোনো দিক দিয়ে ভয়ংকর বলে বিবেচিত না হয়, যদিও পৃথিবীতে তারা একক জাতি হিসেবে থাকে। তাদের কার্যকলাপ ও ব্যবহার যেন এমন হয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করতে কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট পেতে না হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন কর্মীদের ধৈর্যের নির্দেশ

ধৈর্য ইসলামী আন্দোলনের একটি অপরিহার্য উপাদান। কোরআন করীমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসংগে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ে সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতটির দিকে আমরা মনোনিবেশ করছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'হে ঈমানদাররা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (এ কাজে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (ঈমানের দাবীতে) সদা সুদৃঢ় থেকো। একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো, (এভাবেই) আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে!' (আলে ইমরান, ২০০)

'হে ঈমানদার ব্যক্তি' বলে মোমেনদের ডাক দেয়া হয়েছে। উপরওয়ালার এ ডাকের মাঝে তাদের জন্যে সম্মানের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদের যোগ্য করে তোলার ডাক দেয়া হয়েছে, যাবতীয় কঠিন পরিস্থিতির সামনে ধৈর্য ধারণ করা, ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় সাহস ও ধৈর্যের সাথে অটল থাকা, সব ধরনের জেহাদ ও মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত থাকা, সর্বোপরি আল্লাহর ভয়কে সদা ধারণ করতে তাদের আদেশ দেয়া হচ্ছে।

কোরআন করীমের অসংখ্য জায়গায় 'সবর' ও তাকওয়ার' কথা বলা হয়েছে। কোথাও একত্রে, কোথাও বা আলাদা আলাদাভাবে বলা হয়েছে– বিপদ-আপদে তোমরা 'সবর' করো, আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো এবং তা করার জন্যে প্রস্তুত থাকো। প্রতিটি অন্যায় ও ধোকা প্রতারণা নির্মূল করার জন্যে সদা সচেষ্ট থাকো। শত্রুদের কোনো রকম প্রতারণামূলক কাজই সফল হতে দিয়ো না।

এ সূত্রে সূরা আলে ইমরানের শেষ ভাষণটি একইভাবে 'সবর', 'মোসাবারা', 'মোরাবেতা' ও 'তাকওয়া' দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

সবর হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর একমাত্র পাথেয়। কারণ এ পথে চলতে গেলে পদে পদে বহু বিপদ-আপদ আসে, প্রতিটি স্তরে একটি নতুন মসিবত এসে পথ আগলে ধরে।

নফসের ইচ্ছা-আকাংখার ওপর ধৈর্য ধারণ করা, তার বহুবিধ লোভ-লালসার ওপর ধৈর্য ধারণ করা, তার অসংখ্য দুর্বলতা, অপূর্ণতা ও তাড়াহুড়ো করার মানসিকতার ওপরও ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

মানুষের অজ্ঞানতা, মিথ্যা ধ্যান-ধারণা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি, তাদের মনের সংকীর্ণতা, তাদের জ্ঞাণের সংকীর্ণতা, তাদের অহমিকা ও অহংকারবোধ, সত্য এড়িয়ে চলার ব্যাপারে তাদের নানা ধরনের মিথ্যে অজুহাত ইত্যাদির ওপরও ধৈর্য ধারণ করতে হয়। আরো ধৈর্য ধারণ করতে হয় অন্যায়-অনাচারের ক্রমবর্ধমান প্রসারের ওপর, অন্যায় ও বাতিলকে শক্তিশালী হতে দেখার ওপর, ক্ষেত্র বিশেষে নেককার লোকদের সহায় সম্বলহীন হওয়া ও তাদের চলার পথ দীর্ঘ বন্ধুর হওয়ার ওপর। যাবতীয় সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় শয়তানের সব ধরনের প্ররোচনার ওপরও তাকে সবর করতে হয়।

সর্বোপরি দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক, ক্রোধ হিংসা, আশা নিরাশার মতো নানা ধরনের মানসিক রোগের ওপর। ভালো অবস্থায় বেশী খুশী হয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে মাবুদের কৃতজ্ঞতা আদায় করার ওপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁকেই ভয় করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁকে ভয় করার মানসিকতার ব্যাপারেও ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে।

এ সব কয়টি অবস্থার ওপর সবর করা, একজন আল্লাহর পথের খাঁটি সৈনিকের সামনে আসা সব কয়টি অবস্থার ওপর সবর করা সত্যিই বড়ো কঠিন ব্যাপার! কেননা তার কষ্টকর ও তিক্ত অভিজ্ঞতাসমূহ কোনো শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে এ সবরের মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের অনাবিল স্বস্তি, যা একমাত্র আল্লাহর পথের সে মোজাহেদই উপলব্ধি করে যে তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে, যার জীবনে এ ধরনের বাস্তব ময়দানে সবরের অভিজ্ঞতা ঘটেছে। এ কারণেই ব্যক্তি মোমেনকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কারণ সবরের যতোগুলো দিক ও বিভাগ থাকতে পারে, তার সব কয়টি বিষয় অনুধাবন করে সে-ই নিজের জীবনকে এর জন্যে প্রস্তুত করতে পারে। সে এটা অন্যদের চাইতে বেশী অনুধাবন করতে পারবে। কেননা, চিন্তা ও কর্মের উভয় ক্ষেত্রেই সে এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করে এসেছে। যে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে একমাত্র তার পক্ষেই এটা অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে যে, সত্যিকার সবরের অর্থ কি?

আরবী শব্দ 'মোসাবারা' সবরের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে ওপরে বর্ণিত সবরের সব কয়টি ধরনের অনুভূতির প্রকারভেদ বোঝানো হয়েছে। ইসলাম বিরোধী সব ধরনের তৎপরতা, চাই তা মানুষের ভেতর লুকানো প্রকৃতি পূজা হোক, নফসের দাসত্ব হোক অথবা বাইরের পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার সব ধরনের দুশমন হোক, যারা ইসলামের আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্যে জান মাল বাজি রেখে আদাজল খেয়ে নেমেছে, দ্বীনের এ বাতি নির্বাপিত করে তার স্থলে জাহেলিয়াতের অন্ধকারকে পুন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এ বাতিল ও অন্যায়পন্থী লোকদের মোকাবেলায় সত্যপন্থী লোকেরা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে দ্বীনের ঝান্ডা বুলন্দ করতে এগিয়ে আসবে, অর্থাৎ মোমেন ও কাফেরদের মাঝে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা এখানে লেগেই থাকবে। এ অবস্থায় মোমেনরা কাফেরদের যুলুমের মোকাবেলায় ধৈর্য ধরবে, প্রতিরক্ষার

মোকাবেলায় প্রতিরক্ষা করবে, চেষ্টা সাধনার মোকাবেলায় চেষ্টা সাধনা করবে, স্বীয় পথের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে সংগ্রাম করবে। একইভাবে কাফেরদের সাথে প্রতিযোগিতায় অটল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মোমেন যে পরিমাণ সবর করতে পারবে, কষ্ট সহ্য করতে পারবে ও নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বাড়িয়ে দিতে পারবে, ততোই সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডা বুলন্দ হতে থাকবে এবং যতোই শত্রু পক্ষের কর্মতৎপরতা ও প্রতিশোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকবে, ততোই ন্যায়-অন্যায়ের এ সংগ্রাম কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকবে।

'মোরাবাতা' শব্দটিও অনেকটা একই অর্থবোধক। এর অর্থ হচ্ছে জেহাদ ও প্রতিরোধের সময় কাতার বেঁধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। দূর্গে অবস্থানকালে শত্রুদের মোকাবেলায় অটল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আমাদের ইতিহাসের প্রথম দিকে ঈমানদার ব্যক্তিরা সর্বদা এই জেহাদ ও যুদ্ধরত অবস্থায় অবস্থান করতেন। মুহূর্তের জন্যেও তারা শত্রুদের সামনে অবহেলা ও অবজ্ঞামূলক আচরণ করতেন না। নিমিষের জন্যেও তারা নিজেদের চোখের পাতা বন্ধ করতেন না। কখনো আরামে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে বসে থাকতেন না। কোনো পর্যায়েই তারা তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় সামান্যতম অবহেলাও প্রদর্শন করেননি। তারা দাওয়াতের প্রথম দিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সদা সতর্ক থাকতেন এবং এভাবেই তারা সর্বদা একটি সর্বাত্মক জেহাদে নিরত থাকতেন।

ইসলামের এই যে আহ্বান ও দাওয়াত– তা এমন একটি জীবন বিধান, যা জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগের প্রতিই লক্ষ্য দেয়। একদিকে এ ব্যবস্থা যেমন মানুষের অন্তর বিশুদ্ধকরণ করে, তাকে পরিশীলিত করে, তাকে ট্রেনিং দেয়, অপরদিকে এ জীবন বিধান মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ ব্যবস্থা মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা দেয় এবং এর সব ব্যবস্থাই 'সত্য ও ন্যায়ের' ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ কারণেই সমাজের কুৎসিত ও জাহেলী ব্যবস্থা এই ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে না। বাতিল কোনো দিনই 'হক'কে স্বীকার করে না, বিদ্রোহী শক্তি কখনো এই কল্যাণমূলক ব্যবস্থা মানুষের জন্যে চলতে দিতে পারে না। এ অবস্থায় যাবতীয় অন্যায় ও বাতিল বিদ্রোহী শক্তি একত্রিত হয়ে ইসলামের কল্যাণমূখী ব্যবস্থাকে রুখে দাঁড়ায়। এ চিরন্তন দ্বন্দ্বে সমাজের সেসব শক্তি এক হয়ে সত্যের মোকাবেলা করে, যারা সমাজে দীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত রাখা নিজেদের অবৈধ স্বার্থ, মোনাফেকী মানসিকতা, দুনিয়ার সংকীর্ণ স্বার্থের মায়া ত্যাগ করতে পারে না। সমাজের সেসব লোক ইসলামের মোকাবেলায় সংঘবদ্ধ হয়, যারা গর্ব অহংকারের শিকার হয়ে কোনো অবস্থায়ই আল্লাহদ্রোহী প্রবণতা থেকে ফিরে আসতে চায় না। এদের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে আরো এসে হাযির হয় যারা দুনিয়ার সব ধরনের নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা ভালোবাসে, এই কুৎসিত ব্যবস্থা ও অশ্লীলতা ও নোংরামিকে ভালোবাসে এ থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চায় না।

এখানে এসে ইসলামের জন্যে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় এই জাহেলী ও কুফরী শক্তির সাথে জেহাদ করা, আর এ সর্বাত্মক জেহাদের জন্যে প্রয়োজন মুসলমানদের সাধারণ শক্তি-সামর্থকে একত্রিত করা এবং অটল অবিচল ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা, সর্বোপরি হামেশা শত্রুর মোকাবেলায় সতর্ক থেকে কঠোর হয়ে নিজের আদর্শের ওপর অটল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং এ বিষয়গুলো পাথেয় করে সর্বাত্মক জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া– যতোদিন পর্যন্ত অন্যায় ও বাতিল সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায় এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালেমার বিজয় সূচিত না হয়। এ হচ্ছে এই দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ও এর সুস্পষ্ট কর্মসূচী। ইসলাম কখনো এটা চায় না যে, মানবতার ওপর অত্যাচার-অবিচার চলতে থাকুক, ইসলাম চায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। আল্লাহর বান্দারা আল্লাহরই প্রদর্শিত সঠিক পথে চলুক এবং এটা অবধারিত সত্য, বাতিলের অনুসারীরা এ ব্যবস্থার পথ আগলে ধরবে, তার প্রতিরোধ করবে, শক্তি-সামর্থ ও ধোকা-প্রতারণা দিয়ে তার গতিরোধ করতে চাইবে এবং এ ব্যবস্থা যাতে কোনোদিন কার্যকর হতে না পারে, তার জন্যে চক্রান্তের সব কয়টি জাল বিছিয়ে দেবে। কথা ও অন্তর দিয়ে, অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তার বিরোধিতা করবে। এ সংগ্রাম এ যুদ্ধ থেকে মোমেনের নিস্তার নেই। এ লড়াই তাকে করতেই হবে। আর এ লড়াইয়ের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে মোমেন এক মুহূর্তের জন্যেও গাফেল হবে না, অবহেলা করবে না। অব্যাহত গতিতে এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

আর 'তাকওয়া' হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং এই ভয়ের কারণে সদা-সতর্ক থাকা। এটা এই পথের এক মূল্যবান সম্বল। তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের হেফাযতকারী। এটা কখনো মানুষের অন্তরকে গাফেল হতে দেয় না। তাকওয়া হচ্ছে মনের দুয়ারে এক জাগ্রত প্রহরী, যা কখনো তাকে ঘুমুতে দেয় না। প্রতিটি পর্যায়ে 'তাকওয়া' হচ্ছে একটি পাহারাদার। সত্যের পথের প্রতিটি সংগ্রামী মোসাফেরেরেই এমন এক পাহারাদারের প্রয়োজন রয়েছে, যা পথের দুঃখ-কষ্ট দূর করে তাকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মোকাবেলা করে তার চলার পথ সহজ করে দিতে পারে।

এক কথায়, এ সূরায় সত্য পথের অনুসারীদের দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব কর্তব্য বলে দেয়া হয়েছে। তার সব কয়টি দিককে একত্রিত করে এই পথের কষ্ট-মসিবতের কথাও তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে এই দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের পরিণাম এই বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, এ কাজ যথাযথ আঞ্জাম দিলে 'সম্ভবত তোমরা মুক্তি পাবে, সফলকাম হবে।'

সবরে জামিল

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا - اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۷ - وَّنَرٰهُ قَرِيْبًا ۸

(হে নবী কাফেরদের ব্যাপারে) তুমি (আরো) সুন্দর করে ধৈর্য ধারণ করো। কাফেররা (তাদের) এ (অবধারিত আযাব)-কে বহু দূরের (ব্যাপার) হিসেবেই দেখতে পায়, অথচ আমি তো তা দেখতে পাচ্ছি একেবারে আসন্ন। (আল মায়ারেজ, ৫-৭)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর রসূলকে 'সবরে জামিল' করতে বলা হয়েছে। কেননা মানুষকে আল্লাহর পথে আহবানের জন্যে এ গুণ অর্জন একটি অপরিহার্য শর্ত। প্রত্যেক রসূলকেই এ একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর রসূলের অনুসারী প্রত্যেক মোমেনের জন্যেও সেই একই নির্দেশ রয়েছে। প্রতিটি কঠিন ও ক্লান্তিকর অবস্থার মধ্যে এ সবরই হচ্ছে জরুরী বিষয়, যা মানবমন্ডলীকে রক্ষার জন্যেও প্রয়োজন। প্রসন্ন বদনে সবর করতে পারলেই দূরবর্তী লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আশা করা যায় এবং আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত সাফল্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

صَبْرًا جَمِيْلًا

'দুশ্চিন্তাহীন ধৈর্য!'

'সবরে জামিল' অর্থাৎ 'সুন্দর সবর' হচ্ছে নিশ্চিন্ততা-দানকারী সবর, যার সাথে কোনো ক্রোধ, কোনো অস্থিরতা, কোনো সন্দেহ জড়িত থাকে না, এমন সবর যার পরিণতি সুন্দর ও নিশ্চিত, সবরকারী ব্যক্তি সত্য পথে টিকে থাকার সংকল্পে অবিচল এবং ধৈর্য অবলম্বনের শুভ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত, আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য লিখনে সে সন্তুষ্ট। যে কোনো পরীক্ষার মধ্যেই যে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন তা সে গভীরভাবে অনুভব করে। যা কিছু সুকীর্তি তার আছে এবং যা কিছু সে করছে, সকল ব্যাপারেই তাকে হিসাব দিতে হবে বলে সে বিশ্বাস করে।

এখানে 'সবর'-এর এ গুণটি বিশেষভাবে ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা সবর করার দাওয়াত হচ্ছে জনগণের কাছে আল্লাহরই দাওয়াত, আর ইসলামের দাওয়াত বলতে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোই বুঝায়। এ দাওয়াতে দাওয়াতদাতার নিজের কোনো স্বার্থ নেই এবং এ দাওয়াত দান করার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সুযোগও নেই। এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে কাজ করা ব্যতীত অন্য কিছু সে আশাও করে না। একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কেই সে মানুষকে জানাতে থাকে। সুতরাং এ কাজ করতে গিয়ে সে যে সুন্দর ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করে, তা তার দাওয়াতী কাজের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী এবং সে তার বিবেকের গভীরে এ সবরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এই দাওয়াতের মূল মালিক। তাঁর দিকেই মানুষকে ডাকা হয়। সত্য অস্বীকারকারী কাফেররা এ দাওয়াতের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। আযাবের ওয়াদা প্রদানকারী আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তারা জলদি করে আযাব পাঠানোর দাবী জানায়, 'আসলে আযাব যে আসবে' একথাটা তারা একটা মিথ্যা বলে মনে করে।

যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সেসব বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং কোন সময়ে সেগুলো ঘটবে সে সময়ও আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। গোটা বিশ্বের প্রয়োজন সামনে রেখে তাঁর জ্ঞান ও সুকৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে, কিন্তু মানুষ তাঁর ব্যবস্থাপনা ও পূর্বনির্ধারিত

সিদ্ধান্ত না জানা না বুঝার কারণে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার কোনো উদ্দেশ্য সফল হতে বিলম্ব হলে তার সাফল্য সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে যায়। এর ফলে দাওয়াতদানকারীদের অন্তরের মধ্যেও কিছুটা পেরেশানী এসে পড়ে। এ কারণে তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুত মনযিলে মকসূদে পৌছানোর আকাংখা, আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখা যায়। এমনই পর্যায়ে এসে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে সান্ত্বনাবাণী দান করা হয় 'অতএব, সুন্দর ভাবে সবর করো', নিজ লক্ষ্যে পৌছানোর সংগ্রামে অবিচল থাকো।

এর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর অন্তরকে কঠিন দুঃসময়ে শক্তি যোগানো হয়েছে, বিশেষ করে যখন তিনি চরম বিরোধিতা ও উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাঁর কথাগুলো মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো। সে সময় আল্লাহ তায়ালা এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, মানুষ যা ভাবে তা হয় না, হয় তাই যা আল্লাহ তায়ালা করতে চান এবং যে কোনো কর্মকান্ডের ভালো মন্দের ব্যাপারে তাঁর মাপকাঠিগুলোই সঠিক. মানুষের সংকীর্ণ-দৃষ্টিসম্মত মাপকাঠি কস্মিনকালেও সঠিক নয়।

দাওয়াতের কাজে মার্জিত ভাষার গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি কতো করুণাময়, যেখানে তিনি নিছক একটি কেতাব নাযিল করেই তাঁর বান্দাদের তা আমল করার নির্দেশ দিতে পারতেন সেখানে কেতাবের সাথে তিনি রসূলও পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি মানুষকে রসূলের মাধ্যমে ইসলামী আদব কায়দা রীতিনীতি হাতে কলমে শিক্ষা দিতে পারেন। এখানে আমরা কোরআনের এমনই আয়াত নিয়ে আলোচনা করবো যেখানে আল্লাহর মোমেন বান্দাদের দিকে ইংগিত করে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলা হচ্ছে যেন তিনি এদের উন্নতমানের আদব কায়দা শিক্ষা দেন, সুন্দরতম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন এবং তাদের পবিত্র কথা ও মিষ্টি মধুর আচরণ শেখান, যেন সদা সর্বদা তারা ভাল ও কল্যাণকর কথা বলেন। এরশাদ হচ্ছে-

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

'(হে নবী,) আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন (কথা বলার সময়) এমন সব কথা বলে যা উত্তম, (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, আর শয়তান তো হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।' (বনী ইসরাঈল, ৫৩)

অর্থাৎ তারা যেন সাধারণভাবে সবখানেই উত্তম কথা বলে। এমন সুন্দর কথা যেন বলে যা মানুষের কাছে শুনতে ভালো লাগে, মনের ওপর দাগ কেটে যায় এবং হৃদয়ের ওপর মধুর পরশ বুলিয়ে দেয়। এমন কথাকেই শয়তান ভয় পায় এবং সে শক্ত কথা ও কষ্টদায়ক ব্যবহার করতে মানুষকে প্ররোচনা দেয়, যেন মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়, ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর শত্রুতা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক দরদ সহানুভূতির মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে শত্রুতাপূর্ণ

মনোভাব গড়ে ওঠে। অবশ্যই একথা সত্য যে, মিষ্টি–মধুর কথা হৃদয়ের মলিনতা, দূর করে দেয়, অন্তরের ব্যাধি নিরাময় করে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করে, পরস্পরকে ভালবাসতে শেখায় এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগায়। এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

'আর শয়তান তো হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।' (বনী ইসরাঈল, ৫৩)

এ মরদূদ শয়তান মানুষের মুখে মন্দ কথা যুগিয়ে দেয় এবং জিহ্বাকে সঠিক কথা উচ্চারণ থেকে সরিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষে মানুষে, ভাইয়ে ভাইয়ে দুশমনী ও ঘৃণা বিদ্বেষ জাগে। অপরদিকে সুন্দর সুমিষ্ট কথা মানুষের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে তাদের কাছে টেনে নিয়ে আসে, ব্যবধান কমিয়ে দেয় এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মযবুত বানায়, আর ভাইয়ের অপরাধ মার্জনা করে তাদের পরস্পরের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে। শয়তানের উস্কানিতে তাদের মধ্যে যেসব দূরত্ব আসতে চায়, ভ্রাতৃত্ববোধ সেগুলো রোধ করে।

দাওয়াতের কাজে উত্তেজিত হওয়া

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ق اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

'(হে মুসলমানরা,) তোমরা আহলে কেতাবদের সাথে কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, অবশ্য ভালো কিছুর ব্যাপার হলে তা আলাদা কথা, তবে তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে (তাদের কথা আলাদা), তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি যা কিছু আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে তার (কেতাবের) ওপর, (আরো ঈমান এনেছি) যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে তার ওপরও, (আসলে) আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন এবং আমরা সবাই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।' (আল আনকাবুত, ৪৬)

উপরের আয়াতটিতে এ কথাই বলা হচ্ছে যে, নূহ (আ.) এবং তার পরবর্তীতে আগত রসূলরা সকলেই এক দাওয়াত বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। সে একই পয়গাম নিয়ে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর আগমন। অবশ্যই সে দাওয়াত এক আল্লাহর নিকট থেকে আগত অবিকল একই দাওয়াত। এ দাওয়াতের লক্ষ্য একটিই, আর তা হচ্ছে ভ্রান্ত মানুষকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া, তাঁর পথটা দেখিয়ে দেয়া এবং তাঁরই দেয়া পদ্ধতি অনুসারে তাদের গড়ে তোলা। আর সে পথের দাওয়াতের মূল কথাই হচ্ছে, সারা দুনিয়ার সকল মানুষ একই জাতি, যদি তারা এক আল্লাহর দাসত্ব

করে। অর্থাৎ যারা নিজেদের আল্লাহর বান্দা বা দাস মনে করে, তারা যেখানেই থাকুক এবং যে ভাষাতেই কথা বলুক, তারা সবাই মিলে একই জাতি। আর এটাই সর্ববাদী সত্য কথা যে, সর্বযুগে গোটা দুনিয়ার সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত থেকেছে, একভাগ মোমেন আরেক ভাগ হচ্ছে শয়তানের দল। স্থান কাল নির্বিশেষে এই একই সত্য বরাবর মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যমানায় মোমেনরা ঈমানী গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে যে যেখানে থাকুক না কেন, এ একটি মাত্র দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

এ হচ্ছে সেই মর্যাদাপূর্ণ সত্য যা প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলামের আগমন এবং এটাই তার অভিযাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ওপরে বর্ণিত আল কোরআনের আয়াতটিতে এ কথার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এ সত্যই তাকে রক্ত ও বংশ সম্পর্কের ঊর্ধ্বে টেনে তুলেছে। তাকে মর্যাদাবান বানিয়েছে, দেশ-শ্রেণী, গোত্র ও বিশেষ কোনো দেশের নাগরিক হওয়া থেকে তাকে ওপরে তুলেছে। তাকে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাজ্যের নাগরিক হওয়ার সম্মান দিয়েছে। তারা একই দলের সদস্য হওয়ার বা একই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে একই দলভুক্ত হওয়ার ক্ষুদ্র ও নীচ চিন্তার পরিবর্তে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কারণে বিশ্বনাগরিক হওয়া বেশী গৌরবজনক বলে বুঝেছে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির উপায় একটিই, আর তা হচ্ছে ঈমানী যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এ আকীদার অধিকারী হওয়ার কারণে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেখানে মানুষের বর্ণ-ভাষা ও রক্তের সম্পর্ক গৌণ হয়ে যায়, সেখানে ভাষা বা ভৌগোলিক জাতীয়তা ও দেশের সীমাবদ্ধতা ঢাকা পড়ে যায়, সেখানে স্থানকালের সীমাবদ্ধতা গৌণ হয়ে যায়, সেখানে একটিই মাত্র সম্পর্ক মানুষকে সংঘবদ্ধ করে। আর তা হচ্ছে স্রষ্টা ও বিধানদাতা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে নিজেকে আবদ্ধ করা।

এ আংগিকে চিন্তা করলে আহলে কেতাবদের সাথে উত্তম পন্থা ও যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা আলোচনা করার তাৎপর্য বুঝা যায়। 'মুজাদালা' শব্দটি দ্বারা বুঝায় উত্তেজিত অবস্থায় প্রতিপক্ষকে কোনো কিছু মানতে বাধ্য করতে চেষ্টা করা। সেখানে যুক্তি থেকে কড়া ভাষা এবং উত্তেজিত কণ্ঠস্বর দ্বারা প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করাটা প্রাধান্য পায়, কিন্তু ইসলামী দাওয়াত হবে যুক্তি প্রধান এবং সে যুক্তি পেশ করার মধ্যে শালীনতা ও মাধুর্য অনুভূত হতে হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে–

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'ডাকো আল্লাহর পথে হেকমত (জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি) এবং সুন্দর সুমিষ্ট কথামালা দ্বারা।' (আন নাহল, ১২৫)

এমনভাবে ডাকো যেন আল্লাহর বাণীর যৌক্তিকতা সুন্দরভাবে তাদের সামনে ফুটে ওঠে এবং শ্রোতার কাছে কথাগুলো আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এটাও যেন বুঝে আসে যে, এ পয়গাম এবং পূর্বে অবতীর্ণ পয়গামসমূহের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক

বিদ্যমান রয়েছে। আহলে কেতাবরা যেন হৃদয় দিয়ে এটা অনুভব করে যে, আল্লাহর আহ্বান পূর্বে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সে একই দাওয়াত আরও সুন্দরভাবে আরবী ভাষায় পেশ করা হচ্ছে। তাদের হৃদয় যেন বলে ওঠে, আহা, এ কথাগুলো কতো মনোমুগ্ধকর! যতোই শুনছি শুনতে যেন আরও ভালো লাগছে, আহ, কী চমৎকার ভাষা, কতো মধুর এ বাচনভংগি, এ তো সেই কথা যা আমাদের নবীর কথার মধ্যে ঝংকৃত হয়েছে, আহা, সে কথাটাই তো আরও কত সুন্দরভাবে বলা হচ্ছে। হাঁ, এভাবে দাওয়াত প্রসারিত হলেই তো আশা করা যায় আজকের বিরাজমান সমস্যা দূর হবে, হয় তো আবার হারিয়ে যাওয়া শান্তি ফিরে আসবে এবং মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণ হবে। 'তবে ওদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে' অর্থাৎ যারা সেই তাওহীদ থেকে সরে গেছে যা স্থায়ী নীতি ও বিশ্বাস হিসেবে সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে চিরদিন স্বীকৃত। যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক জ্ঞান করেছে এবং দুনিয়ার জীবনের জন্যে প্রদত্ত তাঁর বিধান পরিত্যাগ করেছে, তারাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের সাথে যুক্তিতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই, বা নেই কোনো সদ্ব্যবহারের আদান প্রদান। ওদের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যখন মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন এই ঘোষণা এসেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আহলে কেতাবদের সাথে সুন্দরভাবে কি আলোচনা করা যায়, বা তাদের সাথে, যুক্তিতর্ক বিনিময় করা যায়? হাঁ, এর জওয়াব হচ্ছে, কথাটা শুধু তাদের জন্যেই সীমাবদ্ধ যারা যুলুম করেনি এবং আল্লাহর দ্বীন (জীবন বিধান) থেকে সরে যায়নি, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি সেই তাওহীদ (একত্ববাদ) থেকে যা নিয়ে সর্বকালে সব নবীদের কাছে সমস্ত আসমানী পয়গাম এসেছে। ওদের সম্বোধন করে এরশাদ করা হয়েছে–

وَقُولُوٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

'তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি যা কিছু আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (কেতাবের) ওপর, (আরো ঈমান এনেছি) যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে তার ওপরও, (আসলে) আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন এবং আমরা সবাই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।' (আল আনকাবুত, ৪৬)

সুতরাং মতবিরোধ করা বা ঝগড়া ফাসাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই, দরকার নেই কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ করার। যেহেতু সবাই এক ও সর্বশক্তিমান মনিব-মালিকের ওপর ঈমান রাখে, আর মুসলমানরা তো ঈমান এনেছে সেই কেতাবের ওপর যা তাদের কাছে এবং তাদের পূর্বে অন্যান্য নবী রসূলদের ওপর নাযিল হয়েছে। সে সকল কেতাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটিই। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন বিধান, যা সকল কেতাবের মাধ্যমে এসেছে, তা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

দাওয়াতের উত্তম কৌশল

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ - وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

'(হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করো, যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা, তোমার মালিক ভালো করেই (এটা) জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি (হেদায়াতের) পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন। যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক ততোটুকু শাস্তিই দেবে যতোটুকু (অন্যায়) তোমাদের সাথে করা হয়েছে; অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে (জেনে রেখো,) ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম। (হে নবী,) তুমি (নির্যাতন নিপীড়নে) ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য (সম্ভব হবে) শুধু আল্লাহ তায়ালার সাহায্য দিয়েই, এদের (আচরণের) ওপর দুঃখ করো না, এরা যে সব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন যারা (জীবনের সর্বত্র) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে, (সর্বোপরি) তারা হবে সৎকর্মশীল। (আন নাহল, ১২৫-১২৮)

উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স.)-কে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলা হচ্ছে, তিনি যেন তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি, আল্লাহর দেখানো সঠিক পথের প্রতি হেকমত, বিচক্ষণতা এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করেন। প্রয়োজন হলে সেই মতবাদের পক্ষে সঠিক সুন্দর পদ্ধতিতে তর্ক বিতর্কেও লিপ্ত হন। যদি বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর ওপর এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে ওদের প্রতিহত করবেন, তাঁদের সমুচিত জবাব দেবেন। তবে শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ওদের ক্ষমা করে দিলে সেটা হবে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে মনে মনে আক্ষেপ করার কিছুই নেই। ওরা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না বলে দুঃখ করার কিছুই নেই। মোমেনদের বিরুদ্ধে ওদের ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের কারণে বিচলিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, উত্তম পরিণতি কেবল মোমেন-মোত্তাকী তথা সত্যের অনুসারী ও ধারক-বাহকদের জন্যেই নির্ধারিত।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের নীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এ দাওয়াতের উপায় উপকরণ কি হবে, কোন নীতি ও

পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রসূলুল্লাহ (স.) এবং পরবর্তীতে তাঁর উম্মতের মোবাল্লেগরা দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করবেন তার রূপরেখাও উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই আমাদের সকলেরই উচিত, দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করার পূর্বে আমরা যেন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এ মূলনীতিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা; স্বয়ং মোবাল্লেগের প্রতি বা তার জাতির প্রতি আহ্বান করা নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, একজন মোবাল্লেগ তার দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যই পালন করছেন। এটা কেবলই একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য। কাজেই এ দায়িত্ব পালন করা দ্বারা কোনো মোবাল্লেগ কারও প্রতি কোনো দয়া বা করুণা করছে না, খোদ দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিও নয় এবং যারা তার মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্ত হচ্ছে তাদের প্রতিও নয়। তবে এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে সে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে।

আলোচ্য আয়াতে বিচক্ষণতার সাথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যাদের সামনে দাওয়াত পেশ করা হবে তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কতোটুকু বক্তব্য তাদের সামনে উপস্থাপন করলে তারা বিরক্ত হবে না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানসিক প্রস্তুতির পূর্বেই তাদের যেন কোনো ধর্মীয় বিধান পালনে বাধ্য করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন্ পদ্ধতিতে বক্তব্য পেশ করলে অধিক ফলপ্রসূ হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সর্বোপরি শ্রোতাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যের ধরন-ধারণে বৈচিত্র আনতে হবে। সাথে সাথে এও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বক্তব্যের মাধ্যমে অহেতুক উত্তেজনা, অনাকাংখিত চাঞ্চল্য এবং ধর্মীয় উগ্রতা সৃষ্টি না হয়। অন্যথায় দাওয়াত ও তাবলীগের আসল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে, যা হেকমত ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী।

আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আঞ্জাম দিতে বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, নরম ও সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে যেন তা মানুষের মনের গভীরে রেখাপাত করে এবং তাদের অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অহেতুক শোর চিৎকার করে বক্তব্য প্রদান করা উচিত নয়। তদ্রূপ কারও কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে প্রকাশ্য মজলিসে আলোচনা করাও উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, নরম ও মার্জিত ভাষায় উপদেশ প্রদান করলে তা অনেক সময় কঠিন হৃদয়কেও নাড়া দেয়, ধর্মবিমুখ লোকদের মনেও সাড়া জাগায় এবং এসব লোকদের সত্যের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। নরম ও সুন্দর উপদেশ যতোটুকু মঙ্গল বয়ে আনে– ধমক, উত্তেজনাকর বক্তব্য এবং ভর্ৎসনা-গঞ্জনা দ্বারা তা কখনোই সম্ভব হয় না।

প্রয়োজন হলে সুন্দর ও সঠিক পদ্ধতিতে তর্ক-বিতর্ক করা যেতে পারে। তবে তর্ক করতে গিয়ে কখনও বিপক্ষের লোকদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে তদের হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, এ তর্ক-বিতর্কের উদ্দেশ্য কেবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাই নয়, বরং তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে সত্য বাস্তবতাকে গ্রহণ

করতে উদ্বুদ্ধ করা। কারণ প্রত্যেকের মনেই কিছুটা অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা থাকে। ফলে মানুষ সহজেই অন্যের মতামত বিনা বাক্যে মেনে নিতে চায় না। তবে ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে বুঝালে মানুষ বুঝতে চেষ্টা করে এবং অন্যের মতামত গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হয়। কারণ এক্ষেত্রে পরাজয়ের কোনো মনোভাব তার মাঝে সৃষ্টি হয় না। মানুষের সামনে যখন কোনো ভিন্ন মত ও বক্তব্য পেশ করা হয় তখন সে চিন্তা করে দেখে, এটা গ্রহণ করলে কেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে? যখন সে বুঝতে পারে, নিজ মতামত ত্যাগ করে ভিন্ন কোনো মত ও রায় মেনে নেয়া এক ধরনের পরাজয়, তখন সে ওই মত গ্রহণ করা নিজের ব্যক্তিত্ব ও মান-সম্মানের জন্যে ক্ষতিকর মনে করে। তবে মার্জিত ভাষায়, ভদ্র ও নম্র ভাষায় তর্কের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে প্রতিপক্ষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়। সে তখন বুঝতে পারে, তর্কের উদ্দেশ্য তার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদাকে খাটো করা নয়; বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সত্য বিষয়কে প্রমাণিত করা এবং সেটা গ্রহণ করা। সে তখন আরও বুঝতে পারে, এই তর্কের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দ্বীন। ওই তার্কিক মোবাল্লেগের ব্যক্তিগত মতামতকে প্রাধান্য দেয়া নয় এবং তার ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ও নয়।

মোবাল্লেগ বা দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেন অহেতুক উত্তেজনা ও অতি উৎসাহের বশবর্তী না হয়ে পড়ে, সে জন্যে আল্লাহ পাক স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, কে পথহারা এবং কে সত্য পথের অনুসারী তা একমাত্র তিনিই ভালোভাবে অবগত আছেন। কাজেই প্রতিপক্ষের সাথে তর্ক করতে গিয়ে অহেতুক ঝগড়াঝাটি বা বাদানুবাদের প্রয়োজন নেই, বরং সত্যকে সঠিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা ও প্রমাণিত করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। মৌখিক দাওয়াত এবং যুক্তির মাধ্যমে তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি। তবে দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ওপর আক্রমন হলে তখন নীতি পাল্টে যাবে এবং পন্থা ও পদ্ধতিও পাল্টে যাবে। কারণ আক্রমন হচ্ছে একটি ব্যবহারিক কর্মকান্ড। তাই সত্যের মর্যাদা রক্ষার খাতিরেই এবং বাতিলের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তখন অনুরূপ পন্থা পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে। তবে বাতিলের মোকাবেলা করতে গিয়ে যাতে সীমালংঘন না হয়ে যায়, বাড়াবাড়ির পর্যায় গিয়ে না পৌঁছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, ইসলাম হচ্ছে একটি ন্যায়ভিত্তিক ধর্ম, ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম, শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। কাজেই এ ধর্মে যুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করার অনুমতি আছে। তবে যুলুম-অত্যাচার করার অনুমতি নেই। এ জন্যেই বলা হয়েছে—

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

'যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক ততোটুকু শাস্তিই দেবে যতোটুকু (অন্যায়) তোমাদের সাথে করা হয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে (জেনে রেখো,) ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম।' (আন নাহল, ১২৬)

এমনটি করা দাওয়াত ও তাবলীগের আদর্শ মূলনীতির পরিপন্থী নয়; বরং এর একটা অংশ। ন্যায় ও সাম্যের চৌহদ্দির ভেতরে থেকে দাওয়াতী কাজকে রক্ষা করা হলে এর মান-মর্যাদা রক্ষা পাবে। মানুষের মনে এর স্থান তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে না। মনে রাখতে হবে, মানুষ কখনও তুচ্ছ মর্যাদাহীন কোনো আদর্শের আহ্বানে সাড়া দেয় না। তারা এটাকে আল্লাহর দাওয়াত বলেও বিশ্বাস করে না। কারণ, আল্লাহর দাওয়াত কোনো হেলা-খেলার বস্তু নয় যে, তা পদদলিত হতে থাকবে আর তাকে রক্ষা করার মতো কেউ থাকবে না। তদ্রূপ যারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা বিনা বাক্যে অন্যায় অবিচার মেনে নেবে, এমনটিও নয়। কারণ, তারা আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েই তারা এ পৃথিবীর বুকে সত্যের প্রতিষ্ঠায়, মানবসমাজে ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠায় এবং মানবতাকে সত্যের পথে পরিচালনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। যদি তারা কেবলই অত্যাচারিত হতে থাকে, নির্যাতিত হতে থাকে এবং এর প্রতিকারের ক্ষমতা তাদের না থাকে, তাহলে এসব গুরুদায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে?

যদিও ইসলামে সমতার ভিত্তিতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার নীতি স্বীকৃত রয়েছে, তবুও পবিত্র কোরআন ধৈর্য ও ক্ষমার আদর্শেই মনুষকে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে অন্যায় অবিচার প্রতিহত করার মতো শক্তি ক্ষমতা মুসলমানদের থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষমা এবং ধৈর্যের নীতিই গ্রহণ করার জন্যে তাদের উদ্বুদ্ধ করে, যদি এর দ্বারা ভালো ফল লাভ হয় এবং দাওয়াতী কাজে এর প্রভাব ইতিবাচক হয়। যদি দাওয়াত ও আদর্শের স্বার্থে এ ক্ষমা আর সহিষ্ণুতাই ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ আদৌ কোনো বিবেচ্য বিষয় বলে গণ্য হবে না। আর যদি ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শনের ফলে আদর্শের মর্যাদাহানি ঘটে, আদর্শকে মানুষের চোখে হাল্কা করে ফেলে, তাহলে প্রতিশোধের নীতি গ্রহণ করাই উত্তম।

ধৈর্যের জন্যে প্রয়োজন উত্তেজনা প্রতিহত করা, আবেগ-অনুভূতি স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে দমন করা। কাজেই পবিত্র কোরআন এই কঠিন কাজটিকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করে এর শুভ পরিণতির বার্তা শুনাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

'(হে নবী,) তুমি (নির্যাতন নিপীড়নে) ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য (সম্ভব হবে) শুধু আল্লাহ তায়ালার সাহায্য দিয়েই, এদের (আচরণের) ওপর দুঃখ করো না, এরা যে সব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। (আন নাহল, ১২৭)

অর্থাৎ আল্লাহর মেহেরবানী ও নেক দৃষ্টির বদৌলতেই মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ এবং আত্মসংযম প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। কারণ তিনিই মানুষের মন থেকে প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার মতো স্বভাবজাত প্রবৃত্তি মিটিয়ে দেন এবং ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

এখানে পবিত্র কোরআন রসূলুল্লাহ (স.)-কে একটি উপদেশ দিচ্ছে। উপদেশটি কেবল তাঁর জন্যেই নয়, বরং তাঁর উম্মতের সকল মোবাল্লেগদের জন্যেই প্রযোজ্য। আর সেটা হলো, মানুষ যদি তাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় এবং তারা যদি সত্য পথের অনুসারী না হয়, তাহলে এ কারণে যেন তারা মনোক্ষুণ্ন না হয়। কারণ তাদের দায়িত্ব কেবল মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা। হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। কারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে আর কারা হবে না– এসব বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানমতেই হয়ে থাকে। এখানে মানুষের কোনো হাত নেই। কাজেই এর কারণে মন খারাপ করার, কিছুই নেই। একজন মোবাল্লেগ আল্লাহর পথের দিশারী, কাজেই আল্লাহই তাকে সব ধরনের অনিষ্ট ও অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করবেন। সে যদি প্রকৃত মোবাল্লেগ হয়, নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ মোবাল্লেগ হয় তাহলে ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো ষড়যন্ত্রই তার এতোটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বদা তার সহায়ক ও রক্ষক থাকবেন।

হয়তো কখনও তাকে পরীক্ষা করার জন্যে বিপদের সম্মুখীন করা হবে। আল্লাহর প্রতি তার কতোটুকু আস্থা আছে তা পরখ করার জন্যে আল্লাহর কাংখিত সাহায্য বিলম্বিতও হতে পারে, কিন্তু শেষ পরিণতি কি হবে– এবং কার স্বার্থে যাবে, এটা চূড়ান্ত ও নির্ধারিত। তাই বলা হচ্ছে–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন, যারা (জীবনের সর্বত্র) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে (সর্বোপরি) তারা হবে সৎকর্মশীল।' (আন নাহল, ১২৭)

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আছেন, তাই কিসের ভয়? নিন্দুকেরা, ষড়যন্ত্রকারীরা তার কিইবা ক্ষতি করতে পারবে।

এটাই হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি। আর আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক দাওয়াতী কাজের সাফল্য এ মূলনীতি অনুসরণের মাঝেই নিহিত। আল্লাহর ওয়াদা সত্য হবে না তো আর কার ওয়াদা সত্য হবে?

ইসলামে প্রতিশোধ গ্রহণের মূলনীতি

ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা বিপত্তি, যুলুম নির্যাতন একটি অনিবার্য বিষয়। এটা যুগযুগান্তরের এক ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং আন্দোলনবিরোধীদের অত্যাচারের স্বীকার হলে কখন কতোটুকু প্রতিশোধ নেয়া যাবে– সে সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশনা আন্দোলনকর্মীদের প্রত্যেকের জন্যে জেনে নেয়া আবশ্যক। এ প্রসংগে এরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ - وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ - وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ
ظُلْمِهٖ فَأُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ط إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ

النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

তারা (এমনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন,) যখন তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন (-এর চেষ্টা) করে, আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে) যথাযথ পুরস্কার রয়েছে; আল্লাহ তায়ালা কখনও যালেমদের পছন্দ করেন না। কোনো ব্যক্তি যদি তার (ওপর) যুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাতে তাদের ওপর কোনো অভিযোগ থাকে না। অভিযোগ তো হচ্ছে তাদের ওপর, যারা মানুষদের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়; এমন (ধরনের যালেম) লোকদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে), অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম।' (আশ শূরা, ৩৯-৪৩)

আল কোরআনের মক্কী সূরাগুলোতে মুসলমানদের জন্যে এ প্রতিশোধ গ্রহণকেও এক বিশেষ গুণ এবং তাদের এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুলুম করা হলে প্রতিশোধ নেয়ার এ গুণটিকে মুসলিম জামায়াতের মধ্যে সদা-সর্বদাই এক মৌলিক ও মহৎ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা কোনো যুলুম মুখ বুঁজে সহ্য করবে না, যুলুমের কাছে মাথানত করবে না, তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে অবশ্যই তারা এর প্রতিশোধ নেবে। এর জন্যে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করবে। এটা সেই জামায়াতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে গোটা মানবমন্ডলীকে পরিচালনার জন্যে। এই যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে যেন তারা সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত হতে পারে, যেন তারা সকল ভাল কাজের নির্দেশ দিতে পারে এবং নিষেধ করতে পারে সব মন্দ কাজ থেকে। এভাবে তারা যেন গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। আর তাদের এ ভূমিকাই আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ -

'(দুনিয়া ও আখেরাতে) সকল মান-ইযযত গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা।' (আল মোনাফেকুন, ৮)

সুতরাং এ মুসলিম জামায়াতের প্রকৃতি এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, যখনই তাদের ওপর আক্রমণ করা হবে অথবা তাদের ওপর কেউ বাড়াবাড়ি করবে, তখন তারা তার উচিত জবাব দেবে, যে কোনো বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপকে দমন করবে। তবে হাঁ, যতোদিন জবাব দেয়ার মতো পরিস্থিতি বা শক্তি সামর্থ না হবে ততোদিন তারা সবর করতে থাকবে। যেমন মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদের সবর করতে বলা হয়েছে, খাস

করে আরবের প্রথম যুগের মুসলমানদের এ সবরের মাধ্যমে তাদের ঈমানের প্রমাণ পেশ করতে হয়েছে এবং ট্রেনিং নিতে হয়েছে আল্লাহর পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার। তখন তাদের সহ্য করার, যুলুম নির্যাতনের মুখেও হাত গুটিয়ে রাখার, নামায কায়েম করার ও যাকাত আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যুলুম হলেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সবর করার এ নির্দেশ ছিলো নিতান্ত সাময়িক। ইসলামী জামায়াতের জন্যে এটা কোনো স্থায়ী নিয়ম নয়।

মুসলমানদের মক্কী যিন্দেগীতে বিনম্র মেযাজের স্বভাব নিয়ে থাকা, প্রতিপক্ষকে তাদের মধুর স্বভাব প্রদর্শন ও আল্লাহর মহব্বতে সহনশীল থাকার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝার সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এসবের মধ্য থেকে একটি বিষয় আমাদের বুঝতে হবে যে, মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদের ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক কিংবা গোত্রীয় পর্যায়ে নির্যাতন করা হয়েছে। মক্কী কর্তৃপক্ষের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত কিংবা প্রশাসনিক কোনো সিদ্ধান্তক্রমে তাদের ওপর হামলা করা হয়নি। আসলে তৎকালীন আরব উপদ্বীপে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার বা শাসনব্যবস্থা ছিলো না। আরব গোত্রগুলো এখানে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতো এবং প্রত্যেক গোত্রেরই ছিলো নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন, যা তারা মেনে চলতো। গোত্রীয় নেতা বা দলপতিরাই প্রকৃতপক্ষে ছিলো তাদের পরিচালক। এ জন্যেই দেখা যেতো, নিজের আপনজন কিংবা গোত্রীয় লোকেরাই মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দিতো। সাধারণভাবে এক গোত্রের কোনো লোককে অন্য গোত্রের কেউ হামলা করতে সাহস করতো না, কারণ তাতে গোত্রীয় যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকতো। মতাদর্শ যার যাই থাকুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ গোত্রের কাছ থেকে সর্বাবস্থায় সহায়তা পেতো। বিচ্ছিন্ন এক আধটা ঘটনা ছাড়া এমন কখনো হয়নি যে, নিজ গোত্রের বাইরে কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে অথবা ব্যক্তিদের এককভাবে বা দলীয়ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। অনেক সময় দেখা গেছে, গোত্রপতি অথবা ব্যক্তিগতভাবে গোলামের মালিকরা তাদের গোলামদের অত্যাচার করেছে, কিন্তু মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে যখন কোনো মযলুম ব্যক্তিকে খরিদ করে আযাদ করে দিয়েছে তখন তার ওপর আর কেউ আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। আর রসূল (স.)-ও চাননি, ঘরে ঘরে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে যাক; বরং তিনি চেয়েছেন, কোনো কঠিন ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিবর্তে তারা আপাতত যথাসম্ভব মিলে মিশে থাক।

এর মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সে সময়ে আরব দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এমনই ছিলো যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাধান্য ও গৌরব প্রদর্শন করা পছন্দ করতো। হকপন্থী কোনো দুর্বল বা অসহায় ব্যক্তিকে পেলে তার ওপর নির্যাতন চালানোর দ্বারা আমোদ উপভোগ করতো। এ কারণে কোনো অসহায় বা দুর্বল মুসলমানকে পেলে তাকে তারা অত্যাচারের টার্গেট বানাতো। বিশেষ করে যদি সে নিজ আদর্শের ওপর টিকে থাকার জন্যে দৃঢ়তা দেখাতো। এভাবেই চলছিলো

অসহায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের ষ্টীম্‌ রোলার। আর সে সময়ে অবরোধের যে ঘটনা ঘটেছিলো, তাতে অন্যান্য গোত্রের লোকদের সাথে বনী হাশেম গোত্রের মুসলমানরাও সেই অবরোধের মধ্যে ঘেরাও হয়ে একই ভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছে এবং মক্কার বাইরে 'শে'বে আবু তালেবে' গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আরব তথা মক্কার সেই গোত্রীয় আধিপত্যবোধ বা তাদের প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাবই তাদের এমন নিষ্ঠুর অবরোধের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলো। এ সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার কারণে তারা এতো বেশী হৃদয়হীন হতে পেরেছিলো, কিন্তু অবশেষে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠলো এবং সেই নিষ্ঠুর অবরোধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয়ে গেলো, তারা সেই চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলে দিলো, যার ভিত্তিতে তারা মুসলমানদের বয়কট করেছিলো এবং এভাবে একটানা দীর্ঘ তিন বছরের সেই নিষ্ঠুর ও যুলুমপূর্ণ চুক্তি ভেংগে গেলো।

সেই জাহেলী যুগের অবস্থাটা ছিলো, সারা আরব জুড়ে সদা-সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তরবারির ঝনঝনানি লেগেই থাকতো। তারা সবাই তাদের পেশীশক্তির গৌরব করতো, এ জন্যে তারা কোনো নিয়ম শৃংখলার কাছে মাথানত করতো না। এ অবস্থায় একমাত্র আল্লাহভীরু কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্বের পক্ষেই এই একগুঁয়েমি স্বভাব দমন করা সম্ভব ছিলো। সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যারা আল্লাহর পথ গ্রহণ করেছিলো, তারাই তাদের প্রাচুর্যকে কোনো এক লক্ষ্য অর্জনের পথে ব্যয় করতে পারতো, পারতো সকল প্রতিকূল অবস্থাতে সবর করতে, অপরকেও সবর করতে উদ্বুদ্ধ করতে এবং পারতো তাদের পেশীশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিরাই যে কোনো আক্রমণের মুখে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের আদর্শ সমুন্নত রাখতে পারতো। এ জন্যেই যে কোনো কষ্টদায়ক ব্যবহারের সময় মুসলমানদের সবর করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে, যা ইসলামী চরিত্রের অপরিহার্য একটি গুণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। ইসলাম বরাবর প্রত্যেক মুসলমানকে শিক্ষা দিয়েছে যেন সে সর্বদা তার আদর্শ সমুন্নত রাখার জন্যে মেযাজে ভারসাম্য আনে এবং সর্বাবস্থায় সবর এখতিয়ার করে। এভাবেই যেন সে চরম বিরোধিতাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে কদম না থামিয়ে দৃঢ়ভাবে নিজ লক্ষ্যপথে এগিয়ে যায়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের মক্কী জীবনে চলতে হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, যেন তারা কারো সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে যথাসম্ভব অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি থেকে দূরে থাকে এবং কোনো আক্রমণের জবাব না দিয়ে সবর এখতিয়ার করে, কিন্তু এও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এটা তাদের সাময়িক ভূমিকা, এটা অবশ্যই তাদের কোনো স্থায়ী নীতি হবে না। অবশেষে তাদের যে নীতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তা হচ্ছে, অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হলে তাদেরও রুখে দাঁড়াতে হবে এবং আগ্রাসীদের এমন সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে, যেন পুনরায় আক্রমণের সাধ মিটে যায়। তাই এরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ

'তাদের যখন অন্যায় আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় তখন তারা সমুচিত জওয়াব দেয়।'

এ নীতি জীবনের সব ব্যাপারের জন্যেই প্রযোজ্য। যেমন বলা হয়েছে, 'কোনো অন্যায় আচরণের প্রতিদানে অনুরূপ আচরণই বাঞ্ছনীয়।' (আশ শূরা, ৩৯)

প্রতিশোধ গ্রহণের এটাই মূল কথা, অর্থাৎ কঠিন আচরণের পরিবর্তে অনুরূপ কঠিন আচরণই হতে হবে, যেন অন্যায় কাজের প্রসার না ঘটে এবং অন্যায়কারী বে-পরওয়া না হয়ে যায়। তার অন্যায় কাজের সমুচিত শাস্তি তাকে পেতেই হবে, যেন সে অহংকারী হয়ে আরও বেশী অন্যায় কাজ করতে না পারে। অন্যায়কারীকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় এবং কেউ যদি তাকে প্রতিহত না করে, তাহলে তার অন্যায় কাজ ও নিষ্ঠুর আচরণ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তার দ্বারা অগণিত অকল্যাণ সাধিত হতে থাকবে এবং কোনো বাধা না পাওয়ায় নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলতে থাকবে তার অনিষ্টকারিতা।

কিন্তু রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা মহানুভবতার ব্যবস্থায় এ সুযোগ রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় ক্রোধ সংবরণ করে এবং সংশোধনের পথ উন্মুক্ত করার ইচ্ছায় ক্ষমা প্রদর্শন করে, তাহলে অবশ্যই তা ভালো। এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তবে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে, ক্ষমার প্রশ্ন তখন আসবে যখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শুধু উদারতা ও মহানুভবতার কারণেই প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করা হচ্ছে। এমন অবস্থায়ই কেবল ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধনী আনা সম্ভব হবে এবং সংশোধনী প্রচেষ্টায় সেই ক্ষমার গুরুত্ব ও মূল্য অনুভূত হবে। অহংকারী ও সীমালংঘনকারী যখন বুঝবে, শুধু উদার মনে মহানুভবতা প্রদর্শন করতে গিয়েই তাকে ক্ষমা করা হয়েছে, কোনো দুর্বলতা বা অক্ষমতার কারণে নয়, একমাত্র তখনই সে লজ্জিত হবে এবং অনুভব করবে, তার যে বিপক্ষীয় ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করেছে সে অবশ্যই শক্তিশালী।

সত্য কথা হচ্ছে, যে শক্তিশালী ব্যক্তি মাফ করতে পারে, অবশ্যই সে তার নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও মর্যাদাবান বানায়। সুতরাং এ পর্যায়ে ক্ষমাশীলতা তার জন্যে কল্যাণ ও মর্যাদা বয়ে আনে এবং তার প্রতিপক্ষকে সংশোধিত হতে সাহায্য করে। একইভাবে এ কথাও সত্য, দুর্বলতার সময়ে বা প্রতিশোধ নেয়ার প্রশ্নে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অক্ষম হলে ক্ষমার কোনো কথা উচ্চারণ করা যাবে না। তা হবে দুর্বলতা দেখানোর শামিল এবং **তার ফলে** আক্রমণকারীর দর্প এবং অনিষ্টকারিতা আরও বহুগুণে বেড়ে যাবে। সে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের ওপর ভরসা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে যে কোনো ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং অবশ্যই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সাহায্য পাওয়া যাবে, যেহেতু তাঁর মযলুম কোনো

বান্দার দুর্বলতার সুযোগে কোনো যালেমের যুলুম বেড়ে যাক, এটা কিছুতেই তিনি চান না। তাই এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِيْنَ

'নিশ্চয়ই তিনি যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।' (আশ শূরা, ৪০)

এটা হচ্ছে সেই প্রথম মূলনীতির ওপর আরও গুরুত্ব আরোপকারী কথা, যেখানে বলা হয়েছে, অন্যায় আচরণের অনুরূপ আচরণ দিয়ে প্রতিশোধ নেয়া প্রয়োজন। এটা হচ্ছে একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে, অন্যায় প্রতিরোধ করতে গিয়ে সাথে সাথে প্রতিশোধ না নিয়ে একটু অপেক্ষা করা অথবা ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা অতিক্রম না করা। এটা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এরশাদ হচ্ছে–

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ - إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

'অত্যাচারিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেবে, তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের ওপর যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে বেড়ায়, তারাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের জন্যে বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।' (আশ শূরা, ৪১-৪২)

সুতরাং নির্যাতিত অবস্থায় যে প্রতিশোধ নেবে, অন্যায় ব্যবহারের প্রতিদানে অনুরূপ ব্যবহার করবে এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমালংঘন করবে না, অর্থাৎ যতোটুকু পাওনা ঠিক ততোটুকু করবে, তাকে কোনো দোষ দেয়া যাবে না। সে তো শরীয়ত নির্ধারিত হক ব্যবস্থার ওপরই রয়েছে, এজন্যে তার ওপর অভিযোগ আনার কোনো অধিকার কারো নেই এবং তার প্রতিশোধ নেয়ার পথ আটকানোর অধিকারও কারো নেই। যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং অন্যায়ভাবে দুনিয়াতে হামবড়াভাব দেখাতে চায়, তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করা ওয়াজেব। যখন এভাবে যালেম নির্বিঘ্নে তার যুলুম চালিয়ে যেতে থাকবে, তখন যুলুম থেকে তাকে বিরত করার জন্যে কেউ কোনো বাধা না দিলে তো পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তন আসতে পারবে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে অসংখ্য অন্যায়কারী ও যুলুমবাজ লোকদের দ্বারা আল্লাহর যমীন ভরে যাবে, তাদের মোকাবেলা করার মতো বা তাদের দমন করার মতো কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ তায়ালা এ সব অহংকারী যালেমদের জন্যে বেদনাদায়ক আযাব ঠিক করে রেখেছেন কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদের অন্যায় কাজ থেকে থামিয়ে দেয়া এবং তাদের অন্যায় করার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া।

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভারসাম্যপূর্ণ এক মধ্যম পথ অবলম্বন করার দিকে, আত্মসংযম, সবর এবং ব্যক্তিগত অবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাপারে মহানুভবতা প্রদর্শন করার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যারা ওপরে বর্ণিত মতে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখে, তবু ক্ষমা করে দেয়। কেননা সবর ও মহানুভবতা প্রদর্শনে মর্যাদা বাড়ে, যিল্লত বা হীনতা আনে না, যার দ্বারা সৌন্দর্য ও সম্প্রীতি আসার সম্ভাবনা থাকে, অপমান বা অমর্যাদা নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে–

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

'যে ব্যক্তি সবর করবে ও মাফ করবে (সে যেন মনে রাখে যে), অবশ্যই এটা বড়ো দৃঢ় সংকল্পের পরিচয়।' (আশ শূরা, ৪৩)

আলোচ্য প্রসংগে উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে সামগ্রিকভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যম পথ অবলম্বন ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার করার শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে এবং আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছেন যে, মানুষের মনমগয পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক, মুক্ত হোক তারা হিংসা বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে। আরও মুক্ত হোক তারা চারিত্রিক দুর্বলতা ও সর্ব প্রকার হীনতা থেকে। তারা যুলুম ও অন্যায় কাজ এবং ব্যবহার পরিহার করুক। তার পরিবর্তে তাদের মধ্যে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক এবং সর্বাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশা স্থাপিত হোক। সবর ও অবিচলিত থাকার মহাগুণ হচ্ছে এ কঠিন পথপরিক্রমায় তাদের মুল পাথেয়!

মোমেনদের মধ্যে সাধারণভাবে যখন এসব মহৎ গুণাবলী গড়ে উঠবে, তখন এমন ইসলামী জামায়াত সংগঠিত হতে পারবে, যারা গোটা মানবমন্ডলীকে পরিচালনা করার যোগ্য হবে, আর তখনই তারা হবে সর্বোত্তম জাতি, যারা সর্বাধিক স্থায়িত্বের দাবীদার হবে। বলিষ্ঠ ঈমান ও তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করার কারণে তারা সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে।

দ্বীনের দায়ীদের দায়িত্ব ও তাদের সীমাবদ্ধতা

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۧ

'(হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার আগে (অনেক) নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমাকে শুনিয়েছি (আবার এমনও আছে), তাদের কথা তোমার কাছে আমি আদৌ বর্ণনাই করিনি; (আসলে) আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসূলের পক্ষে সম্ভব নয়, আর যখন আল্লাহ তায়ালার

ফয়সালা এসে যাবে তখন তো সব কিছুর মীমাংসা হয়েই যাবে, আর (সে ফয়সালায়) একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আল মোমেন, ৭৮)

আলোচ্য আয়াতের মাঝে অতীতের সেসব ঘটনাবলীর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষের ফয়সালার দৃষ্টান্ত পরিষ্কারভাবে সামনে এসে গেছে। ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং আনুগত্য ও বিদ্রোহাত্মক ব্যবহারের মধ্যে বিরাজমান ঝগড়ারও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে।

এ বিষয়ের জন্যে পূর্বের বহু ঘটনা প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে কাজ করছে, যেগুলোর কিছু কিছু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে আল-কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আবার এমনও অনেক ঘটনা আছে যেগুলো সম্পর্কে আল কোরআন কিছুই জানায়নি। আল কোরআন রসূলদের মুখ্য দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছে এবং তাদের জীবনের দীর্ঘ কর্মধারা সম্পর্কেও জানিয়েছে। অতীতের সেসব ঘটনাবলী থেকেই নবীদের নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কোনো পরিবর্তন নেই। সেসব শিক্ষা থেকে তাদের দায়িত্বসমূহ ভালোভাবেই জানা যায়, জানা যায় তাদের কাজের সীমারেখা সম্পর্কেও।

এ আয়াতটি এমন এক সত্যের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে যে কোনো সত্যাশ্রয়ী মানুষের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ এবং আয়াতে সত্যের ওপর নির্ভর করার কথা বলছে, যাতে করে মানুষ দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর রজ্জুকে মযবুত করে ধরতে পারে। এরশাদ হচ্ছে–

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

'আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসূলের পক্ষে সম্ভব নয়।' (আল মোমেন, ৭৮)

কোনো মানুষ এমনকি আল্লাহর কোনো রসূলের পক্ষেও আশা করা বা দাবী করা সম্ভব নয় যে, তিনি তার দাওয়াত পূর্ণাংগ কার্যকরভাবে মানুষের সামনে পেশ করবেন। এমন আশা করাও কারো জন্যে ঠিক নয় যে, দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই অহংকারী ব্যক্তিরা তার দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে, কিংবা সত্যের পক্ষে এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা তিনি দেখিয়ে দেবেন, যার ফলে অহংকারী ব্যক্তিরা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে। বরং আল্লাহ তায়ালা চান তাঁর পছন্দনীয় বান্দারা বিরোধী পরিবেশে এবং প্রতিকূলতার মধ্যে অস্থির না হয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করুক এবং সকল অবস্থার সাথেই তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিক; এর ফলে তাদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাদের এখতিয়ারে কিছুই নেই। এখানে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তারা দাওয়াতের কাজ করে যাবে। কোনো অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা, তাদের মনকে পরিতৃপ্ত করা, তাদের অবিচলিত রাখা, এটা একমাত্র আল্লাহরই হাতে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান, তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় যতোটুকু সাফল্য আসে তাতেই তারা খুশী থাকুক।

আল্লাহ তায়ালা আরও চান, মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাত (সার্বভৌমত্ব) এবং নবুওতের প্রকৃতি অনুধাবন করুক। তারা জানুক, নবীরা তাদের মতোই মানুষ এবং তাদের মধ্য থেকেই তাদের আগমন ঘটেছে। তারা আরও জেনে নিক, মানুষ হওয়ার সাথে সাথে গোটা মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে মানুষের শিক্ষক হিসেবে তাদের বেছে নেয়া হয়েছে। এজন্যেই তাদের চরিত্রকে নির্মল নিখুঁত বানানো হয়েছে এবং এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের দান করা হয়েছে যেন চিন্তা করলে তারা বুঝতে পারে, তারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু গুণের অধিকারী, যা ইচ্ছা করলেই কোনো মানুষ নিজে নিজে অর্জন করতে পারে না।

মানুষ স্বভাবতই ব্যস্ত চরিত্রের অধিকারী। এ কারণে তারা তাড়াতাড়ি নবীর কাছে কোনো অলৌকিক ক্ষমতার দাবী করে। এসব দাবীর মধ্যে আযাব নাযিল করার দাবীও রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে কোনো মোজেযা দেখান না এবং জলদি করে কোনো শাস্তিও নাযিল করেন না। কারণ তিনি মহা দয়াময়, তিনি চান মানুষ একটু চিন্তা করুক এবং তাদেরকে দেয়া বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সত্য সঠিক পথে এগিয়ে আসুক; সুতরাং মোজেযা দেখাতে বিলম্ব করা প্রকারান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত। যেহেতু আগেই এটা জানানো হয়েছে, মোজেযা প্রকাশিত হওয়ার পর যদি কেউ সাথে সাথে তা গ্রহণ না করে, তাহলে অবিলম্বেই চরম আযাব নাযিল হয়ে যাবে এবং তার থেকে বাঁচার আর কোনো উপায়ই থাকবে না। এজন্যে মোজেযা বা আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার সরাসরি নিদর্শন পেশ করতে বিলম্ব করায় বিরোধীদের যে সুযোগ দেয়া হয় তা তাদের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক বিরাট মেহেরবানী। এরশাদ হচ্ছে–

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

'আর যখন আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা এসে যাবে তখন তো সব কিছুর মীমাংসা হয়েই যাবে, আর (সে ফয়সালায়) একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (আল মোমেন, ৭৮)

অর্থাৎ যখন আযাব এসে যাবে তখন ভালো কাজ করার বা তাওবা করে সংশোধিত হয়ে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আখেরী ফয়সালা এসে যাওয়ার পর পেছনে ফিরে যাওয়ারও আর কোনো উপায় থাকবে না।

আল্লাহর পথে আহবানের মর্যাদা ও পদ্ধতি

আল্লাহর দিকে দাওয়াতের প্রকৃতি বর্ণনা করে কোরআনের অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব আয়াতের মাধ্যমে দাওয়াতের মূল কথা ও তা প্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম রসূল (স.) এবং তাঁর উম্মতের অন্যান্য দাওয়াতদানকারীদের যেভাবে শেখানো হয়েছিলো, তা ছিলো হাতে কলমে শিক্ষা। তাদের সাথে করা দুর্ব্যবহার, অহংকারপূর্ণ ব্যবহার ও তাদের যে নানাভাবে

কষ্ট দেয়া হয়েছে সে প্রেক্ষিতে অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের করণীয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে। এ সব কিছু জানিয়ে রসূলদের এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীর অহংকারী ও দুনিয়াকেন্দ্রিক মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, তাদের কর্তৃত্বে আঘাত পড়ে– এমন কথা যার তরফ থেকেই এসেছে, চিরদিন তাদের সাথে এই একই আচরণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ – وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ – وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ – وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে, যে মানুষদের আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি মুসলমানদেরই একজন। (হে নবী,) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না, তুমি ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার মধ্যে এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো, তার মধ্যে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে (তোমার) অন্তরংগ বন্ধু, আর এ (বিষয়)-টি শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে, যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী। যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও, কেননা তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।' (হা-মীম আস সাজদা, ৩৩–৩৬)

আলোচ্য আয়াতগুলোতে প্রধান যে কথাগুলো ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে, সকল যমানাতেই আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং হঠকারিতার মোকাবেলা করা যায়। মানুষের আত্মম্ভরিতা ও অহংকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সীমাবদ্ধ বয়স, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে নিজেদের বুদ্ধিতে চলতে চাওয়া এবং নিজেদের জীবনব্যবস্থা নিজেরাই রচনা করার প্রবণতা অবশ্যই একটা বড়ো গোমরাহী এবং নিজেদেরকে নিজেদের ভালো মন্দের মালিক মনে করারও কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। এ প্রবণতা দমন করে এক আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল লক্ষ্য। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা সবার সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর নযরে সবাই সমান। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দিকে আহ্বান জানানোর কাজ মোটেই সহজ নয়; বরং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সকল বিরোধিতার মোকাবেলায় টিকে থাকা এবং মানুষকে আল্লাহ রব্বুল

আলামীনের একনিষ্ঠ গোলামে পরিণত করার কাজ অবশ্যই বড়ো কঠিন এক দায়িত্ব। তাই এরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি মুসলমানদেরই একজন।' (হা-মীম আস সাজদা, ৩৩)

এ কথা থেকে বুঝা যায়, কালেমার দিকে দাওয়াত দেয়া পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কথা। এ পবিত্র কথা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাঁর রাজ্যে তাঁর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রদত্ত আহ্বানের কথাগুলো অবশ্যই তিনি শুনেন ও তার মূল্যায়ন করেন, কিন্তু এ দাওয়াত ঐকান্তিকভাবে তখনই আল্লাহর জন্যে (নিবেদিত) হয়, যখন এ দাওয়াতের সাথে ভালো কাজ যোগ হয়, যেহেতু দাওয়াতদানকারীর দায়িত্ব তো শুধু তাবলীগ করাই নয়; বরং তা নিজের জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই দাওয়াত দানকারী নিজেও যদি ভালো কাজ করে, তাহলেই তার দাওয়াত জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং হঠকারী ও বিরোধীদের অন্তরে তাদের অজান্তেই এর একটা প্রভাব পড়তে থাকে।

কোনো দাওয়াতদানকারীর জন্যে কড়া কথা বলা অথবা অপ্রিয় অশোভন কথা বলা মোটেই উচিত নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে সুন্দর ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কথা ব্যবহার করা, যেহেতু সে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী হিসেবে মর্যাদাবান মানুষ, সাধারণ মানুষ থেকে তার অবস্থান অনেক ওপরে। অন্যরা কটু কথা বলতে পারে বা দুর্ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু ইসলামের পতাকাবাহী, সত্যের প্রতি আহ্বানকারী কোনো ব্যক্তি এমন অশোভন আচরণ কোনো অবস্থায়ই করতে পারে না। তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন–

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

'ভালো আর মন্দ কখনও সমান হতে পারে না।' (হা-মীম আস সাজদা, ৩৪)

কারো মন্দ কথা বা আচরণের জওয়াবে মন্দ কথা বলা বা মন্দ ব্যবহার করা তার কাজ নয়। যেহেতু মন্দ আচরণের প্রতিক্রিয়া যা, ভালো আচরণের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তা নয়, যেমন মন্দের মূল্য আর ভালোর মূল্য এক নয়। সাধারণভাবে মন্দ ব্যবহারের বদলে মানুষ মন্দ ব্যবহারই করে থাকে– এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তির ওপর মানুষ যখন জয়ী হয় এবং সবর ও ক্ষমাশীলতার গুণাবলী দ্বারা যখন কোনো প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোমুখি হয়, তখন সেই অহংকারী ব্যক্তি থমকে যায় এবং তার মনটা ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে। মার্জিত ব্যবহারের ফলে তার মনের মধ্যে এ ব্যক্তির প্রতি আস্থার সূচনা হতে শুরু করে। তখনই তার মন গলতে শুরু করে এবং তার বিবদমান সত্তা পরিবর্তিত হয়ে অন্তরংগ বন্ধুর রূপ গ্রহণ করে, চরম শত্রু পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। অহংকার দূরীভূত হয়ে সেখানে বিনম্রতা আসে। এরশাদ হচ্ছে–

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

'ভালো (আচরণ) দিয়েই মন্দ (আচরণ) প্রতিহত করো, তার ফল দাঁড়াবে, যার সাথে তোমার চরম শত্রুতা রয়েছে সেও তোমার পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে।' (হা-মীম আস সাজদা, ৩৪)

আমাদের জীবনের বাস্তব অবস্থা সামনে রাখলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। আমরা যদি আল কোরআনের এ শিক্ষা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাই তাহলে দেখতে পাবো, আমাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে, ক্রোধের বদলে আসবে নমনীয়তা ও কোমলতা। অহংকার রূপান্তরিত হয়ে যাবে বিনীত মনোভাবে, কর্কশ ভাষা পরিবর্তিত হয়ে সেখানে প্রিয় ও মধুর বচন আসবে, কণ্ঠের উগ্রতা মোলায়েম হয়ে যাবে, রূঢ় চেহারাতে মিষ্টিমধুর হাসির রেখা ফুটে উঠবে এবং ক্রুদ্ধ ও সীমাহীন অহংকারী ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের খারাপ ব্যবহারের জবাবে যদি তারই মতো খারাপ ব্যবহার করা হয়, তারই মতো মেযাজ, ভাষা ও ভংগি ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ ব্যবহার করা হয়, তাহলে বিরাজমান বিরোধ বৃদ্ধি পেয়ে চরম শত্রুতায় রূপ নেবে, ক্রোধ, অহংকার ও বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলী বাড়বে। সেখানে লজ্জা শরম দূর হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যায় অহংকার দানা বেঁধে উঠবে।

তবে এটা ঠিক, যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ আক্রমণ করে এবং যদি এমন কোনো কারণে কেউ দুর্ব্যবহার করে বসে, যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট, সে অবস্থায় ধৈর্য ধরা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ক্ষমা করার জন্যে প্রয়োজন বড়ো প্রশস্ত হৃদয়ের, যার মধ্যে দরদ মহব্বত ও ক্ষমাশীলতার মহান গুণাবলী থাকবে, আর তখনই প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা সম্ভব হবে, কিন্তু ক্ষমার সুফল পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন এমন হৃদয়ের এমন ঔদার্য এবং এমন আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যার বর্ণনা উপরোক্ত আয়াতে এসেছে। এর ফলে অন্যায়কারীর অন্তরে অপমানের অনুভূতি আসবে, আসবে পরাজয়ের গ্লানি। সেখানে মানবীয় গুণের বিজয় হবে, প্রতিপক্ষের মধ্যে মানবতা ও মহানুভবতা জাগবে, যেমন করে একটি ল্যাম্পের আলো থেকে হাজারো ল্যাম্প জ্বালানো হলেও প্রথম ল্যাম্পের আলো এতোটুকু কম হয় না, অথচ অন্য অনেকেই এর থেকে আলো পেয়ে ধন্য হয়। এ-ই হচ্ছে ক্ষমাশীলতার মহান মর্যাদা।

বিশ্বাসগত কারণে বা ঈমান আকীদার পাথর্ক্যের কারণে দুর্ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। তা মোমেনরা অনেক সময় সহ্য করে, কিন্তু বস্তুগত কারণে বা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের সংঘাতে যদি কোনো আঘাত বা অবমাননা পেতে হয়, সেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কোনো একটা সুন্দর সমাধান না দেয়া পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করা, অবিচল থাকা এবং অন্যায়ের

প্রতিদানে ভাল কিছু দিতে পারাটা অবশ্যই বড়ো মহৎ গুণ। বিলম্বে হলেও এ গুণের সুফল একদিন আসবেই।

এটাই হচ্ছে সেই মহান মর্যাদা, যা অন্যায় প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার দ্বারা অর্জিত হয়। প্রচন্ড আক্রোশ থামিয়ে দেয়, ক্রোধ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব দমন করে। এই মহান ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করার পলিসি সবার জীবনেই ভারসাম্য আনে। এই ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা ও ভালো দিয়ে মন্দের প্রতিদান দেয়ার মনোভাব মানুষকে সত্যিই এক মহান মর্যাদার আসনে বসিয়ে দেয়, যা সকল মানুষ পেতে পারে না। এ মহান মর্যাদা লাভ করার জন্যে কঠিন সবরের প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা এ গুণের মাধ্যমেই সেসব মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করেন। ফলে তাদের আল্লাহ তায়ালা সেই মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন। এরশাদ হচ্ছে–

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ

'আর এ (বিষয়)-টি শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে, যারা (সর্বোচ্চ পর্যায়ের) ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।' (হা-মীম আস সাজদা, ৩৫)

এটা হচ্ছে এমন এক উঁচু মর্যাদার স্তর যে পর্যন্ত রসূল (স.)-ই সঠিকভাবে পৌছুতে পেরেছেন। তিনি তো ছিলেন এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের জন্যে বা ব্যক্তিগত কারণে কখনও রাগ করেননি। আর আল্লাহর উদ্দেশে যখন তিনি রাগ করেছেন, তখন আবার এতো বেশী রাগ করেছেন যে অন্য কেউ এ ভাবে রাগ করতে পারে না। তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর মতো অন্যান্য সকল দাওয়াতদানকারীদের সম্পর্কে আল কোরআনে একই কথা এসেছে। এরশাদ হচ্ছে–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও, কেননা তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (হা-মীম আস সাজদা, ৩৫)

এখানে বুঝা যাচ্ছে, ক্রোধ এমন এক অবস্থা যেটা আপনা থেকে আসে না। কোনো বাহ্যিক কারণেই এর উদ্রেক হয় এবং এ অবস্থা তখনই আসে যখন কোনো দুর্ব্যবহার বা অন্যায় আচরণ সহ্য করতে গিয়ে সবরের কমতি দেখা যায়। অথবা ক্ষমার প্রশ্নে কারো হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যায়। সে অবস্থায় মরদূদ শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাওয়া দরকার, যাতে তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মানবীয় অন্তরের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এ অন্তরের মধ্যে প্রবেশের সকল দরজা এবং এর মধ্যে চলাচলের সকল গোপন পথ তিনি জানেন। শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্যে তিনি তার শক্তি যোগ্যতাও জানেন, তিনি জানেন

কোত্থেকে শয়তান তার কাছে আসে। তিনিই দাওয়াতদানকারীর অন্তরকে তাঁর দিকে রুজু করে রাখতে সক্ষম, তিনিই তাদের শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্যে নিরাপত্তা দান করতে পারেন। তিনি তাকে ক্রোধের উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে পারেন। আর তিনিই সহিষ্ণু লোকদের সেসব ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারেন, যা ক্রোধের কারণে মানুষকে স্পর্শ করে।

ক্রোধ দমন করার এ পদ্ধতি বড়ই কঠিন। এটা হচ্ছে কু-প্রবৃত্তির গোপন সুড়ংগ পথ, কন্টকাকীর্ণ গিরি সংকট এবং জংগলে ভরা কঠিন উপত্যকা। এ সব পথ দিয়ে দ্বীনের দাওয়াতদানকারীদের জান্নাতে যাওয়ার পথ অতিক্রম করতে হয়, এভাবেই বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে তারা গন্তব্যস্থল এবং সফরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়!

হযরত ইউনুস (আ.)—এর শিক্ষণীয় ঘটনা

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

'(স্মরণ করো,) 'মাছওয়ালা'র (ইউনুসের) কথা, যখন সে রাগ করে বের হয়ে গিয়েছিলো, তখন সে ভাবলো আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে (দ্বীনী কাজের) সুযোগ সংকীর্ণ করবেন না, (অতপর যখন সে (মাছের পেটের) অন্ধকারে বসে আমাকে (এই বলে) ডাকলো, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিলাম।' (আল আম্বিয়া, ৮৭)

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

হযরত ইউনুসকে 'যুননুন' বা মাছওয়ালা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কারণ তাকে মাছে গিলে খেয়েছিলো এবং পরে আবার উগলে ফেলে দিয়েছিলো। ঘটনা হচ্ছে, দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তাকে এক শহরে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি সেখানে গিয়ে আল্লাহর দিকে জনগণকে আহ্বান জানালেন, কিন্তু তারা সবাই তার দাওয়াত অমান্য করলো। তিনি ভীষণ বিরক্ত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি দাওয়াতের দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেন না। ভাবলেন, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে দুনিয়াকে সংকীর্ণ করবেন না। দুনিয়া তো সুপ্রশস্ত। আরো বহু শহর ও জনপদ রয়েছে। এরা দাওয়াত অস্বীকার করলে ক্ষতি নেই। আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্য জাতির কাছে পাঠাবেন।

'সে ভাবলো আল্লাহ তার জন্যে সুযোগ সংকীর্ণ করবেন না' কথাটার অর্থ সম্ভবত এটাই। অর্থাৎ তার দাওয়াতের জায়গার অভাব হবে না। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে তিনি সমুদ্রের কিনারে চলে গেলেন। সেখানে একটা যাত্রী বোঝাই জাহাজ পেয়ে তাতে চড়ে বসলেন। জাহাজটা গভীর সমুদ্রে গেলে চালকের মনে হলো, জাহাজে একজন যাত্রী

অতিরিক্ত বহন করা হয়েছে, যার কারণে জাহাজটির ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই সে বললো, জাহাজ থেকে কমের পক্ষে একজন যাত্রীকে সাগরে ফেলে দেয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে। একমাত্র এভাবেই বাদবাকী যাত্রীদের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। তখন লটারি করা হলো। লটারিটা উঠলো হযরত ইউনুসের নামে। অগত্যা তাকে সাগরে ফেলে দেয়া হলো। ফেলে দেয়া মাত্রই তাকে একটা বড়ো মাছে গিলে খেয়ে ফেললো। এবার তিনি পড়লেন জীবনের কঠিনতম সংকটে। একে তো মাছের পেটের ভেতরের অন্ধকার, তদুপরি সাগরের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার– এ তিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি বলে উঠলেন–

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

'হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।' (আল আম্বিয়া, ৮৭)

আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করলেন। মাছটা তাকে সমুদ্রের কিনারে উগরে ফেলে দিলো।

হযরত ইউনুসের কাহিনীর যে অংশটুকু এখানে আলোচিত হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও শিক্ষাপূর্ণ।

কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক হযরত ইউনুস (আ.) রেসালাতের দায়িত্ব পালনে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখাননি। যারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তাদের ওপর তিনি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে দাওয়াতের দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ের ওপর থেকে নামিয়ে রাখলেন, অতপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন বিরক্তিকর ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করলেন, যার তুলনায় তাকে প্রত্যাখ্যানকারীদের সৃষ্টি করা পরিস্থিতি ছিলো অনেক সহজ। তিনি যদি আল্লাহর কাছে আশ্রয় না চাইতেন, তার নিজের ওপর যে যুলুম করেছেন, তার দায়িত্ব ও দাওয়াতের কাজের প্রতি যে অবিচার করেছেন, তা যদি স্বীকার না করতেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার মসিবত থেকে উদ্ধার করতেন না। তার বিনীত স্বীকৃতি ও দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত তাকে তার কষ্টকর ও উদ্বেগজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত লোকদের এই ময়দানের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, বাধা বিপত্তি ও সমস্যা সংকট সহ্য করতেই হয় এবং প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারজনিত পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতেই হয়। একজন নিরেট সত্যবাদী প্রচারকের দাওয়াত অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করলে এবং তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলে সেটা সহ্য করা খুবই কঠিন মনে হয়। তবে এটা রসূলসুলভ দায়িত্বেরই অংশ। যারা দাওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তাদের ধৈর্য ধারণ না করে উপায় থাকে না। সর্বাবস্থায় তাদের দৃঢ় থাকতে ও মনোবল অটুট রাখতে হয়, দাওয়াত প্রত্যাখ্যাত হলেও তা অব্যাহত রাখতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ দাওয়াত দিয়ে যেতে হয়।

মানুষের সংশোধন ও দাওয়াত গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ হতে নেই– চাই যতোই প্রত্যাখ্যান, অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করা হোক না কেন। একশ বার দাওয়াত দিয়েও যেখানে কাজ হয় না, সেখানে একশ একবার বা এক হাজার একবার দিয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে এবং দাওয়াত গৃহীত হতে পারে। তাই ধৈর্য ধারণ করে এবং হতাশ না হয়ে দাওয়াত অব্যাহত রাখলে একদিন শ্রোতার মনের দরজা খুলেও যেতে পারে।

দাওয়াতের পথ সহজ ও কুসুমাস্তীর্ণ নয় এবং মানুষের হৃদয়ের কাছে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হওয়াও মোটেই সহজসাধ্য নয়। কেননা বাতিল ও বিভ্রান্তিপূর্ণ ধ্যান ধারণা, আদত অভ্যাস, ঐতিহ্য ও প্রথা মানুষের মনের ভেতর স্তূপীকৃত হয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রবেশের পথ আগলে রাখে। এসব স্তূপ সরানো অপরিহার্য। যে কোনো পন্থায় মনকে ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা জরুরী। সব ক'টা স্পর্শকাতর কেন্দ্রকে নাড়া দেয়া এবং মন মগজের সব ক'টা গিরা খুলে দেয়া প্রয়োজন। আর এর প্রতিটা পর্যায়ে ধৈর্য সহকারে, অধ্যবসায় সহকারে ও আশাবাদী মন নিয়ে কাজ করতে হয়। এর কোনো এক পর্যায়ে একটা নাড়া বা ধাক্কা দিতেই এক মুহূর্তের ভেতরেই মানুষের সমগ্র মনমগয পুরোপুরিভাবে পাল্টে যেতে পারে– যদি নাড়াটা সঠিক জায়গায় পড়ে। মানুষ হাজার বার চেষ্টা করেও যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে একটা সঠিক চেষ্টার সাফল্য দেখে তাকে অনেক সময় বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হলো বেতার যন্ত্র। বেতার যন্ত্রে যখন প্রেরণ কেন্দ্র অনুসন্ধান করা হয়, তখন বহুবার একই সংকেত বিন্দুর ওপর দিয়ে নির্দেশক কাঁটা নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা সত্ত্বেও ষ্টেশন ধরা পড়ে না। অথচ এভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ এক সময় এক নাড়াতেই ষ্টেশন ধরা পড়ে। আর তখন সঠিক তরংগের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং প্রচারিত প্রোগ্রাম শোনা যায়।

মানুষের মন অনেকটা বেতার যন্ত্রের মতোই। দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত লোকদের উচিত অনবরত নির্দেশক কাঁটা ঘোরাতে থাকা, যাতে শ্রোতার মনের নাগাল পাওয়া যায়। হাজার বার নাড়া দেয়ার পর ব্যর্থ হলেও তার পরে হঠাৎ একবারেই ষ্টেশন ধরা সম্ভব হতে পারে।

মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করছে না– এ অজুহাত দেখিয়ে রেগে গিয়ে দাওয়াত ছেড়ে দেয়া ও প্রত্যাখ্যানকারীদের ত্যাগ করে দূরে সরে যাওয়া খুবই সহজ ও আরামদায়ক কাজ। এতে কিছুক্ষণ পর ক্রোধ প্রশমিত হবে এবং উত্তপ্ত স্নায়ুগুলো ঠান্ডা হবে, কিন্তু দাওয়াতের কী হবে? বিরোধী প্রত্যাখ্যানকারীদের ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় ফায়দাটা কী হবে?

মনে রাখতে হবে, দাওয়াতের কাজটা চালু থাকাই আসল ও জরুরী বিষয়, দাওয়াতদাতার ভালো লাগা-মন্দ লাগা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। তার বিরক্ত লাগে লাগুক, রাগ হয় হোক। রাগ হজম করে ফেলতে হবে এবং সামনে এগিয়ে যেতে

হবে। ধৈর্য ধারণই তার জন্যে কল্যাণকর। ধৈর্য ধারণের অভ্যাস করলে যে যাই বলুক, তাতে বিরক্তি লাগবে না।

দাওয়াতদানকারী আল্লাহর হাতিয়ার। আল্লাহ তায়ালা তার দাওয়াতের শ্রেষ্ঠ তদারককারী ও তত্ত্বাবধায়ক। দাওয়াতদানকারীর কর্তব্য হলো সর্বাবস্থায় ও সকল পরিবেশে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া। বাকী যেটুকু, তা আল্লাহর হাতে সমর্পিত। হেদায়াতের দায়িত্ব আল্লাহর।

হযরত ইউনুসের ঘটনায় দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, তা বিবেচনা করা দরকার। তার আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন ও ভুল স্বীকার করায়ও শিক্ষা রয়েছে, সেটাও অনুধাবন করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে মহাসংকটে নিপতিত হযরত ইউনুসের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়া ও তার সকাতর দোয়া কবুল হওয়ার ভেতরেও মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে।

আন্দোলনকর্মীদের জন্যে হযরত লোকমানের উপদেশ

হযরত লোকমান (আ.) তার সন্তান তথা ভাবী প্রজন্ম ও তরুণ সমাজের কাছে সর্বপ্রথম শেরেক বর্জিত আল্লাহর তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলেছেন। অতপর পার্থিব জীবনের সমাপ্তির পর অনন্ত জীবন আখেরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও কেয়ামত দিবসে মহাবিচার আদালতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা রয়েছে। সেদিন বিচার মুহূর্তে একটি সরিষা-কণা পরিমাণ কোনো বস্তুও বিচার ও ন্যায়দন্ড থেকে বাদ যাবে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবলীল, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপদেশ দেয়ার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টিকারী মৌলিক এবাদাত নামাযের কথাও বলেছেন। মানব প্রকৃতিকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোনিবেশ করা, আল্লাহর পথে দাওয়াতে নিয়োজিত জনশক্তি ও সংগঠনের প্রতি তাগূতী শক্তির যুলুম নির্যাতন ও প্রলোভনের সময় ধৈর্য এবং দৃঢ়তা অবলম্বনের উপদেশও এতে প্রদান করা হয়েছে। তার এ উপদেশগুলো মহান আল্লাহর কাছে এতোই পছন্দ হয়েছে যে, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ আসবে তাদের অবগতির জন্যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে তা তুলে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে–

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ - يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ج

‘হে আমার বৎস (হে আমার ভাবী বংশধর), নামায কায়েম করো। সৎ কাজের আদেশ দাও। অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো। (আর এ দায়িত্ব পালনের কারণে) তোমার ওপর যে মসিবত পতিত হয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করো। আর এ ধৈর্য ধারণ করাটা নিশ্চয়ই একটা সাহসিকতাপূর্ণ কঠিন কাজের অন্তর্ভুক্ত।’ (লোকমান, ১৬-১৭)

এটা হচ্ছে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী তাওহীদ বিশ্বাসের প্রতীক, আল্লাহ তায়ালার সুবিচারের প্রতি গভীর আস্থা ও আল্লাহ তায়ালার আযাবের ভয় সম্পর্কে সচেতনতা সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা। এ বর্ণনাভংগি মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াত এবং তাদের সংস্কার সংশোধনের দিকে ধাবিত করে। অসত্য থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়। আয়াতে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও পাথেয় সংগ্রহের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে, আর এ পথের মূল পাথেয় ও রসদ যে আল্লাহর বন্দেগী বা এবাদাত তাও বলা হয়েছে। এবাদাতের প্রক্রিয়া নামায কায়েমের মাধ্যমেই দাওয়াতের মূল পাথেয় গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নামাযের পরক্ষণেই দাওয়াতের অন্যতম পাথেয় ও মনযিলে পৌছার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'সবর' তথা ধৈর্য অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রতি বিরোধী শক্তির হুমকি, ধমকি, প্রলোভন ও যুলুম নির্যাতনসহ তাদের অশ্লীল গালি গালাজ, ভর্ৎসনা, চোখ রাংগানি, অশালীন মন্তব্য, বিদ্রূপ, হাসি ঠাট্টা, সন্ত্রাস ইত্যাদি পরীক্ষায়ও ধৈর্যের মহান বৈশিষ্ট্য অর্জন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

'তোমার ওপর যে মসিবত আসে তাতে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই ধৈর্য অবলম্বন করা হচ্ছে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ বড়ো কঠিন কাজ।' (লোকমান, ১৭)

কারণ দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাগূত তথা তাওহীদবিরোধী শক্তির বিরোধিতা, প্রতিবন্ধকতা, সংঘাত, যুলুম নির্যাতন, প্রলোভন, বিদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী। এ বিরোধিতা, নির্যাতন, যুলুমের বিভীষিকার মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা নিসন্দেহে একটি সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।

বাতিলের কঠোর যুলুম-নির্যাতনের উদ্বিগ্নতার চরম মহূর্তে দাওয়াতের মহান দায়িত্বে ধৈর্যের সাথে দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থিতিশীলতার মনযিলে অগ্রসর হওয়া আসলেই একটি কঠিন কাজ।

আল কোরআন হযরত লোকমান (আ.)-এর উপদেশমালা আল্লাহর পথে আহবানকারীর বৈশিষ্ট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। দাওয়াত ইলাল্লাহর লক্ষ্য মানব গোষ্ঠীর ওপর আহবানকারীর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নয়, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাও নয়; বরং মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করাই তার অন্যতম লক্ষ্য। এ মহান বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে মানবকল্যাণের এ লক্ষের পরিবর্তে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনা যদি লুকায়িত থাকে, তবে তা হবে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট।

অতপর হযরত লোকমানের এ উপদেশমালার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বলা হয়েছে–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ج وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

'(হে বৎস) মানুষের মাঝে চলার সময় কখনো (অহংকার বশে) তুমি গাল ফুলিয়ে রেখো না এবং (আল্লাহর) যমীনে কখনো উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকেই অপছন্দ করেন। (হে বৎস, যমীনে চলার সময়) তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বরকে নীচু করো, কেননা সব আওয়াযের মধ্যে সবচাইতে অপ্রীতিকর আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।' (লোকমান, ১৮-১৯)

আলোচ্য আয়াতে এই 'সায়্যের' ক্রিয়ার মূলধাতু 'ছারুন' বলতে উটের এক ধরনের রোগকে বুঝানো হয়েছে, যে রোগে আক্রান্ত হলে উটের গাল ফুলে যায় এবং ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়। কোরআন হাকীমে এ গাল ফোলা ও ঘাড় বক্রতার রোগকে প্রকৃতির আত্মাভিমান ও অহংকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। চলার সময় দাম্ভিকতাপূর্ণ চলা ও দ্রুতবেগে পথ চলার পরিবর্তে মধ্যম পন্থায় পথচলার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা অহংকার ও দ্রুতবেগে পথ চলা হচ্ছে গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন অহংকারীদের বৈশিষ্ট্য। অহংকার ও গণবিচ্ছিন্ন জীবন যাপন হচ্ছে এক মারাত্মক মানসিক ব্যাধি, নৈতিকতাবিরোধী ঘৃণ্য আচরণ। এ ধরনের আচরণ একমাত্র দাম্ভিক অহংকারীদের পক্ষেই শোভা পায়, একজন চরিত্রবান ব্যক্তির পক্ষে এ ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন কিছুতেই শোভা পায় না। কেননা বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ج

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (লোকমান, ১৮)

অহংকার দাম্ভিকতাপূর্ণ চলা বর্জনের উপদেশ দেয়ার পরক্ষণেই পথচলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা এমনিভাবে পথচলার মধ্যে শালীনতা ও গাম্ভীর্য সংরক্ষিত হয়। অহংকারমুক্ত ও বিপদ মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে পথ অতিক্রম করা যায়। এতে জনগণের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সংযোগ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। বিপদ, দুর্ঘটনা ও আশংকামুক্তভাবে পথ অতিক্রম করাও এতে সহজ হয়।

'ওয়াগদুদ মিন ছওতেকা' বাক্য দ্বারা কণ্ঠস্বর নীচু করার কতিপয় মহৎ গুণাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মৃদু মধুর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর মানুষের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, স্থিরচিত্ততা, গাম্ভীর্য, সত্যনিষ্ঠা ও সৌজন্যমূলক আচরণের পরিচায়ক। রুক্ষতা ও কঠোরতার পরিবর্তে তা অমায়িক ও মধুর আচরণের প্রমাণ বহন করে। বক্তব্যকে নির্ভুল, সাবলীল ও পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপন করাও সহজ হয়। এতে করে বক্তব্যকে

শ্রুতিকটুতা ও ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা যায়, অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ থেকে বক্তব্যকে মুক্ত রাখা সম্ভব এবং সহজ হয়। বাক্যকে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম থেকে সংযত রাখে। ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, সর্বোপরি সকল রুক্ষতা কঠোরতা থেকে বক্তব্য বিষয়কে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করে দেয়।

অতপর পরবর্তী বাক্য কথা বলার পদ্ধতি উপস্থাপন করে বিকট শব্দে অতি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলাকে হীন ও নিকৃষ্ট পন্থা বলে চিহ্নিত করেছে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা ও নীচু কণ্ঠে কথা বলার নির্দেশনা প্রদানের পর পরই বলা হয়েছে–

إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ع

'নিশ্চয়ই গাধার কণ্ঠস্বর হলো অপছন্দনীয় স্বর।' (লোকমান, ১৯)

মূলত উচ্চ কণ্ঠস্বর মানবচরিত্রে অপ্রীতিকর আচরণ, অট্টহাসি, ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাস্যকর স্বভাবের উদ্রেক ঘটায়। বিকট আওয়ায ও চীৎকার করে কথা বলা, ইত্যাদি হাস্যকর বাক্যভংগিকে রূপকভাবে গাধার অপ্রীতিকর স্বরের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। আর এভাবেই উপদেশমালার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হচ্ছে। কোরআনে হাকীম এমনিভাবে শালীন পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার ভংগি শিক্ষাদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

দূরদর্শী নেতৃত্বের সুফল

এখানে আমরা সূরা বাকারায় আলোচিত তালুত জালুতের বিখ্যাত ঘটনা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবো। আশাকরি এ ঘটনা থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নেতৃত্বের দূরদর্শিতা সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশনা লাভ করতে পারবে।

বনী ইসরাঈলরা তাদের ওপর নেমে আসা দুঃখ দুর্দশা ও অশান্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যখন আবার গাঝাড়া দিয়ে উঠেছিলো, তখন তারা তাদের নবীর কাছে একজন নেতা ঠিক করে দিতে বললো, যার নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করবে। এখানে আমরা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে যাবো না। যে বিষয়টি আমরা এ ঘটনা থেকে এখানে আলোচনা করবো, তা হলো তালুতের দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে তৎকালীন মুসলিম উম্মত বনী ইসরাঈলরা কি অনিবার্য বিপর্যয় থেকে, কতো ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। নবীর সাথে মিলে জেহাদের অংগীকার করার পর যারা জেহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, নবীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগ করেনি, তাদের সমন্বয়ে তালুত তার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। এখানে নবীর সাথে সাথে তাদের কথাবার্তার দৃশ্য থেকে সরাসরি যুদ্ধযাত্রার দৃশ্যে চলে যাওয়া হয়েছে।

দৃশ্য দুটির চিত্রায়নে এখানে কোরআন যে ধারাবর্ণনা অবলম্বন করেছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম দৃশ্যটির ইতি টানার সাথে সাথেই দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে। তালুত তার সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে–

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۙ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ ۙ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ۢ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'তালুত নিজ বাহিনী নিয়ে যখন বের হয়ে পড়লো, তখন সে (তার লোকদের) বললো, আল্লাহ তায়ালা একটি নদীর পানি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যদি কেউ এ নদীর পানি খায় তাহলে সে আর আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে ব্যক্তি এই নদীর পানি খাবে না সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত থাকবে, তবে কেউ যদি তার হাত

দিয়ে সামান্য এক আঁজলা (পানি খেয়ে নেয় তা হবে) ভিন্ন কথা; অতপর (সেখানে গিয়ে) হাতে গোনা কয়জন লোক ছাড়া আর সবাই তৃপ্তিভরে পানি পান করে নিলো, এ কয়জন লোক যারা তার কথায় তার সাথে ঈমান এনেছিলো– এদের নিয়ে তালুত যখন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো, তখন তারা (নিজেদের দীনতা দেখে) বলে উঠলো, হে আল্লাহ, আজ জালুত এবং তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই; (এ সময় তাদেরই সাথী বন্ধুরা) যারা (নিশ্চিত) জানতো, তাদের আল্লাহর সামনে একদিন হাযির হতে হবে, তারা বললো, (ইতিহাসে এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।' (আল বাকারা, ২৪৯)

এ পর্যায়ে এসে তালুতকে মনোনীত করার অন্তর্নিহিত রহস্য, আল্লাহর হেকমত আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি এগিয়ে চলছেন সম্মুখসমরে। অথচ তার সাথে যে সেনাবাহিনী রয়েছে তাদের গুণগতমান মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

তারা তো পরাভূত, পরাস্ত ও দাসত্বের শৃংখলে দীর্ঘ দিন আবদ্ধ একটি জাতি। পরাজয়, অবমাননাই তাদের ইতিহাস। অথচ তাদের নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে শক্তিশালী ও বিজয়ী একটি জাতির। সুতরাং এ জাতির মোকাবেলায় টিকে থাকতে হলে অবশ্যই তাদের প্রচন্ড মনোবল, আস্থা ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

অস্ত্র ও জনবলের মোকাবেলায় টিকতে হলে আগে তাদের মনে প্রচ্ছন্ন এক শক্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা, প্রচন্ড মনোবল ও দৃঢ় সংকল্পই মানুষের মধ্যে এমন শক্তি এনে দিতে পারে যা প্রবৃত্তির সকল কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এ ধরনের ঈমানী মনোবলই সুখে-দুঃখে, অভাবে-অনটনে, বিপদে-আপদে মানুষকে সত্যের ওপর অটল রাখতে পারে। এ মনোবলই মানুষকে বস্তুবাদী জগতের ওপরে তুলে এক মহাশক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে, যে কোনো পরিস্থিতিতে আনুগত্যের ওপর অটল রাখতে পারে। যে কোনো কষ্ট সহ্য করে সত্যের ওপর টিকে থাকতে এটাই তাকে শক্তি যোগায়। এ মনোবলই একের পর এক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা যোগায়। সুতরাং একজন সেনানায়কের অবশ্যই তার বাহিনীকে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। যাচাই করে নিতে হবে তার সৈন্যদের মনোবল, মনোভাব, ধৈর্য ও আস্থা। খতিয়ে দেখতে হবে লোভ লালসার মোকাবেলায় ঈমানের ওপর তারা কতোটা অনড়। কঠিন অবস্থা, প্রতিকূল পরিস্থিতি, দুঃখ দুর্দশায় তারা কতোটা অবিচল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে তাও যাচাই করা দরকার।

ঠিক এ উদ্দেশেই তালুত তাদের পানি পান না করতে বলে একটা বড়ো ধরনের পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। বর্ণনায় পাওয়া যায়, তারা সে সময় পিপাসার্ত ছিলো। তালুতও এ সুযোগে যাচাই করে নিতে চাইলেন ধৈর্যের সাথে কে তার সাথে থাকে,

তার আনুগত্য করে– আর কে অধৈর্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দেখা গেলো, তার এ বিচক্ষণতা ঠিকই কাজে লেগেছে।

فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

'সামান্য কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশই তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলো।' (আল বাকারা, ২৪৯)

তালুত তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন, পথ চলতে চলতে হাতের কোষ ভরে সামান্য পানি পান করার, যাতে পিপাসাও মেটে আবার সেনাবাহিনী থেকেও যাতে বিচ্যুত হয়ে পড়তে না হয়, কিন্তু তারা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে পানি পান করতে গিয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলো না। তাদের ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে তারা অযোগ্য বিবেচিত হলো। এমতাবস্থায় তাদের সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করে দেয়াটাই ছিলো বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়। শুধু সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্যে তাদের বাহিনীতে রাখার কোনোই প্রয়োজন নেই; বরং এ ধরনের লোক বাহিনীতে থাকলে অনেক সময় এরা অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কেননা এরা হলো দলের মধ্যে দুর্বলতা, পরাজয় ও বিশৃংখলার বীজ। কোনো সেনাবাহিনীর শক্তি কখনোই সংখ্যাধিক্যের দ্বারা বৃদ্ধি হয় না। ঈমানের দৃঢ়তা, অটল অবিচল সংকল্প ও আনুগত্যের একনিষ্ঠতাই হলো একটি বাহিনীর প্রাণশক্তি।

এ ঘটনা প্রমাণ করে, শুধু মনের ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়; বরং সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সেনাবাহিনীর বাস্তব অবস্থা যাচাই করে নেয়া দরকার। নেতৃত্বে ও সেনা পরিচালনায় যারা থাকেন তাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাই। প্রথম পরীক্ষায় অধিকাংশ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ সেনাপ্রধানের ওপর সামান্যতম প্রভাবও ফেলতে পারেনি, তিনি একটুও হতোদ্যম হয়ে পড়েননি। তিনি তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলিষ্ঠভাবেই এগিয়ে গেলেন।

এ পরীক্ষার পর তালুতের বাহিনী অনেক ছোটো হয়ে গেলো, কিন্তু তাতে সে তার মিশন বন্ধ করেনি।

فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ

'অতপর সে যখন তার ঈমানদার সাথীদের নিয়ে নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো, তখন তারা নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা দেখে বললো, এ মুহূর্তে জালুত ও তার বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই।' (আল বাকারা, ২৪৯)

এভাবে সৈন্যসংখ্যা কমতে কমতে মাত্র হাতেগোনা কিছু লোকই তার সাথে ছিলো এবং তারা একথাও জানতো, তারা লড়াই করতে যাচ্ছে দুর্ধর্ষ সেনাধ্যক্ষ জালুতের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে, কিন্তু তারপরও সামান্যতম বিচলতা তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। এরাই ছিলো সত্যিকার ঈমানদার, যারা কোনো অবস্থাতেই নবীর সাথে করা অংগীকার ভংগ করেনি। সর্বোপরি যে বাস্তব অবস্থা তারা চোখে দেখছিলো তাতে

শত্রুশক্তির মোকাবেলায় নিজেদের শক্তিকে অপ্রতুল মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শত্রুর তুলনায় তারা ছিলো খুবই দুর্বল ও নগণ্য। এটা ছিলো তাদের জন্যে এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা দেখতে চাচ্ছিলেন, তারা সকল শক্তির নিয়ন্ত্রক, মহাশক্তিধর, মহাক্ষমতাবান আল্লাহর অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করে কি না। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, এ ধরনের নাযুক পরিস্থিতিতে অটল অবিচল থাকা শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত, যাদের হৃদয় মহাশক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, যাদের সকল শক্তির মূল উৎস হলো নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠ ঈমানী চেতনা। তারা কখনো সেসব সংকীর্ণমনা লোকদের মতো নয় যাদের দৃষ্টি বস্তুবাদী জগতের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ। এ কঠিন পরীক্ষার পরও একদল আত্মনিবেদিত মোমেন সত্যের পথে অবিচলভাবে টিকে রইলেন।

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'যারা জানতো তাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, তারা বললো, (ইতিহাসে এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।' (আল বাকারা, ২৪৯)

হাঁ, এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য। জয় পরাজয়ের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে মৌলিক নীতি। এটা একমাত্র তারাই অনুভব করতে পারে যারা একদিন আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। হাঁ, এটাই তো স্বাভাবিক, মোমেনরা সংখ্যায় খুবই সামান্য থাকবে। কেননা এরা তো সেই দল যারা অনেক কষ্টের পাহাড় পাড়ি দিয়ে, অনেক দুঃখ দুর্দশা, বিপদ আপদ সহ্য করে, অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে আল্লাহর বাছাই করা বান্দাদের কাতারে শামিল হয়েছে। এমনিভাবে স্রোতের বিপরীতে দুঃসাহসী মানুষ যে সংখ্যায় কম হবে এটা তো আশ্চর্যের কিছু নয়। তবে সংখ্যায় তারা যতো স্বল্পই হোক না কেন চূড়ান্ত বিজয় এদের হাতেই ধরা দেবে।

কেননা তাদের সম্পর্ক রয়েছে সেই মহাশক্তিমান আল্লাহর সাথে, যিনি সকল ক্ষমতার উৎস। তারা তো সেই শক্তির প্রতিভূ যে শক্তি সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর ওপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত। তাদের সংযোগ সেই আল্লাহর সাথে, যাঁর ইচ্ছা যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো সময়ে কার্যকর হয়। যিনি অহংকারী, দাম্ভিক ও প্রতাপশালীদের যে কোনো মুহূর্তে অপমানিত, অপদস্থ, লাঞ্ছিত করে পরাজিত করতে সক্ষম। তারা সাহায্য ও বিজয়ের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে। তারা বলে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর ইচ্ছায়ই সবকিছু হয়, তারা বিশ্বাস করে—

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'আল্লাহ তায়ালা সবসময় ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।' (আল বাকারা, ২৪৯)

এবং তারা এটাও উপলব্ধি করে যে, হকের পক্ষ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের বাছাই করেছেন।

সেই ক্ষুদ্র মোমেন দলটির ঘটনা এগিয়ে চলেছে, যারা নিরংকুশভাবে এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো। যারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিলো। আমরা দেখতে পাচ্ছি, শত্রুদের শক্তি, সংখ্যাধিক্য ও নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের মনে কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি, তারা সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতেও তারা সাহায্য চেয়েছেন একমাত্র আল্লাহর কাছে। বিজয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۝

'তারপর (যখন) সে তার সৈন্যদল নিয়ে জালুতের মোকাবেলায় দাঁড়ালো তখন তারা (আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে) বললো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের সবরের তাওফীক দান করো, দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের কদম অটল রাখো, অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো। অতপর তারা তাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছায় (পর্যুদস্ত ও) লাঞ্ছিত করে দিলো এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করলেন এবং (তাঁর) জ্ঞানও তাকে শিক্ষা দিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজ ইচ্ছামতো আরো (বহু) বিষয়ের জ্ঞান শিখিয়েছেন। (আল বাকারা, ২৫০)

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সবরের তাওফীক দাও।' (আল বাকারা, ২৫০)

এ কথাটি তাদের ধৈর্যের চিত্র ফুটিয়ে তোলে এবং এ সবরের ক্ষমতা যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে তাও প্রতিভাত হয়। শব্দ চয়নে মনে হয় যেন সবর তাদের ছেয়ে ফেলেছে। কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে দৃঢ় মানসিক শান্তি ও অবিচল থাকার শক্তি তাদের ওপর বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছে।

وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

'এবং আমাদের কদম অটল রাখো।' (আল বাকারা, ২৫০)

নিসন্দেহে অটল অবিচল থাকার ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, তাঁর কুদরতী হাতেই এর সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনিই মোমেনদের সত্যের ওপর এমনভাবে অটল অবিচল রাখেন যে, কোনো কিছুই তাদের বিন্দুমাত্র বিচ্যুত বিচলিত করতে পারে না।

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

'এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।'

এ পর্যায়ে এসে পুরো বিষয়টি একেবারে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ যুদ্ধ ঈমান ও কুফুরের, এ যুদ্ধ হক ও বাতিলের। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর শত্রু কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর বন্ধু ঈমানদারদের সাহায্য করবেন, তাদের বিজয় দান করবেন। সুতরাং তাদের মনে কোনো প্রকার হীনতা, জড়তা, অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমানতা আদৌ শোভা পায় না। লক্ষ্য উদ্দেশ্য, পথ পদ্ধতি এখানে স্পষ্ট। সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ এখানে নেই।

মোমেনদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের প্রতীক্ষিত ফলাফল আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ

'তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পর্যুদস্ত করে দিলো।'

'ইযন' অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। যাতে করে মহাবিশ্বের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি ঘটনার নিয়ন্ত্রণ যে একমাত্র মহাশক্তিমান আল্লাহর কুদরতী হাতেই নিবদ্ধ তা মোমেনরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বাস্তব সত্য হলো, মোমেনরা আল্লাহর হাতিয়ার, আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারা যা খুশী তাই করান। তাদের মাধ্যমে মূলত তিনি তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন করেন এবং এর ভেতরে অন্য কারো ইচ্ছার কোনো প্রভাব নেই। এমনকি যাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেন তাদেরও কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালাই নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্যে তাদের মনোনীত করেছেন, তাঁর অনুমতিক্রমেই তাদের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হয়। এ এমনই এক শক্তি যা মোমেনের হৃদয় শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তায় কানায় কানায় ভরে দেয়। তারা হলো আল্লাহর বান্দা আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের বাছাই করেছেন, এটা আল্লাহর এক অসীম দয়া ও মেহেরবানী।

এদের জন্যে রয়েছে সম্মান আর সম্মান। প্রথমত আল্লাহ তায়ালা এক মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদের বাছাই করে সম্মানিত করেছেন। দ্বিতীয়ত এ দায়িত্ব পালনের পর তাদের প্রতিদানস্বরূপ সাফল্যের তাজ পরিয়ে দিয়েছেন। এটাও আল্লাহর এক সীমাহীন করুণা। তিনি যদি দয়া করে তাদের সাহায্য না করতেন তাহলে তারা এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতো না এবং সাফল্যও তারা পেতো না। লক্ষ্য উদ্দেশ্যের এ মহত্ত্ব, পথ ও পদ্ধতির পরিচ্ছন্নতা যখন একজন মোমেনের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা তার নিয়তে ও কাজকর্মে খুলুসিয়াত বা একনিষ্ঠতা দান করেন। তখন তার মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ বা রিপু কাজ করে না। অপরদিকে নিয়তের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, আনুগত্যের দৃঢ় সংকল্প থাকলে আর একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে, সকল রিপুকে দমন করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে

কাজ করলেই আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষকে এ সবকিছুর অধিকারী করেন। অতপর কোরআন হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা আমাদের সামনে এভাবে তুলে ধরে–

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

'আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো।'

বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) তখন নিতান্ত যুবক মাত্র। আর জালুত হচ্ছে শক্তিধর বাদশাহ, প্রবল প্রতাপশালী এক দুর্ধর্ষ নেতা, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলেন, গোটা জাতি এটা দেখুক, নিছক বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ীই সবকিছু হয় না; বরং ঘটনা ঘটে বাস্তবতার নিরিখে, যে বাস্তবতার জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহর, সে বাস্তবতার পরিমাণ আর তার মানদন্ডও কেবল তাঁরই হাতে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা। আল্লাহর সংগে সম্পাদিত অংগীকার পূরণ করা। অতপর তাই হবে তাই ঘটবে, যা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন, যেভাবে এবং যে উপায়ে তিনি তা ঘটাতে চান সেভাবেই হবে। তিনি ইচ্ছা করলেন এক অল্প বয়স্ক যুবকের হাতে এ প্রবল প্রভাবশালী দুর্দমনীয় স্বেচ্ছাচারীর পতন হোক। যাতে লোকেরা এটা বুঝতে পারে, দুর্বলরা যে দোর্দন্ড প্রতাপশালীদের এতো ভয় পায়, একজন অল্প বয়স্ক যুবকও তাকে পরাভূত করতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ তায়ালা কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা করেন। এখানে আরো একটি গোপন রহস্য ছিলো, আর তা হলো, তিনি ফয়সালা করে রেখেছিলেন যে, তালুতের পর দাউদের হাতে নেতৃত্ব দান করা হবে। তার পুত্র সোলায়মান হবে তার উত্তরাধিকারী, বনী ইসরাঈলের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার যুগটাই হবে সোনালী যুগ। আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের মনে যে বিভ্রান্তি আর গোমরাহী বাসা বেঁধেছিলো, তা দূর হয়ে তারা বিশুদ্ধ দ্বীনী আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ

'আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করলেন রাজত্ব ও প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং তাকে শিক্ষা দিলেন এমন কিছু– যা তিনি শিক্ষা দিতে চান।'

হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন যুগপৎ বাদশাহ এবং নবী। আল্লাহ তায়ালা তাকে যুদ্ধাস্ত্র এবং লৌহবর্ম নির্মাণের কৌশল শিখিয়েছিলেন। কোরআন মজীদের অনেক স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণনাধারায় গোটা কাহিনীর পেছনে ভিন্ন লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কেবল কাহিনীর পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে কথা এখানে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে তা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দৃঢ় ঈমানী শক্তিরই জয় হয়, বস্তুবাদী শক্তির নয়। জয় হয় ঈমানের, সংখ্যা সেখানে প্রধান বিষয় নয়। এখানে একটি বিরাট লক্ষ্যের কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করা হয়েছে। সে মহান লক্ষ্য কোনো সম্পদ হস্তগত করা নয়, ছিনতাই করাও নয়। মর্যাদা আর প্রভুত্ব কর্তৃত্বও তার উদ্দেশ্য নয়। তা হচ্ছে কেবল পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায়ের সংগে সংঘাতে বিরত হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করাই হচ্ছে সে মহান লক্ষ্য।

পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ

'সুতরাং তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করো এবং কাজে কর্মে তাদের সংগে পরামর্শ করো।' (আলে ইমরান, ১৫৯)

আলোচ্য আয়াতে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে ইসলামের অনড় বিধান। শাসন নীতিতে ইসলাম এটাকে মূলনীতি সাব্যস্ত করেছে। এমন কি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যিনি ইসলামী শাসননীতির প্রধান ব্যক্তিত্ব, তিনিও এ নীতির উর্ধ্বে নন। এ হচ্ছে শাশ্বত বিধান। এ বিধানের পর মুসলিম উম্মাহর এ ব্যাপারে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। 'শূরা' তথা পরামর্শ হচ্ছে এমন একটা মূলনীতি, যা ছাড়া অন্য কোনো মূলনীতির ওপর ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। অবশ্য শূরার ধরণ-প্রকার এবং যেসব উপায়ে শূরা সংগঠিত হতে পারে, সে ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক গঠন-কাঠামো এবং জীবনবোধ অনুযায়ী মূলনীতি সামনে রেখে আলোচনা পর্যালোচনা ও অগ্রগতি সাধন করা যেতে পারে। যেসব আকার-প্রকরণ ও উপায়-উপকরণ দ্বারা শূরার মূলতত্ত্ব সুসম্পন্ন হয়, তাকে কিন্তু সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত হতে হবে, নিছক শূরার বাহ্যিক প্রকাশই যথেষ্ট হবে না।

'শূরা' তথা পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতেই নবীকে এ বিধান দেয়া হয়, কিন্তু বাহ্যত ওহুদ যুদ্ধের সময় এতে একটা শংকা, একটা বিপদ দেখা দেয়। পরামর্শভিত্তিক কার্য সম্পাদনের ফলে বাহ্যত মুসলমানদের দলীয় ঐক্য সংহতিতে কিছুটা ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দেয়, দেখা দেয় নানা মত। অধিকাংশ লোকই এ মত ব্যক্ত করে যে, মুসলমানরা মদীনার সীমানার ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করে নগরী হেফাযত করবে, দুশমনরা মদীনায় হামলা চালালে সরু ও সংকীর্ণ গিরিপথের মোড়ে মোড়ে ওঁৎ পেতে থেকে তাদের সংগে কৌশলে লড়াই করবে। আলোচনার এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক লোক বীরত্ব প্রকাশ করে দ্বিমত পোষণ করে। তাদের মতে, মদীনা থেকে বের হয়ে মোশরেকদের মোকাবেলা করতে হবে। এ অনৈক্য-দ্বিমতের কারণে মুসলমানদের ঐক্য সংহতিতে সাময়িক কিছু ফাটল ধরে, দেখা দেয় কিছু ক্রটি বিচ্যুতি। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে কেটে পড়ে। ওদিকে শত্রুবাহিনী তখন একেবারেই মদীনার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। এটা ছিলো সত্যিই এক বিরাট ঘটনা, এক ভয়ংকর বিচ্যুতি। পরে জানা গেলো, সে সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ মূলত সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাপদ পদক্ষেপ ছিলো না। কারণ, তা ছিলো মদীনার প্রতিরক্ষায় প্রবীণদের বিরুদ্ধাচরণ করা। পরবর্তীকালে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা এর বিপরীত কর্মসূচী গ্রহণ করে। তারা মদীনার ভেতরে থেকেই প্রতিরোধ করে, মূলত ওহুদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই পরিখার যুদ্ধে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করার যে ভয়ংকর পরিণতি মুসলমানরা আঁচ করতে পেরেছিলো, মহানবী (স.) সে সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। দেখা স্বপ্নেও তিনি সে আভাস পেয়েছিলেন। তাঁর সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো। তাঁর আহলে বাইত এবং তাঁর আসহাবদের মধ্য থেকে অনেকে নিহত হবেন বলেও তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখা করেন। এ স্বপ্নে তিনি মদীনাকে সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবেও দেখতে পান। শূরার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তাঁর ছিলো, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান না করে বরং শূরার সিদ্ধান্তই তিনি মেনে নিলেন। এর পেছনে যেসব দুঃখ-যন্ত্রণা, যেসব খেসারত-ক্ষতি আর কোরবানীর ঝুঁকি ছিলো, তা-ও তিনি জানতেন। কারণ, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়ার নিয়ম চালু করা, গোটা জামায়াতকে তা শিক্ষা দেয়া এবং উম্মতের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ সাময়িক কিছু সামরিক ক্ষতি বরণ করে নেয়ার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলো।

শূরার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নবীর অবশ্যই ছিলো। এক চরম সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম শিবিরে সৃষ্ট বিভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনও ছিলো। যুদ্ধের পর যে তিক্ত পরিণতি দেখা দিয়েছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় এ অধিকার আসলেই প্রযোজ্য ছিলো, কিন্তু ইসলাম তো একটা গোটা জাতিকে একটা উম্মত হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, তাদের তৈরী করতে চায়, নবীনেতৃত্ব তা কেন করেননি তা ভেবে দেখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা জানেন, নানা জাতির লালন প্রশিক্ষণ আর সুস্থ-সঠিক নেতৃত্বের জন্যে তাদের গড়ে তোলার উত্তম উপায় হচ্ছে 'শূরা' তথা পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের তৈরী করা। এর যে ফল দেখা দেবে, তা বহন করার জন্যে তাদের ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এ জন্যে তারা মাঝে মাঝে ভুল করবে, সে ভুল যতো বড়ো এবং তার পরিণতি যতই তিক্ত-বিষাক্ত হোক না কেন। এর ফলে যে সাময়িক ভুল হবে তা থেকে তারা জানতে পারবে পরে তা কিভাবে শোধরাতে হয়। এতে তারা আরো বুঝতে পারবে, বিভিন্ন মতামত এবং তা বাস্তবায়নের সমস্যা কিভাবে সামাল দিতে হয়। ভুলে না জড়ানো পর্যন্ত তারা নির্ভুল বিষয় সম্পর্কে জানবে কি করে। একটা জাতির জীবনে ভুল, পদস্খলন এবং ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন আসে না, সে ভুলের পরিণতিতে উপদেশের আকারে গ্রহণ করে একটা শিশুর মতো করে সে জাতিকে গড়ে তোলা হয়, আর শিশু তো অনভিজ্ঞ এবং আনাড়িই থাকে। এ কারণে একটা শিশুকে হাঁটতে বারণ করা ঠিক নয় যে, বার বার তার পদস্খলন হবে। কেননা, বার বার পড়ে গিয়ে, সে হবে নির্ভয়।

ইসলাম একটা জাতি গড়ে তুলতে চায়, তাকে সুস্থ নেতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করতে চায়। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর জন্যে 'রুশদ' তথা সৎপথ নির্ণয় করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, আর বাস্তব জীবনের কর্মকান্ড থেকে সদুপদেশও তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যদিও নবীর নেতৃত্বের জন্যে শূরা তথা পরামর্শ অপরিহার্য নয়, কিন্তু মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে এ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছিলো, যাতে করে বাস্তব

জীবনের অভিজ্ঞতা অনুশীলন তারা সহজেই বুঝতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে এর ফলাফল লাভ করতে পারে।

এ ওহুদ যুদ্ধই বলতে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুসলমানরা এমন এক জাতি, যারা শত্রুতা আর বিপদাপদ দ্বারা চারদিকে পরিবেষ্টিত। চরম সংকটময় মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নেতৃত্বের জন্যে একান্ত জরুরী বিষয়। যদি উম্মতের মধ্যে সে ধরনের সুস্থ নেতৃত্বের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে এবং চরম সংকটময় মুহূর্তে কোনো পরামর্শের মুখোমুখি না হয়েই সিদ্ধান্তদানে সে নেতৃত্ব সক্ষম হয়, তবুও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

সেসময় মহানবী (স.) বেঁচে ছিলেন, আর তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসতো, তখন পরামর্শের অধিকার থেকে নিজেরা বঞ্চিত হওয়ার জন্যে মহানবী (স.)-এর উপস্থিতিই ছিলো যথেষ্ট, বিশেষ করে যুদ্ধের তিক্ত ফলাফলের আলোকে মুসলিম উম্মাহর পরিশীলনের জন্যে। কঠিন সিদ্ধান্তের সময় নিশ্চিত করে একথা বলা যায়, মহানবী (স.)-এর অস্তিত্ব এবং ওহীর আগমনটাই যথেষ্ট ছিলো। কারণ, আল্লাহ তায়ালা জানেন, এক চরম মুহূর্তে তাদের এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। তার পরিণতি যা কিছু হোক না কেন, মুসলিম দলে যতো বিভেদ-বিচ্ছেদই ঘটুক না কেন, যতো কঠিন কোরবানীই তাদের স্বীকার করতে হোক না কেন, তার জন্যে পরোয়া করলে চলবে না। বৃহত্তর প্রয়োজনের সামনে এসব হচ্ছে খুঁটিনাটি বিষয়, সত্যাশ্রয়ী উম্মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব তুচ্ছ মূল্যহীন কোনো বিষয় টিকতে পারে না। এসবের তখন কোনো মূল্যই থাকে না। ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহর নির্দেশ আসে; 'সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করো এবং কর্ম সম্পাদনে তাদের সংগে পরামর্শ করো।'

যাতে করে কঠিন বিপদ মোকাবেলা করার সময় এ মূলনীতি সদা কার্যকর থাকে এবং মুসলিম উম্মাহর জীবনে এ নীতির গোড়াপত্তন হতে পারে। এ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাদের যতোবড়ো বিপদেরই মুখোমুখি হতে হয় না কেন, তাদের জীবন থেকে এ নীতি মুছে ফেলার জন্যে যতো বাজে যুক্তির আশ্রয়ই নেয়া হোক না কেন, তা দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ নীতি কার্যকর করতে গেলে তার কিছু মন্দ পরিণতি হয় তো সাময়িকভাবে দেখা যেতে পারে, যদি তা নিজের দলের মধ্যে সাময়িকভাবে কিছু বিভেদ বিচ্ছেদের আকারেও হয়– তাও তাকে মেনে চলতে হবে। ঠিক এমনটিই ঘটেছে ওহুদ যুদ্ধে। তখন দুশমনরা একেবারেই দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, কিছু কিছু সমস্যা হলেও শূরা কখনো গোলকধাঁধা আর জটিলতা সৃষ্টি করে না। শেষ পর্যন্ত তা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা থেকেও উম্মতকে বিমুখ করে না।

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

'অতপর যখন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে; নিসন্দেহে যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন।' (আলে ইমরান, ১৫৯)

শূরার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে তাতে প্রদত্ত মতামতের বিভিন্ন দিক যাচাই করে দেখা, পরীক্ষা করা। উপস্থাপিত মতামতসমূহ পরীক্ষা করে তার কোনো একটা গ্রহণ করা। ব্যাপারটি যখন সিদ্ধান্তের পর্যায়ে এসে উপনীত হয়, তখন শূরার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়, শুরু হয় তার বাস্তবায়ন আর কার্যকর করার পালা এবং কঠোর দৃঢ়তার সংগেই তা করতে হয়। এটা পুরোপুরি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর এখানে এসে বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সোপর্দ করতে হবে। কেননা তিনি যা চান সে পরিণতির দিকেই তাকে নিয়ে যাবেন। তিনি মতামত দান করার বিষয়টা উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। চরম সংকটময় মুহূর্তে শূরার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে ঝুঁকি নিতে হয়, তাও তো তাঁরই শিক্ষা। তেমনিভাবে সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্যায় অতিক্রম করে আল্লাহর ওপর নির্ভর করার এবং আল্লাহর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার সবক দিয়েছেন।

অতপর রসূল (স.) মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষেই সিদ্ধান্ত দিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করে নিজে বর্ম পরিধান করলেন এবং উম্মতকেও তা পরিধান করার নির্দেশ দিলেন। অথচ তিনি জানতেন, এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা কি বিপদাপদ বরণ করতে আর কোরবানী দিতে যাচ্ছেন, তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিলো। ব্যাপারটিতে ইতস্তত করায় তা বীরত্ব প্রদর্শনকারীদের মাঝে আর একবার চিন্তা করার সুযোগ এনে দেয়। তারা ভয় পেয়ে যায়, নবী বুঝি তাদের প্রস্তাব না পছন্দ করেছেন। তখন তারা মদীনা থেকে বের হওয়া বা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুর মোকাবেলা করার বিষয়টি তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতেত সিদ্ধান্ত পালটানোর সুযোগ এলেও নবী আর ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন না। এ গোটা বিষয়টাতে একটা শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর ইচ্ছা, আর এ শিক্ষা হচ্ছে, পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা। একবার দৃঢ়সংকল্প নেয়ার পর তা কার্যকর করার শিক্ষা। আল্লাহর ওপর নির্ভর করে এবং তাঁর সমীপে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করেই এটা করতে হবে। নবী তাদের এ শিক্ষাই দিতে চান যে, শূরা বা পরামর্শের জন্যে একটা সময় থাকে। একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে এরপর ইতস্তত করা বা নতুন করে মত বদল করার কোনো সুযোগ থাকে না। আল্লাহ তায়ালা এ নির্ভরশীলতাকেই ভালোবাসেন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'নিসন্দেহে যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন।' (আলে ইমরান, ১৫৯)

আল্লাহ তায়ালা এ স্বভাবকে ভালোবাসেন, আল্লাহর ওপর নির্ভর করা এবং সব কিছু তাঁর ওপর সোপর্দ করা ইসলামী জীবনধারার সর্বশেষ মানদন্ড, আর এটি হচ্ছে এমন এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা, যা মেনে নিয়েই মুসলমানদের কাজ করতে হবে।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

ইসলামী আন্দোলনের সফলতা যেসব শর্তের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্ব একটি অন্যতম বিষয়। অন্য সকল শর্ত পূরণ থাকা সত্ত্বেও অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে একটি জীবন্ত আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। নেতৃত্বের আমানত হাসিলের জন্যে যেসব গুণের প্রয়োজন, তার প্রথমটি হচ্ছে যাবতীয় আবিলতা থেকে জীবনের পরিচ্ছন্নতা, কলুষ-কালিমা থেকে জীবনকে পবিত্র রাখা এবং বিশৃংখলা ও ভারসাম্যহীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। তারপর প্রয়োজন 'আমর বিল মা'রূফ' (ভালো কাজের নির্দেশদান) ও 'নাহী আনিল মুনকার' (অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা)। সংক্ষেপে এ গুণগুলো থাকলে নিজেদের সেই উম্মত বা জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা সম্ভব, যাদের মানবমন্ডলীর পরিচালক বানানোর জন্যে তৈরী করা হয়েছে। এই সর্বোত্তম জাতি বানিয়ে দেয়াটা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়। কিছু সৌজন্য বিনিময় বা ভালোবাসা বিনোদনের গুণ অথবা স্রেফ মানুষকে আকৃষ্ট করার মতো কিছু আচার আচরণ কিংবা কথার যাদু দ্বারা মানুষকে মোহাবিষ্ট করার যোগ্যতা দিয়েও সে মহান যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়, যার দ্বারা গোটা মানবজাতির ওপর নেতৃত্ব করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন মেকি ও ঠুনকো জিনিসের বিনিময়ে এতো বড় গুরুদায়িত্বের বোঝা কাউকে দান করেন না। কিছু খেতাব বা সম্মানসূচক পদবী, উপাধি বা পদমর্যাদা দানের মাধ্যমেও সেই মহিমান্বিত গুণ অর্জিত হয় না, যা বিশ্বনেতৃত্বের আসল প্রয়োজন মিটাতে পারে। যেমন আহলে কেতাবরা বলতো, আমরা তো আল্লাহর ছেলে এবং তাঁর প্রিয়পাত্র। না, মোটেই ঠিক নয়, এগুলো আসলে নেতৃত্ব হাসিলের কোনো গুণ নয়। এ গুণের অধিকারী হতে হলে মানবসমাজকে অন্যায় অবিচার, পাপ পংকিলতা থেকে রক্ষা করার জন্যে অবশ্যই ইতিবাচক কিছু ভূমিকা রাখতে হবে– ন্যায় ও সদগুণাবলীর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব কিছুর সাথে সেই বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী হতে হবে, যা ভালো কাজ করার প্রবণতাকে সুতীক্ষ্ম করে এবং মন্দ কাজ বিদূরিত করার উদ্দেশে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, নেতৃত্বদানের জন্যে তোমরা অবশ্যই ভালো ও কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেবে এবং যাবতীয় মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ বন্ধ করার জন্যে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে। এসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের অবশ্যই আল্লাহর ওপর নিজেদেরও অবিচল বিশ্বাসী থাকতে হবে।

সর্বোত্তম জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্যে অন্যান্য ক্লান্তি ও কন্টকাকীর্ণ পথে চলার যোগ্যতাসহ অবশ্যই এ গুণগুলো অর্জন করতে হবে, অর্থাৎ যা কিছু অন্যায়-অশোভন, ক্ষতিকর বা মন্দ তা রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সর্বপ্রকার কল্যাণকর কাজ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সমাজকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার ও

অশান্তিকর কাজের গ্লানি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যে সকল ব্যবস্থা বিশৃংখলা বা উচ্ছৃংখলতা বয়ে আনতে পারে সেগুলোর দ্বার রুদ্ধ করে দিতে হবে, আল্লাহর দেয়া সেসব অবস্থা ও উপায় উপকরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যার কারণে জীবন সুন্দর ও সজীব হয়ে উঠবে।

সমাজ জীবনে ঈমানের অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে, এর প্রতিটি স্তরে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনের সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং শুধু মুখে মুখে নয়; বরং বাস্তব কর্মকান্ডের মাধ্যমে ভালো ও মন্দ ব্যবস্থার পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। নেতৃত্ব হাসিলের জন্যে সংগঠন ও সংগঠন-পদ্ধতি এবং কিছু সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি জানাই যথেষ্ট নয়। গোটা সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় উৎখাতের বাস্তব ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শুধু সংগঠন আর সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চালু করলেই অশান্তি ও বিশৃংখলা দূর করা সম্ভব নয়। এমনকি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রক্রিয়া অব্যাহত না রেখে নিছক একটানা সংগঠন দাঁড় করিয়ে রাখলে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের প্রভাবে বহু লোকের মধ্যে অহংকারী মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে। অতএব, সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে সাথে নিজ নিজ পরিবেষ্টনীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিকার, গুণীজনের কদর, হীনমন্যতা, নীচুতা ও মন্দ ব্যবহার দমন করা, ভালো কাজকে উৎসাহিত করা ও অপ্রিয় কাজগুলো দাবিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চালু রাখতে হবে। কারণ, যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা মানুষের গতানুগতিক ভালো মানুষীপনার থেকে তা অনেক উর্ধে। ওপরে বর্ণিত কাজসমূহ প্রতিষ্ঠা সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে দ্বিতীয় মাইলফলক।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর অবিচল বিশ্বাস ও তাঁর শক্তি-ক্ষমতার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখা, মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে স্রষ্টার সাথে তার সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে ঈমান এ কাজটাই করাতে চায়। এটিই মানবজীবনের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সৃষ্টিজগতে তার প্রকৃত কাজ ও কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য এটা-ই। সাধারণত এ চিন্তাধারা থেকেই নৈতিক চরিত্রের মূলনীতি উদগত হয় এবং সেসব মূলনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর গযব ও আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার আশা করা যায়। আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব মন-মগয ও বিবেকের মধ্যে পোষণ করা এবং সমাজ জীবনে তাঁর বিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্প, সেসব মূলনীতি জাগ্রত রাখার ওপরেই নির্ভর করে।

তারপর ঈমানের এটাও অন্যতম দাবী যে, প্রত্যেক মোমেন অন্য মানুষকে ভালোর দিকে ডাকবে, যার জন্যে বলা হয়েছে, 'তারা নেক কাজের প্রতি আহ্বানকারী এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধকারী।' তাদের কর্তব্য হচ্ছে, সে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে এবং এ পথের সকল কষ্ট তাদের বরদাশত করতে হবে। বলা হয়েছে, তারা দোর্দন্ড প্রতাপান্বিত, যালেম ও অহংকারী শাসকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হক কথা বলে, আর যখন উদভ্রান্ত যৌবন তাদের পাগল করে তোলে তখন তারা দুরন্ত যৌন

কামনা-বাসনার মোকাবেলা করে, তারা আত্মার পতনোন্মুখ অবস্থার মোকাবেলা করে, মোকাবেলা করে নড়বড়ে সংকল্পের এবং নানা প্রকার লোভ-লালসা ও উস্কানির, এর ফলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। সবকিছুর মোকাবেলা করার জন্যে ঈমানী শক্তিই আসলে তা প্রস্তুত করে। তাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা। সব সত্যের ওপর একথা সত্য যে, ঈমান ব্যতীত অন্য সব কিছুই একদিন ফুরিয়ে যাবে এবং ঈমানের প্রস্তুতি ব্যতীত অন্য সকল প্রস্তুতি মায়া-মরীচিকা ও পথভ্রষ্টকারী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অপর সকল সাহায্য খোকলা, তলাবিহীন ঝুড়ির মতো।

মুসলিম জামায়াতের একটি বড়ো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলিম জনপদ থেকে একটি দলকে অবশ্যই ইসলামের দাওয়াত দান করার জন্যে আশেপাশের এলাকা ও দেশগুলোতে প্রেরণ করতে হবে। এ দাওয়াতদানকারীরা মানুষকে ভালোর দিকে ডাকবে, কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেবে এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে। এ দূরূহ কাজের সময় তাদের একমাত্র হাতিয়ার ও রসদ হবে আল্লাহর ওপর ঈমান। ঈমানের এ হাতিয়ার তাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করবে এবং এ হাতিয়ার মজুদ থাকলে তাদের কাছে অন্য সবাই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে, এর অভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা আসবে না এবং ইসলামের গুণাবলীও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না।

একথার সপক্ষে কোরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা এসেছে। হাদীস শরীফেও এভাবে রসূল (স.)-এর নির্দেশ বহনকারী এক দল লোকের খবর জানা যায়, আমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি মাত্র এখানে তুলে ধরছি।

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখে তাহলে তার কর্তব্য হবে, সে যেন শক্তি দিয়ে তা দূর করে, যদি সে সেটা না পারে তাহলে যেন সে তার জিহ্বা (কথা) দ্বারা তা দূর করে এবং এতোটুকু করার শক্তি-ক্ষমতাও যদি তার না থাকে, তাহলে সে যেন তার অন্তরে তা (ঘৃণা) করে। তবে এটুকু করা তার দুর্বলতম ঈমানের পরিচয় বহনকারী হবে। (মুসলিম)

২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.) এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈল জাতি অন্যায় ও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যকার ওলামায়ে কেরাম তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন এবং সেসব অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তারা অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয় না। তারপর সেই আলেমরা তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে উঠাবসা করতে থাকে, খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠানেও তারা তাদের সাথে শরীক হয়, এর ফলে তাদের অন্তরগুলো একে অপরের ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে এবং অন্যায়কারীদের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে দাউদ, সোলায়মান ও মূসা (আ.)-এর ভাষায় তাদের ওপর অভিসম্পাত দেয়া হয়। এতটুকু বলার পর রসূলুল্লাহ (স.) উঠে সোজা হয়ে বসলেন। এর আগে তিনি ঠেস দিয়ে বসে

ছিলেন। তারপর বললেন, 'না, তাদের সাথে কিছুতেই মেলামেশা করা যাবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাদের বাঁকিয়ে সোজা পথে নিয়ে আসবে, অর্থাৎ মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো সহজ সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না।'

৩. হোযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম খেয়ে আমি বলছি, অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ করতে মানুষকে নিষেধ করবে, তা না হলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি এ কাজ না করার শাস্তি স্বরূপ গযব নাযিল করবেন বলে আশংকা রয়েছে। তখন তোমরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া তিনি কবুল করবেন না। (তিরমিযী)

৪. উরস ইবনে ওমায়রাতুল কেন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.) এরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে কোনো অন্যায় সংঘটিত হওয়ার স্থানে উপস্থিত থেকেও যদি সে অন্যায়কে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, তাহলে সে পাপাচারের কাছে উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত বলে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি দূরে থেকেও সে অন্যায় সম্পর্কে জানলো এবং সন্তুষ্টচিত্তেও তাকে মেনে নিলো, তার অবস্থা হবে সে ব্যক্তির মতো, যে এ অন্যায় দেখেও কোনো প্রতিবাদ করলো না। (আবু দাউদ)

৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে যালেম শাসকের সামনে 'হক' কথা বলা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, শহীদদের এক নেতা হচ্ছেন হামযা আর এক নেতা সে ব্যক্তি, যে যালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে হক কথা বলে, তাকে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্যে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জোরালোভাবে কথা বলতে থাকে, ফলে সে যালেম শাসক তাকে কতল করে দেয়। (হাকেম)

এগুলো ছাড়াও এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস আছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি মুসলিম জনপদের মধ্যে এই কর্তব্যবোধ পয়দা করার জন্যে প্রেরণা জোগায় যে, মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যেও মূলত এ কর্তব্য পালন করা জরুরী। অবশ্য এজন্যে ব্যাপক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত কোরআনের শিক্ষা প্রচুর পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা সাধারণভাবে সে শিক্ষা থেকে গাফেল হয়ে আছি। তার মূল্যবোধ ও তাৎপর্য আমরা যথাযথভাবে বুঝতে পারি না।

আল্লাহর নির্বাচিত দলটির বৈশিষ্ট্য

মুসলমানদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের মানবজাতির ভেতরে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। তবে যদি তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অলসতা করে, দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, এ দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এ দায়িত্ব অন্য কারো দ্বারা পালন করাবেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ۗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

'হে মানুষ, তোমরা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো, তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে (মোরতাদ হয়ে) ফিরে আসে (তাতে আল্লাহ তায়ালার কোনো ক্ষতি নেই), আল্লাহ তায়ালা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন, তিনি যাদের ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, (তারা হবে) মোমেনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার তারা পরোয়া করবে না; (মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞার আধার।' (আল মায়েদা, ৫৪)

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহর মনোনীত এ মোমেন দলটির গুণাবলীর বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ

'আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে।' (আল মায়েদা, ৫৪)

এ কথা বলে তিনি তাদের সেই পরিবেশে ছেড়ে দেন, যার প্রয়োজন মোমেনের হৃদয় অনুভব করে। মোমেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ কঠিন দায়িত্ব যখন গ্রহণ করে, তখন সে একে মহান আল্লাহর এক অপার অনুগ্রহ ও সদয় মনোনয়ন বলে মনে করে। অতপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনের অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করছেন–

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

'তারা মোমেনদের প্রতি সদয় ও দরদী ও কাফেরদের প্রতি কঠোর।' (আল মায়েদা, ৫৪)

অর্থাৎ উদার, মহানুভব, সহানুভূতিশীল, সহজ সরল, কোমল, নমনীয়, অমায়িক, মিশুক ও স্নেহময়। কোনো মোমেনের সাথে আচরণে উদ্ধত নয়, ধৃষ্ট নয়, কঠোর নয়, নিষ্ঠুর ও কপট নয়।

মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সহজ সরল ও অমায়িক আচরণে হীনতা বা অপমানের কিছুই নেই। এটা নিছক ভ্রাতৃত্ব, যা পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের পরিবর্তে নৈকট্য আনে, মেলামেশার প্রতিবন্ধকতা ও আড়ম্বর দূর করে, পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর করে ও অন্তরের সাথে অন্তরের মিল সৃষ্টি করে। ফলে কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে

না, কেউ কারো নাগালের বাইরে থাকে না এবং কারো প্রতি কারো বিদ্বেষ, তিক্ততা বা অপ্রীতি থাকে না।

আসলে যে জিনিস মানুষকে তার দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বা অহংকারী বানায় তা হচ্ছে তার আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও অহমবোধ। সে যদি তার মোমেন ভাইদের সাথে মিলেমিশে যায়, তাহলে দূরত্ব ও অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেনই বা থাকবে? তারা তো আল্লাহর জন্যেই একত্রিত হয়েছে, যাতে তিনি তাদেরকে এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে। তারা এ মহান ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নিয়ে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারে।

অন্যদিকে তাদের মধ্যে কাফেরদের প্রতি একটা অনীহাবোধ ও কঠোরতা থাকে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর আত্মপ্রকাশের স্থান এটাই। কাফেরদের ওপর প্রবল ও পরাক্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য নিজের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা বাগানো বা ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা নয়; বরং আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। কাফেরদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, তাদের কাছে যে আদর্শ রয়েছে, তা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আর এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসরণ করা কল্যাণকর বলে সবাইকে তা পালনে বাধ্য করা জরুরী মনে করে, অন্যদের নিজের স্বার্থের এবং নিজেকে অন্যদের স্বার্থের তল্পিবাহী করার জন্যে নয়। তা ছাড়া মানবরচিত মতবাদের ওপর আল্লাহর দ্বীনের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী, আল্লাহর শক্তি যে দুনিয়ার সকল শক্তির ওপর বিজয়ী হবেই এবং আল্লাহর দল যে অন্য সকল দলের ওপর বিজয়ী হবেই, সেই প্রত্যয়ও কাফেরদের ওপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ববোধের উৎস। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় মুসলমানরা কোনো কোনো যুদ্ধে হেরেও যেতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তারাই শ্রেষ্ঠ।

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ

'তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং তাতে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না।' (আল মায়েদা, ৫৪)

বস্তুত তাদের সংগ্রাম আল্লাহর পথে, অর্থাৎ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার পথে, তাঁর আইন ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পথে, যাতে মানুষের ইহ-পরকালের সর্বাংগীণ কল্যাণ, সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। এটাও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহর মনোনীত মোমেনদের বৈশিষ্ট্য।

লক্ষণীয়, এখানে 'আল্লাহর পথে লড়াই করে' বলা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্যে নয়, নিজেদের জাতির, দেশের ও বংশের রক্ষার জন্যে নয়। 'আল্লাহর পথে' অর্থ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে, তাঁর আইন ও শরীয়ত চালু করার জন্যে, মানবজাতির সর্বাংগীণ কল্যাণের জন্যে, এতে মুসলমানদের নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই।

মোমেন মুসলমানরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেনইবা ভয় করবে? তারা তো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে। সমাজের মেকি রীতিনীতি,

সমাজের রুচি ও জাহেলিয়াতের কৃষ্টি দিয়ে তাদের কী কাজ? তারা তো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছে এবং সমাজ জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। মানুষের নিন্দার ভয় তো সে ব্যক্তির করার কথা, যার আইন কানুন ও মানদন্ডের উৎস মানুষের কামনা বাসনা ও মানবরচিত বিধান এবং যে মানুষের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর মানদন্ড ও মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে এবং তাকে মানুষের মানদন্ড, মূল্যবোধ ও কামনা বাসনার ওপর আধিপত্যশীল এবং কর্তৃত্বশীল করতে চায়, যে ব্যক্তি নিজের শক্তি ও সম্মান আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করে, সে কে কী বললো ও কে কী করলো তার কোনো পরোয়া করে না, চাই যতো প্রতাপশালী, যতো ক্ষমতাবান এবং যতো উচ্চাংগের সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারীরাই তা বলুক বা করুক না কেন।

আমরা মানুষের কথা, কাজ, শক্তি, সম্পদ, প্রতিপত্তি, রীতিপ্রথা, বিচার বিবেচনা, মানদন্ড ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি শুধু এজন্যে যে, আমরা সেই আসল সত্য ভুলে যাই, যার ভিত্তিতে আমাদের যাবতীয় বিচার বিবেচনা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত। সেই সত্য হলো আল্লাহর হুকুম, বিধান ও শরীয়ত। একমাত্র আল্লাহর বিধান ও তার শরীয়তই সত্য, আর যা কিছুই তার বিরোধী তা বাতিল ও মিথ্যা, চাই তা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকুক এবং হাজার হাজার বছরব্যাপী মানব প্রজন্মগুলো তাকে মেনে নিক ও কার্যকর করুক।

কোনো প্রচলিত ব্যবস্থা, বিধান, রীতিপ্রথা বা মূল্যবোধের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক তা গ্রহণ, পালন ও বাস্তবায়ন ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন। ইসলামী বিধানের কাছে কোনো রীতিপ্রথা, বিধি ব্যবস্থা বা মূল্যবোধের গুরুত্ব বা গ্রহণযোগ্যতা থাকে কেবল তখনই, যখন তা আল্লাহর বিধান থেকে উদ্ভূত হবে। কেননা একমাত্র সেই বিধান থেকেই যাবতীয় রীতিনীতি, মানদন্ড ও মূল্যবোধ গৃহীত হয়ে থাকে।

এ কারণেই মোমেনরা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় পায় না। এটা আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত মোমেনদের বৈশিষ্ট্য।

আর আল্লাহর মনোনীত ও প্রিয় বান্দা হতে পারা, ওই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া, তাদের অন্তরাত্মার প্রশান্তি ও নিরাপত্তাবোধ এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথে তাদের জেহাদ করা– এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। আয়াতের শেষাংশে তাই বলা হয়েছে–

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

‘এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে দেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সুপ্রশস্ত ও মহাজ্ঞানী।’ (আল মায়েদা, ৫৪)

অর্থাৎ সুপ্রশস্ত ভান্ডার থেকে তিনি সব কিছু দিয়ে থাকেন এবং যাই দেন জেনে শুনে জ্ঞাতসারেই দেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যাদের নিজ জ্ঞান ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে মনোনীত করেন, তাদের যা দেন তার মতো ব্যাপক দান আর কী হতে পারে?

মানবজাতির নেতা হিসেবে মোমেনদের কিছু বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যেই একমাত্র আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকার চেতনা থাকা একান্ত জরুরী। এই একনিষ্ঠ আনুগত্যের ফলেই সে প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের অন্য কোনো দাবীদারদের সামনে তার মাথা নত করবে না। তার অন্তর থাকবে নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত, নির্ভীক। সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও কাছে কিছু পাওয়ার আশা রাখবে না বা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয়ও করবে না। দুঃখ দুর্দশা ও জীর্ণদশার মধ্যে সে একজন বলিষ্ঠ সৈনিকের মতোই অবিচল থাকবে এবং শান্তি-সমৃদ্ধি ও উন্নতির দিনগুলোতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাভরা মন নিয়ে সে থাকবে হৃষ্টচিত্ত। নেয়ামতভরা সুদিনের নাগাল পেয়ে সে যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যা খুশী তাই করবে না, তেমনি দুঃখভরা দুর্দিনের আগমনে কষ্টের বোঝা বইতে না পেরে নিজেকে মুষড়ে পড়তে দেবে না। সাধারণ মানুষের জন্যে তো বটেই, একজন নেতা বা পরিচালকের জন্যে তাওয়াক্কুলের এই বলিষ্ঠ গুণটি আরও বেশী জরুরী। কেননা সে সত্যসন্ধানীদের যাবতীয় দায়িত্বভার বহন করে থাকে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুরা আশ শূরাতে আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডাবাহী দলটির গুণ বর্ণনা করেছেন। এ গুণাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ ج
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ج وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ

যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে, (বিশেষ করে) যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা (অন্যদের ভুল) ক্ষমা করে দেয়, যারা তাদের মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, নামা প্রতিষ্ঠা করে, যাদের কাজকর্মগুলো (সম্পাদনের সময়) পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের (কর্ম)-পন্থা, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে, যারা (এমনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে,) যখন তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (আশ শূরা, ৩৭-৩৯)

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

'আর যারা বড়ো বড়ো গুনাহ এবং লজ্জাকর কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকে।' (আশ শূরা, ৩৭)

যে সমাজে লোভ লালসার প্রতিযোগিতা চলছে, যেখানে ইন্দ্রিয়লিপ্সার হাতছানি মনকে উদাস করে দেয়, যেখানে অসংখ্য লোভনীয় বস্তু হৃদয়কে প্রলুব্ধ করে, সেখানে সত্যসন্ধ একদল আদম সন্তান সকল কিছুর আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করে বড়ো বড়ো অপরাধজনক কাজ ও লজ্জাকর আচরণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে, এটা কিছুতেই চাট্টিখানি কথা নয়, নয় এটা কোনো সহজ ব্যাপার। এর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

বলিষ্ঠ ঈমানের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এটা অবশ্যই একটা লক্ষণ যে, মানুষ কবীরা গুনাহসমূহ ও লজ্জাকর যাবতীয় আচার আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচায়। আর অন্যদের সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব তারাই বহন করতে পারে যারা অন্যান্য গুণসমষ্টির সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে উপরোক্ত গুণ দুটিরও অধিকারী হয়। কোনো ব্যক্তি কবীরা গুনাহ বা পার্থিব জীবনের এমন কোনো অন্যায় কাজ, যা দ্বারা নিজ স্বার্থের কারণে অপরকে কষ্ট দেয়া হয়, এমন ধরনের অপরাধের মুখোমুখি হয়ে যদি ঈমানের দাবী অনুযায়ী কেউ তার অন্তরকে সাফ ছুতরা বা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন না রাখতে পারে, তাহলে সত্যসন্ধানী জামায়াতের নেতৃত্বে সে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না বা সঠিকভাবে নেতৃত্বও দিতে পারে না।

সেই যমানায় একটি মোমেন জামায়াত উল্লেখিত গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, বিশেষ করে রসূল কর্তৃক পরিচালিত একদল লোকের মধ্যে যারা সেই উন্নত মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, যার দিকে এ মহাগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রথম দলটি উল্লেখিত গুণাবলীর পুরোপুরি অধিকারী হওয়ায় সমগ্র মানবমন্ডলীকে পরিচালনা করার যোগ্যতাও তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন যোগ্যতার অধিকারী তাঁরা হয়েছিলেন যে, তাদের পূর্বে বা পরে অনুরূপ যোগ্যতা আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ নশ্বর মানুষের দুর্বলতা জানেন। এ জন্যে তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন নেতৃত্ব দান করার জন্যে কোন কোন গুণের প্রয়োজন। তিনিই জানেন এর কোন কোন গুণ তিনি তাকে দিয়েছেন। সে গুণগুলো হচ্ছে বড়ো বড়ো গুনাহ, লজ্জাকর স্বভাব ও কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা। এই পরিহারযোগ্য দোষের মধ্যে ছোটো ছোটো গুনাহ ও সাধারণ অপরাধকে গণ্য করা হয়নি। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার মেহেরবানীর ভান্ডার এতো প্রশস্ত যে সেখানে এসব ছোটোখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি ও মামুলি অপরাধগুলো গোনা হয় না, কারণ তাঁর বান্দার শক্তি-সামর্থ ও দুর্বলতা তাঁর থেকে বেশী আর কে জানে। বান্দার মধ্যে লজ্জানুভূতি থাকা– এটা তার নেককার বান্দার জন্যে আল্লাহর দেয়া এক বিশেষ মেহেরবানী। এ গুণটি তাকে দেয়া একটি মোহনীয় আকর্ষণ। উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু না থাকলেও এ গুণটিই তাকে সবার মাঝে প্রিয় করে তোলে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে প্রদত্ত বান্দার প্রতি উদারতা ও মহানুভবতা যেখানে মানুষকে লজ্জাবনত বানায়, সেখানে তাঁর ক্ষমাশীলতা মর্যাদাবান মানুষের মধ্যে লজ্জাবনত ভাব আনে। এর ফলে 'যখন তারা রেগে যায়। তখন (প্রতিশোধ না নিয়ে) তারা মাফ করে দেয়।'

করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষের ছোটোখাটো দোষ-ত্রুটি ও ভুল ভ্রান্তি ধরবেন না বলে আলোচ্য আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে যে ইশারা দিয়েছেন এবং তার পর পরই তাদের মধ্যে যে ক্ষমাশীলতার গুণটি থাকার কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে পরোক্ষভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ রব্বুল ইযযত বান্দাদের মধ্যে দয়া প্রদর্শন ও ক্ষমা করার গুণ বিদ্যমান

থাকা খুবই পছন্দ করেন। আর এ জন্যেই এটা মোমেনদের অন্যতম প্রধান গুণ হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে নাযিল করছেন–

وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ

'যখন তারা রাগ করে তখন তারা মাফ করে দেয়।' (আশ শূরা, ৩৭)

অর্থাৎ, রাগ করার পর ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর প্রশংসিত বান্দা হওয়ার মহান আশায় কারো দ্বারা অনুরুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তারা নিজেদের থেকেই মাফ করে দেয়।

এইভাবে এ মানুষের মাধ্যমে আর একবার ইসলামের মহানুভবতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। তার মহামূল্যবান শিক্ষা সমুজ্জ্বল হয়। ইসলাম মানুষকে এমন কোনো নির্দেশ দেয় না, যা পালন করা তার সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তিনিই সবার ও সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কাজেই তিনি ভালো করেই জানেন, ক্রোধ মানুষের সহজাত এক স্বভাব, যা তার প্রকৃতির মধ্য থেকেই উদিত হয়। এই জন্যেই এ বৃত্তিটি সর্বদা এবং সর্বৈব মন্দ হতে হবে তা জরুরী নয়। এ জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে, এবং তাঁর দ্বীন কায়েম করার উদ্দেশে এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে অবশ্যই এটা এক বাঞ্ছিত গুণ, এরই মধ্যে যে কাজের জন্যে এর প্রয়োগ প্রয়োজন সেখানে তা করা হলে ক্রোধও একটি বড়ো গুণ বলে বিবেচিত হবে এবং সে অবস্থায় মোটেই তা হারাম বা কোনো অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না; বরং স্বভাবের মধ্যে এ গুণটি তখন হবে অত্যন্ত কল্যাণবহ। তখন মানুষ ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথবা দ্বীনী কোনো ব্যাপারে বিরোধ বাধলে ক্ষমা করতে সক্ষম হবে। দেখা যায়, একই অপরাধে একজন বে-ঈমান ক্ষমা করতে পারে না, কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি পারে। কারণ ঈমানদার ক্ষমাশীলতাকে একটি দৃষ্টান্তমূলক সওয়াবের কাজ মনে করে। মনে করে এ গুণটি ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। যেহেতু রসূল (স.) থেকে সে জানতে পেরেছে, তিনি নিজের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে কখনও কারও ওপর রাগ করেননি। তিনি আল্লাহর জন্যে রাগ করেছেন, আর আল্লাহর জন্যে যখন তিনি রাগ করেছেন তখন তাঁকে কেউ থামাতে পারেনি। তবে এটা সত্য, মোহাম্মদ (স.)-এর জন্যে ছিলো এটা মহা উঁচু মর্যাদার স্তর, তাঁর মতো ধৈর্যশীল ও ক্ষমা করার যোগ্যতা আর কারো আসবে না এবং আল্লাহ তায়ালাও অন্য কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাছে সে পরিমাণ ক্ষমাশীলতা দাবী করেন না। তিনি সাধ্যের বাইরে কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দেন না, কেউ ইচ্ছা করলেও তাঁর মতো ক্ষমাশীল হতে পারবে না। তাই মোমেনদের জন্যে হুকুম হচ্ছে, রাগের সময় সাধ্যমতো ক্ষমা করার এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে যাবে।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ

'আর যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেবে।' (আশ শূরা, ৩৮)

এভাবে মোমেনরা তাদের ও তাদের রবের মধ্যে অবস্থিত সম্পর্ক স্থাপনের গোপন বাধা বিপত্তিগুলো দূর করতে সক্ষম হয়েছিলো। আসলে মানুষে মানুষে এবং মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পথে ক্রোধ অবশ্যই একটি বড় বাধা। কাজেই বাস্তবেও দেখা যায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বান্দার ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাস, ব্যক্তিগত রুচি, ক্রোধ ও উত্তেজনা অনেক সময় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে বাইরের বাধা যাই থাকুক না কেন, ভেতরের বাধাও কিছু কম নয়। মানুষের নানাপ্রকার ঝোঁক প্রবণতা আছে, আছে লোভ লালসা, আছে অলসতা ও শয়তানী প্রবণতা, আছে আত্মম্ভরিতা, আবেগ উচ্ছ্বাস ও ক্রোধ। এসব কিছুই মানুষের অস্তিত্বের সাথে জড়িত। এগুলোর আকর্ষণ থেকে যখন মানুষ মুক্ত হতে পারে তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সকল পথ তার সামনে খুলে যায়। আর তখনই সে নির্বিঘ্নে তার মালিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়। সে তখন তার মালিকের সকল আহ্বানে সাড়া দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন আল্লাহর কোনো নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে তার আভ্যন্তরীণ কোনো বাধা আর তাকে থামাতে পারে না। এভাবে সাধারণত মানুষ তার রবের আনুগত্য করে থাকে। এবারে সুনির্দিষ্টভাবে আনুগত্যমূলক কিছু বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ

'আর তারা নামায কায়েম করে।' (আশ শূরা, ৩৮)

এই পবিত্র দ্বীন ইসলামের মধ্যে নামাযের স্থান অতি উচ্চে। যখন কোনো ব্যক্তি কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই তার ওপর শাহাদাতের বাস্তব প্রমাণস্বরূপ প্রথম নামাযের হুকুম এসে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হওয়ার যে ঘোষণা সে কথা আকারে দিয়েছিলো, সেটা বাস্তব কাজ রুকু-সাজদার মাধ্যমে প্রমাণিত করে সে জানায় যে, সবাইকে ছেড়ে, সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ব্যক্তিসত্তার সর্বোচ্চ অংগ-মাথা আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে তাকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলে ঘোষণা দেয়। নামাযের মাধ্যমে বান্দা তার মনিবের দরবারে এসে হাযির হয়। এভাবে রবের সাথে আবদ (বান্দা) এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারপর মোহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহর রসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' উচ্চারণের মাধ্যমে। এক কাতারে দাঁড়ানো এবং একই সাথে রুকু সাজদার মাধ্যমে মানুষের সাম্য ঘোষণা করা হয়। এ সময়ে কেউ কারও আগে বা পরে মাথা উত্তোলন করে না। আর হয় তো এ সাম্যের কথা বলতে গিয়েই যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একামাতে সালাতের পর শূরা বা পরামর্শ করার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

'আর তাদের কাজ হবে তাদের নিজের মধ্যে পরামর্শভিত্তিক।' (আশ শূরা, ৩৮)

এখানে ব্যাখ্যায় এ কথাই আসে যে, তাদের জীবনের সকল কাজই পরামর্শভিত্তিক হতে হবে। সবখানেই এই পরামর্শের রং ছড়িয়ে পড়বে। জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যিন্দেগীতে, অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই নাযিল হয়েছে। সুতরাং এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আরও বেশী গুরুত্ব সহকারে মুসলমানদের জীবনের সর্বত্র পরামর্শের এ ধারা চালু হতে হবে। যদিও পরবর্তীতে ঠিক সেই অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র আর কায়েম হয়নি, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত চালু ছিলো।

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের বহু বৈশিষ্ট্যই ইসলামী জামায়াতের মধ্যে বর্তমান থাকে। নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার ছাড়া ইসলামী জামায়াতের মধ্যে পূর্ব থেকেই অন্যান্য সকল রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এ জন্যে সেখানে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত তেমনি করেই নিতে হবে, যেমন মক্কী স্তরে রাষ্ট্র পাওয়ার আগে নেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামী জামায়াতের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের এমন বহু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, যেসব বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোনো কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি। পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকুক আর নাই থাকুক, যেখানে ইসলামী জামায়াত থাকবে সেখানে জামায়াতী সকল সিদ্ধান্তই পরামর্শভিত্তিক হতে হবে। এ জন্যেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নাযিলকৃত সূরায়ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে পরামর্শ করা যতো জরুরী, তার থেকে বেশী জরুরী হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না থাকাবস্থায়। এ ব্যাপারে আলোচ্য সূরা সুস্পষ্ট হুকুম নাযিল হওয়ায় ওপরের কথা আরও অধিক প্রামাণ্য বলে বুঝা যায়। ইসলামী জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এ কথার গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে পরিচালনার জন্যে যে জামায়াতকে পছন্দ করা হবে, তার জন্যে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়ার রীতি অভ্যাস থাকা এক বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হবে; বরং পরিচালক হওয়ার জন্যে এ গুণ অপরিহার্য।

শূরার বা পরামর্শ সভার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত এমন কোনো স্থির ও স্থায়ী বিষয় নয় যে, কোনো ইস্পাত কঠিন ফর্মার মধ্যে ফেলে দিয়ে তা নির্মাণ করা হয়েছে, যার পরিবর্তন খুবই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ কোনো যমানার কিছুসংখ্যক লোক কর্তৃক বিশেষ কোনো পরিস্থিতির আলোকে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, এ জন্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা যেন কোরআন হাদীসের অকাট্য সিদ্ধান্ত বিরোধী না হয়, সে দিকে খেয়াল রেখে পরবর্তী পরিস্থিতিতে মুসলিম জনগণের প্রয়োজনে পরামর্শভিত্তিক যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার দ্বার চিরদিনের জন্যে খোলা রয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা এমন স্থূল নয়, নয় কোনো প্রাণহীন ও যুক্তিবিহীন শব্দসমষ্টি, যা

শুধু কথা আকারেই থেকে যাবে; বরং এ জীবনব্যবস্থা সত্যনিষ্ঠ ও শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্যে মানুষের করুণাময় মালিকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বাধিক কল্যাণকর ব্যবস্থা, যা মানুষের হৃদয়ে ঈমানের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছে। যারা এ প্রস্রবণ থেকে আকণ্ঠ পান করেছে তারা এর মাধুর্যে আপ্লুত হয়েছে। তাদের চেতনা ও ব্যবহারিক জীবন এ ব্যবস্থার মনোহর রংয়ে রঞ্জিত হয়ে গেছে।

বিশেষ কোনো চিন্তা ভাবনা না করে এবং আন্তরিকতার সাথে গভীরভাবে ঈমানের তাৎপর্য পর্যালোচনা না করে ইসলামের যে এলোপাতাড়ি সমালোচনা করা হয় বা এর সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যারা হঠকারিতাপূর্ণ উক্তি করে, তারা অবশ্যই কোনো ভালো কাজ করে না। তাদের বুঝা দরকার, ইসলামী ব্যবস্থা, ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন কোনো ভাসমান কথাসমষ্টি নয়। যারা ইসলামী আকীদা অনুযায়ী ঈমানের তাৎপর্য বুঝে না, তাদের কাছে হঠাৎ করে মনে হয় যেন এ ব্যবস্থার পেছনে বুঝি কোনো যুক্তি বুদ্ধি নেই।

অতএব জেনে রাখা দরকার, এ আকীদার মূলে রয়েছে এমন গভীর ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস, যা মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এ আকীদার ভিত্তিতেই এক শৃংখলাপূর্ণ সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রশ্ন হতে পারে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনো নিয়ম কানুন আছে যা মানুষের মন মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। যা যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা ও বাস্তব অবস্থার নিরিখে সবকিছুকে জীবনের উপযোগী করে পেশ করে এবং কোনো উপায়ে মানুষকে তা বশীভূত করে ফেলে। হ্যাঁ, এটা এই জন্যেই সম্ভব হয়েছে, যেহেতু ইসলামের সকল হুকুম আহকাম সবই মানুষের প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী। এ ব্যবস্থা মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো সমাধান করতেই এসেছে। এজন্যে ইসলামী ব্যবস্থা চালু হলে যেসব জটিলতার উদ্ভব হতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায়ে এমন যুক্তিসংগতভাবে সেগুলোর সমাধান দেয়া হয়েছে, যা মানুষ বুঝতে পারে এবং যার বাস্তবতা ও উপকারিতা মানুষ তার জীবনেই অনুভব করতে পারে। এ জন্যে পরামর্শের সুযোগ ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তারপর এমন সব আয়াত এবং রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে এমন সব হাদীস এসেছে, যা সেসব সমস্যার সমাধানের দিকে ইংগিত করেছে। এ জন্যে দেখা যায়, কোনো ইসলামী সংগঠন এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না যা একদম আনকোরা এবং যার সাথে কোরআন হাদীসের কোনো সংযোগ নেই। ইসলামী সংগঠন কোরআন ও হাদীস সামনে রেখে যখন পরামর্শ করে, তখন অবশ্যই তারা দেখতে পায়, অতীতের মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ কিছু সমস্যা ও তার সমাধান কিভাবে এসেছে। দেখা গেছে, ইসলামী সংগঠনের মধ্যে নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের অস্তিত্ব, যা সকল যমানাতেই বাস্তব অবস্থা সামনে রেখে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যবোধ রেখে পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান বের করতে সক্ষম হয়েছে। এটা যদি না হতো তাহলে মানুষের জীবন অচল হয়ে যেতো এবং সঠিক সমাধান দিতে না পারার কারণে মানুষ ইসলামের কার্যকারিতা সম্পর্কে হতাশ হয়ে এ মহান ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করতো, কিন্তু দুনিয়া দেখে নিয়েছে, অতীতে

যেসব দেশে বা অঞ্চলে ইসলামী ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সে সকল স্থানে শূরা বা পরামর্শ সভার মাধ্যমে ইসলাম সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিভাবে এবং কোত্থেকে ইসলাম এ সত্য সঠিক ব্যবস্থা পেলো? কোত্থেকে পেলো মানুষ এর সঠিক সন্ধান? এর জওয়াব হচ্ছে, ইসলামী ব্যবস্থা যখন এসেছে তখন সর্বপ্রথম এক ব্যক্তি এ ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এর উপযোগিতা প্রচার করেছে এবং নিজের জীবনকে ইসলামের এক বাস্তব নমুনা হিসেবে পেশ করেছে। তখন ধীরে ধীরে এ ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। অতপর এক মুসলিম জামায়াত এর আওতাভুক্ত হয়ে এর থেকে নিজেদের জীবনের সমাধান নিতে থেকেছে। এ ভাবে তারা বাস্তবে জানিয়ে দিয়েছে, এটিই একমাত্র ব্যবস্থা যা সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এরশাদ হচ্ছে–

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

'আর যা কিছু রেযেক তাদের আমি (মহান আল্লাহ) দিয়েছি, তার থেকে ওরা খরচ করে।' (আশ শূরা, ৩৮)

যাকাতের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কী যিন্দেগীতে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এ ভাবে মানুষকে সাহায্য করার জন্যে অর্থ ব্যয় উৎসাহিত করা হয়েছে। যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কিত আয়াত মক্কী যিন্দেগীতে নাযিল হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করা ও সুনির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় করার নির্দেশ এসেছে দ্বিতীয় হিজরী সালে, কিন্তু ইসলামী জামায়াত গঠিত হওয়ার পর অনেক আগে থেকেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবেদনা প্রদর্শনের কাজ চলে আসছিলো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের দান খয়রাত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যেন সমাজের সচ্ছল লোকেরা দরিদ্র আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে সাহায্য করার নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের কথা কেউ ভুলে না যায়।

দাওয়াতী কাজের জন্যে 'এনফাক' একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা হয় এবং তার সাথে যদি কিছু খরচ বা ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়, তখন দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কিছু পরিবর্তন আসে। মন নরম হয়, চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা দূর হতে থাকে। তখন দুনিয়াবী মহব্বত কমতে থাকে এবং আল্লাহর নেয়ামত লাভ করার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। যেহেতু ধন-সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তাই তিনি সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে তারতম্য রেখে দেখতে চান কে তাঁর মহব্বতে এবং তাঁর ওপর ভরসা রেখে তাঁর বান্দার প্রতি দরদ দেখায়। এ জন্যে 'এনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র মাধ্যমে ঈমানকে পূর্ণতত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়। মুসলিমদের দলবদ্ধ ঐক্য টিকিয়ে রাখার জন্যে সচ্ছল লোকদের 'এনফাক' বা দান খয়রাত করা অপরিহার্য। দলীয় জীবনের সংহতি বহুলাংশে এ উদার ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। দলীয় জীবনের অর্থই হচ্ছে দলের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি দরদী হবে,

একের দুঃখ দূর করার জন্যে অন্যরা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে এবং কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে পারস্পরিক একতার বন্ধনকে মযবুত বানাবে। আর এ বন্ধন ও দলীয় সংহতিকে তখনই পূর্ণত্ব দান করা সম্ভব হবে, যখন দলের সদস্যদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো আকাশ পাতালসম অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না, যেমন ইসলামের প্রথম যুগে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর মোহাজের ও আনসারদের অবস্থার মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকলেও তেমন আকাশ পাতালসম কোনো পার্থক্য থাকেনি। আনসাররা সে সময় কোনো চাপে পড়ে যে এভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা নয়; বরং তাঁরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের মহব্বতে এবং গভীরভাবে আখেরাতের যিন্দেগীতে বিশ্বাস থাকার কারণে সেই ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যখন আল্লাহর মহব্বত দুনিয়া এবং দুনিয়ার যে কোনো জিনিসের ওপর বিজয়ী হলো, মুসলমানদের পারস্পরিক ব্যবহার তার প্রমাণ পেশ করলো, তখনই তাদের ওপর যাকাত ফরয করার হুকুম রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর করার আদেশ নাযিল হলো।

সকল অবস্থাতেই আল্লাহর নেক ও প্রিয় বান্দা তথা মোমেন জামায়াতের মধ্যে উপরে আলোচিত গুণগুলো অপরিহার্য ও মহামূল্যবান গুণ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে, যার কারণে তারা সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ববাসীর নেতারূপে বরিত হবেন।

ইসলামী আন্দোলনকর্মীদের চারিত্রিক গুণাবলী

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ - وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'(হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো। কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, সাথে সাথেই তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও, অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন এবং (সবকিছু) জানেন।' (আল আ'রাফ, ১৯৯-২০০)

আয়াতগুলোতে নবী মোহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন প্রচারের পথনির্দেশনা, সংস্কার ও সংশোধন কৌশলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করেছেন। এটা শুধু নবী কারীম (স.)-এর জন্যেই খাস নয়; বরং তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা যুগে যুগে বিশ্বমানবতাকে সরল, সঠিক, সত্য, ন্যায়ের পথে আহবান করবে, তাদেরও এ একই কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

ইসলামের আহবায়কের জন্যে যে গুণ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তাকে কোমল স্বভাবের, সহিষ্ণু ও উদার হতে হবে। তাকে হতে হবে নিজের সংগী সহযোগীদের জন্যে স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের জন্যে দয়ালু এবং বিরোধীদের প্রতি সহিষ্ণু। তাই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আহবায়ক নবী করীম (স.)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে নবী, তুমি 'কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন

করো।' অর্থাৎ নিজের মাঝে ক্ষমা ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলো। সংগী সাথীদের চলন বলনের ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো, তাদের কাছে সকল কর্মের পরিপূর্ণতা আশা করো না, তাদের কষ্টসাধ্য চরিত্র অবলম্বনেও বাধ্য করো না। আর তাদের ভুল ভ্রান্তি ও দুর্বলতাগুলো সহজভাবে গ্রহণ করো, তাদের কাছে সুউচ্চ মান দাবী করো না। তবে ব্যবহারে এই কোমলতা প্রদর্শন এবং ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একমাত্র ব্যক্তিগত লেন-দেন ও চলন-বলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এতে ক্ষমা ও উদারতার কোনো অবকাশই নেই। ইসলাম লেন-দেন, সাহচর্য ও প্রতিবেশিত্বের ক্ষেত্রে উদারতা, কোমলতা ও ক্ষমার সুযোগ রেখেছে, যাতে মানুষের জীবন যাপন সহজ হয়। মানবিক দুর্বলতা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, তার প্রতি দয়াপরবশ হওয়া এবং তার সাথে উদারতা প্রকাশ করা, অসহায় এবং ছোটোদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া প্রভাবশালী ও বড়োদের কর্তব্য । নবী মোহাম্মদ (স.) হচ্ছেন পথপ্রদর্শক, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণদাতা। তিনি উদারতা, কোমলতা এবং ক্ষমা প্রদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। রসূলুল্লাহ (স.) নিজের ব্যক্তিগত কাজে কারো প্রতি কখনো ক্রোধ প্রকাশ করেননি, চরম উত্তেজনাকর অবস্থায়ও তিনি নিজের আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। বিরোধীদের কড়া ভাষা ও ভর্ৎসনা নীরবে সহ্য করে নিতেন।

নবী করীম (স.) এরশাদ করেন, আমার রব আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি যেন ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই ইনসাফের কথা বলি। যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ি, যে আমায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে তার অধিকার দান করি, যে আমার প্রতি যুলুম করে আমি তাকে মাফ করে দেই।' রসূল (স.) যে সকল বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তাঁর উম্মত থেকে যারা এ পথে মানুষদের আহবান করবে, তারাও সে বিষয়ে আদিষ্ট। কারণ আল্লাহর পথে আহবান করা এবং মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখানো অত্যন্ত বন্ধুর ও কষ্টকর। সুতরাং এক্ষেত্রে আহ্বানকারীকে উদারতা, মহানুভবতা, কোমলতা, সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। পক্ষান্তরে কর্কশ স্বভাব, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করতে হবে।

রসূল (স.) সাহাবীদের সম্বোধন করে আরো বলেন, 'তোমরা যেখানে যাবে, সেখানে তোমাদের পদার্পণ যেন লোকদের জন্যে সুসংবাদ বয়ে আনে, তা যেন লোকদের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার না করে। লোকদের জীবন যেন তোমাদের কারণে সহজ হয়, কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তায়ালা নিজে নবীর এ গুণের প্রশংসা ও তার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে অন্যত্র বলেছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

'এটা আল্লাহর এক (অসীম) দয়া, তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ, এর বিপরীত) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হতে, তাহলে এসব লোকেরা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

'সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকো'– এখানে 'উরফ' দ্বারা যাবতীয় ভালো ও প্রশংসনীয় কাজ বুঝানো হয়েছে, যা সবার কাছে সৎকাজ হিসেবে পরিচিত এবং যেখানে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। সৎকাজ হবার ব্যাপার বুঝার জন্যে প্রত্যেক মানুষের সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট। যখন কোনো মানুষ কোনো কাজকে সত্য ও উত্তম হিসেবে মেনে নেয়, তখন সে কাজ করা তার জন্যে অধিকতর সহজ হয় এবং কোনো প্রকার কষ্ট ছাড়াই সে তা সম্পাদন করতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি কোনো কাজকে উত্তম হিসেবে গ্রহণ না করতে পারে, তখন সে কাজ তার কাছে পাহাড়সম মনে হয় এবং তা সমাপন করা তার কাছে অত্যন্ত দুরূহ বলে বিবেচিত হয়। হে নবী, যেসব লোক তোমার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না; বরং তাদের ক্ষমা করে দাও, কিন্তু সেই সাথে তাদের সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকো। অর্থাৎ, অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়-নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করো।

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

'এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকো, বিতর্কে জড়ায়োও না।' (আল আ'রাফ, ১৯৯)

'জাহেলীন' (মূর্খরা) শব্দটি 'জাহালাতুন' (মূর্খতা) থেকে উৎপন্ন, যা হেদায়াত (আলো) এবং জ্ঞানের বিপরীত। হেদায়াত এবং জ্ঞান অনেকটা সমার্থক শব্দ। মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকার অর্থ হচ্ছে, তাদের পরিত্যাগ করা, তাদের কাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা, তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ আচার আচরণ এবং চলন বলনকে সহজভাবে নেয়া, তাদের অসার ক্রিয়াকর্মকে ভদ্রভাবে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়া– যার পরিণাম অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহেলদের ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের অজ্ঞতা থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখার অর্থ এও হতে পারে যে, তাদের সাথে অশ্লীল বাক্য বিনিময় এবং প্রকাশ্যে তাদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হওয়া ছাড়াই তাদের অপদস্থ করা এবং সত্য-ন্যায়ের আনুগত্যের জন্যে বাধ্য করা। যদি এ অর্থ নেয়া সম্ভব না হয়, তবে ন্যূনপক্ষে তাদের এবং ভালো লোকদের মাঝে এর ফলে একটা পার্থক্য সূচিত হবে। আমরা যদি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের প্রতি তাকাই, তাহলে আমরা তাদের ধৈর্যশীল এবং অনর্থক কর্ম থেকে বিমুখ দেখতে পাই। পক্ষান্তরে আমরা যদি জাহেলদের দিকে তাকাই, তবে তাদের নির্বোধ বোকা, নীচ এবং ভালো লোকদের থেকে পৃথক দেখতে পাই। দ্বীনের পথে আহ্বানকারী প্রত্যেকেরই প্রজ্ঞাময় আল্লাহর এই দিকনির্দেশনার অনুসরণ করা উচিত।

আল্লাহ তায়ালা নবী মোহাম্মদ (স.)-কে বিশ্ব মানবতার জন্যে করুণার মূর্ত ছবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন, জাহেলদের অজ্ঞতা, নির্বোধদের মূর্খতা ও বেকুবদের বেকুবীর দরুন মানবীয় কারণে যদিও কখনও কখনও তিনি রেগে যেতেন, তথাপি তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতেন, কিন্তু আল্লাহর পথে আহ্বানকারী অনুসারীরা এ ধরনের পরিবেশে তাদের ক্রোধ সংবরণ করতে অনেক সময় সক্ষম নাও হতে পারে। ক্রোধের অবস্থায় শয়তান অন্তরে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিতে পারে। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের অবস্থায় তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং সে শয়তানের পথ পরিহার করতে সক্ষম হয়।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।' (আল আ'রাফ, ২০০)

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার উৎপীড়ন করে এবং মূর্খের মতো ব্যবহার করে, আপনি তাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না।

إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।' (আল আ'রাফ, ২০০)

এ বাক্যটি নির্দেশনা দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা জাহেলদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাপূর্ণ কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর অনুগত বান্দা এতে কতোখানি ব্যথিত হয়, তাও তিনি জানেন। এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে এবং তাঁর দ্বীনের পথে আহ্বানকারীদের সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছেন, এর সাথে তাদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছেন। যেখানে মহান রব্বুল আলামীন তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করছেন এবং রসূলের কষ্টও অনুভব করছেন, সেখানে প্রতিকার ও শায়েস্তার জন্যে তো তিনিই যথেষ্ট।

পূর্ববর্তী আয়াতে আরো উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সত্যের আহবায়ক যখনই বিরোধীদের যুলুম নির্যাতন ও অনিষ্টকর কার্যকলাপ এবং তাদের মূর্খতাপ্রসূত অভিযোগ আপত্তির কারণে মানসিক উত্তেজনা অনুভব করবে, তখনই তার বুঝে নেয়া উচিত, এটি শয়তানের উস্কানি ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তার আল্লাহর কাছে এ মর্মে আশ্রয় চাওয়া উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর বান্দাকে এ উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়ে না দেন এবং তাকে এমন অসংযমী ও নিয়ন্ত্রণহীন না করেন, যার ফলে সে সত্যের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো কোনো কাজ যেন না করে বসে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইংগিত করেছেন যে, যারা তাঁকে ভয় করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, তারা নিজেদের মনে কোনো শয়তানী প্ররোচনার

প্রভাব এবং কোনো অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করার সাথে সাথে সজাগ সতর্ক হয়ে ওঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দ্বীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং কী করলে সত্যপ্রীতির প্রকৃত দাবী আদায় হবে, তাও তারা পরিষ্কার দেখতে পাবে কিংবা সে ধরনের কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম হবে।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

'আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে, তাদের যদি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা (সাথে সাথেই) সচেতন হয়ে পড়ে, (যাতে তার কর্মপদ্ধতি ও পরিণাম) যেন এরা দেখতে পায়।' (আল আ'রাফ, ২০১)

সংক্ষিপ্ত এ আয়াতটি বিস্ময়কর কিছু সংকেত এবং গভীর সত্যসমূহ উন্মোচন করে, যা মূলত তার মাঝেই সুপ্ত ছিলো। 'তখন তারা সঠিক কর্মপদ্ধতি দেখতে পায় তথা তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।' এ উক্তির মাধ্যমে এ আয়াতের সমাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, অসংখ্য অর্থকে এ আয়াতের শুরুর সাথে সংযোজন করা, যার আসলেই কোনো প্রতিশব্দ নেই। এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শয়তানের প্রভাব অন্তর্দৃষ্টিকে নির্বাপিত করে দেয়, অন্ধ করে দেয়।

কিন্তু আল্লাহভীতি তথা তাঁর শাস্তির ভয় মানুষের অন্তরকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং হেদায়াতবিমুখতার বিপদ থেকে তাকে জাগ্রত করে। অতপর যখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হয়, দূরদর্শিতা উন্মোচিত হয় এবং তাদের অন্তরচোখের পর্দা সরে যায়। 'তারা তাদের কর্মপদ্ধতি সঠিকভাবে দেখতে পায়।' কারণ শয়তানের প্রভাব হচ্ছে অন্ধত্ব, আর আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি। অনুরূপভাবে শয়তানের প্রভাব হচ্ছে অন্ধকার, আর আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন হচ্ছে আলো। তাকওয়া (আল্লাহভীতি) শয়তানের প্রভাব দূর করে। সুতরাং মোত্তাকীদের ওপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। এটাই হলো মোত্তাকীদের অবস্থা।

এ অবস্থার বর্ণনা এসেছে দুটি বিষয়ের মাঝে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, জাহেলদের থেকে বিমুখ হওয়া এবং তাদের সাথে বিতর্কে না জড়ানোর জন্যে আল্লাহর নির্দেশ। অপরটি হচ্ছে, এ মূর্খ ও জাহেলদের পশ্চাতে কী লুকানো আছে তার বর্ণনা, যা তাদের মূর্খতা, বেকুবি এবং নির্বুদ্ধিতার কাজে জড়িত হওয়ার জন্যে উৎসাহিত করছে। এ মন্তব্যের পর আল্লাহ তায়ালা পুনরায় জাহেলদের প্রসংগে বক্তব্য পেশ করছেন। এরশাদ হচ্ছে–

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ – وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا

'তাদের (কাফের) ভাই-বন্ধুরা তাদের অন্ধকার পথেই টেনে নিয়ে যেতে চায়, অতপর তারা কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করে না। (আবার) যখন তুমি (কিছু দিন) তাদের কাছে কোনো আয়াত এনে হাযির না করো, তখন তারা বলে, ভালো হতো যদি তুমি নিজেই তেমন কিছু বেছে না নিতে!' (আল আরাফ, ২০২- ২০৩)

শয়তানের ভাই বন্ধুরা, যারা তাদের ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তারা হচ্ছে জ্বিন শয়তান। তারা কখনও মানুষ শয়তানও হতে পারে। তারা তাদের পথভ্রষ্টতা আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা এ কাজে কখনও বিরক্তিবোধ করে না, অলসতা করে না এবং চুপও থাকে না। সুতরাং তারা এ কাজে বার বার নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার পরিচয় দেয়। এভাবে তারা গোমারাহীতেই নিমগ্ন থাকে।

দাওয়াতের দায়িত্ব ও দায়ীর গুণ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ؕ

'হে কম্বল আবৃত (মোহাম্মদ), (কম্বল ছেড়ে) ওঠো এবং মানুষদের (পরকালের আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো, তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, তোমার পোশাক আশাক পবিত্র রাখো, (যাবতীয়) মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো, কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান করো না, বরং তোমার মালিকের (খুশীর) উদ্দেশেই ধৈর্য ধারণ করো।' (আল মোদ্দাসসের, ১-৭)

সূরা মোদ্দাসসেরের এ প্রথম সাতটি আয়াতের প্রথমটিতেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁকে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, মানবজাতিকে সতর্ক করা, জাগ্রত করা, পার্থিব জীবনের যাবতীয় দুর্দশা ও দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত এবং রক্ষা করা, তাকে আখেরাতে দোযখ থেকে মুক্ত করা এবং তাকে সময় থাকতে মুক্তির পথে পরিচালিত করা। এ দায়িত্ব যখন একজন ব্যক্তির ওপর অর্পিত হয়, চাই তিনি নবী বা রসূল যেই হোন না কেন, তখন তা যথার্থই একটা গুরুদায়িত্ব বটে। কেননা মানবজাতি সামগ্রিকভাবে এ দাওয়াতের প্রতি এতো বিদ্রোহী, এতো একগুঁয়ে, এতো বিভ্রান্ত এবং এতো বিমুখ যে, যে কোনো মানুষের পক্ষে এ দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

قُمْ فَاَنْذِرْ

'উঠে দাঁড়াও, তাদের সতর্ক করো।' (আল মোদ্দাসসের, ২)

সতর্ক করার এ কাজ হচ্ছে রেসালাতের প্রধান কাজ, গোমরাহীতে লিপ্ত অচেতন উদাসীন লোকদের জন্যে যে আসন্ন ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে, তার সম্পর্কে সাবধান করা। আল্লাহ তায়ালা এই সতর্কীকরণের ব্যবস্থা করে তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণাই প্রদর্শন করেছেন। কারণ তারা গোমরাহ হয়ে গেলে বা গোমরাহীতে

নিমজ্জিত থাকলে আল্লাহর রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। আর তারা সুপথ প্রাপ্ত হলে আল্লাহর রাজ্যে কোনোই বৃদ্ধি ঘটে না। তবে তাঁর দয়া করুণায় তাদের আখেরাতের আযাব থেকে বাচানোর জন্যে, দুনিয়ার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি হেদায়াত ও সতর্কীকরণের এ ব্যবস্থা করেছেন। করুণার বশবর্তী হয়েই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে ক্ষমা ও বেহেশত লাভ করার জন্যে নবী রসূলদের প্রেরণ করেন, যারা মানবজাতিকে তাঁর বিধানের দিকে দাওয়াত দেন।

অন্যদের সতর্ক করার দায়িত্ব অর্পণের পরই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে ব্যক্তিগত গুণাগুণের দিকে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন,

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

'তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো।' (আল মোদ্দাসসের, ৩)

এখানে স্বীয় প্রভুর বড়োত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা ও বর্ণনা করার জন্যে রসূলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সাথে এর বর্ণনাভংগির ভেতরে এ ভাবধারাও সুপ্ত রয়েছে যে, একমাত্র তোমার প্রভুরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। কেননা একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠতম এবং তারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা সমীচীন, অন্য করো নয়। এ নির্দেশ আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত আকীদার একটি দিকের ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

বস্তুত এ বিশ্ব জগতে যতো প্রাণী, বস্তু ও তত্ত্ব আছে, তার সবই ছোটো, সবই নগণ্য। একমাত্র আল্লাহই বড়ো, শ্রেষ্ঠ ও মহান। সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববৃহৎ, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আল্লাহর সামনে সকল সত্তা, শক্তি, বস্তু, ঘটনা, তত্ত্ব ইত্যাদি অদৃশ্য ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস প্রত্যয় ও চেতনা নিয়ে মানবজাতিকে সতর্ক করা ও তাদের অশুভ পরিণতি ও দুর্দশা থেকে নিস্কৃতি দেয়ার দায়িত্ব পালনের জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এ চেতনা ও প্রত্যয় নিয়ে যদি তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে তাঁর কাছে সকল ষড়যন্ত্র, সকল বাধা এবং সকল প্রতিকূল শক্তিকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হবে, আর একমাত্র আল্লাহই তাঁর কাছে বড়ো মনে হবে, যিনি তাঁকে এ সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন।

বস্তুত দাওয়াতের কাজে যে কঠিন বাধাবিঘ্ন ও বিপদ মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়, তার মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্যে এ চেতনা সর্বক্ষণ হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা প্রয়োজন। সবসময় তার এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, দুনিয়ার সকল শক্তি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, একমাত্র আল্লাহই অজেয় ও পরাক্রান্ত। এরপর তাঁকে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে–

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

'তোমার পোশাক পবিত্র করো।' (আল মোদ্দাসসের, ৪)

আরবী ভাষায় পোশাকের পবিত্রতা দ্বারা মনের পবিত্রতা ও কর্মের পবিত্রতা, এককথায় গোটা সত্তা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর পবিত্রতা বুঝানো হয়। সতর্কীকরণ ও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালনের এটি হচ্ছে অপরিহার্য গুণ। নানা প্রতিকূল অবস্থা ও নোংরা পরিবেশে ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালাতে হলে, বিশেষত নিজে নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে নোংরা মানুষদেরকে পবিত্র করতে হলে তাকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতেই হবে। নানা রকম পরিস্থিতিতে নানা রকম মানসিকতাসম্পন্ন জনতার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও লক্ষণীয় বিষয়।

এরপর রসূল (স.)-কে শেরেক পরিত্যাগ করা এবং আযাবের কারণ হতে পারে এমন যাবতীয় দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার আদেশ দিয়ে বলা হচ্ছে– 'মলিনতা পরিহার করো।'

রসূল (স.) নবুওতের আগেও শেরেক এবং অন্য সকল দুষণীয় কাজ পরিহার করে চলতেন। এ বিকৃতি, অন্যায় অসত্য আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও অভ্যাসের মলিনতা এবং নোংরামি থেকে তাঁর পবিত্র স্বভাব সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলো। জাহেলিয়াতের যমানায়ও কোনো দুষ্কর্মে তিনি কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও জড়িত হয়েছেন বলে জানা যায়নি। তবে এখানে যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা হচ্ছে শেরেক থেকে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আপসহীনভাবে কুফরী পরিহার করার ঘোষণা সম্বলিত। এটি এবং স্বভাবসুলভ শেরেক ও জাহেলিয়াতের দোষমুক্ত থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এর দ্বারা শেরেকজনিত যাবতীয় নোংরা স্বভাব থেকে মুক্ত থাকাও বুঝানো হয়েছে।'রুজ্‌ঝ' শব্দটির অর্থ আযাব, কিন্তু এখানে এ দ্বারা আযাবের কারণ বুঝানো হয়েছে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, শেরেকের মলিনতা ও নোংরামি যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে সে ব্যাপারে সাবধান থাকো।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি নিজের কোনো চেষ্টা সাধনাকে বড়ো বা বেশী করে না দেখান এবং নিজে যেন তার কৃতিত্ব দাবী না করেন।

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

'কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান করো না।' (আল মোদ্দাসসের, ৬)

কেননা তাকে ভবিষ্যতে আরো অনেক অনুগ্রহ ও অনেক দান করতে হবে এবং অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চান তিনি যেন নিজের কোনো কাজ বা দানকে বড়ো করে না দেখেন, যেন তার বিনিময়ে আরো বেশী পাওয়া ও খোটা দেয়া না হয়। এ দাওয়াত এমন কোনো ব্যক্তি চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় না যে নিজের দান ও চেষ্টা সাধনাকে বড়ো বলে অনুভব করে। কোনো দান বা সৎকর্ম করলে তা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে এবং মনে করতে হবে, এটা করতে পারাও আল্লাহর দান।

এ কাজ করার সুযোগ ও ক্ষমতা যে আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন, সে জন্যে বড়াই নয় বরং আল্লাহর শোকর করা উচিত।

পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তার প্রভুর উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিচ্ছেন। এ দাওয়াতের দায়িত্ব যখনই কারো ওপর অর্পণ করা হয়, তখনই তার প্রতি এ আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়। আসলে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের এ কঠিন সংগ্রামে ধৈর্যই হচ্ছে আসল রসদ। এ সংগ্রাম একই সাথে পরিচালনা করতে হয় নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, নিজের কামনা বাসনার বিরুদ্ধে এবং শয়তানের নেতৃত্ব ও প্ররোচনায় পরিচালিত ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধেও। এটি এমন একটি সর্বাত্মক ও প্রাণান্তকর সংগ্রাম, ধৈর্য ছাড়া যার আর কোনো রসদ নেই, আর তাও এমন ধৈর্যই যার উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী সংগঠনে কর্মীদের প্রস্তুতি

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা নিজেদের উৎসর্গ করবে, তাদের জীবনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ, দুঃখ দুর্দশা, ভয় আতংক আসতেই পারে। এসব পরিস্থিতি এই মহান পথের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আল্লাহর সৈনিকরা এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেন ঘাবড়ে না যায়, সাহস হারিয়ে না ফেলে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দিয়েছেন। ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া সেসব নির্দেশনার অন্যতম।

তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ, পার্থিব সুবিধা অথবা সমগ্র দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা অন্যদের ঈমানের দাওয়াত দিয়ে থাকে। তাদের মিশন অব্যাহত রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে সাহস ও মনোবল রাখা, একমুখী হওয়া প্রয়োজন। আর সে সাহস মনোবল নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

'(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাও; (যাবতীয় হক আদায় করে) নামায প্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই একটা কঠিন কাজ, কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের কথা আলাদা।' (আল বাকারা, ৪৫)

অর্থাৎ সত্যকে মেনে নেয়ার দাওয়াত বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে যারা আল্লাহর প্রতি নিরংকুশ ও নির্ভেজাল আনুগত্য পোষণ করে, তাঁকে ভয় করে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার অনিবার্যতায় অবিচল বিশ্বাস রাখে, তাদের কাছে কঠিন নয়।

'ধৈর্যের দ্বারা শক্তি অর্জন' কথাটা কোরআনে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। কারণ ধৈর্যই হলো যে কোনো কঠিন অভিযানে অবতীর্ণ হবার অপরিহার্য উপকরণ ও পাথেয়। আর নিছক সত্যের মর্যাদাদান ও সত্যকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে বরণ করে নেয়ার খাতিরে এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে তা অনুসরণ করার তাগিদে কায়েমী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বিসর্জন দেয়ার মতো কঠিন কষ্টসাধ্য কাজ আর নেই।

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, নামায দ্বারা সাহায্য চাওয়ার তাৎপর্য কি?

এর জবাব হচ্ছে, নামায হলো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগ সেতু। এটা এমন একটা যোগসূত্র, যা থেকে মন শক্তি আহরণ করে, আত্মা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক বন্ধন অর্জন করে এবং মানসসত্তা সকল পার্থিব সম্পদ সরঞ্জামের চাইতে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান এক পাথেয় লাভ করে। রসূলুল্লাহ (স.) যখনই কোনো সংকটের মুখোমুখি হতেন তখনই নামাযের আশ্রয় নিতেন। নামাযই হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সবচেয়ে শক্ত ও অটুট যোগসূত্র। এটা মানুষের আত্মা ও বিবেককে ওহী এবং প্রজ্ঞার সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে। মোমেন যখনই আল্লাহর পথের পাথেয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে, মধ্যাহ্নের ঝলসানো খরতাপে তপ্ত পিপাসার্ত হয়ে যখনই পানির জন্যে ছটফট করবে, সকল সাহায্য থেকে রিক্ত ও বঞ্চিত হয়ে যখন আল্লাহর সাহায্যের জন্যে হা হুতাশ করবে এবং সকল সঞ্চিত সম্বল নিঃশেষ করে যখন সম্বলের প্রত্যাশী হবে, তখন এ নামাযই তার হতাশা দূর করে তার মনোবাঞ্ছা পূরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের উৎস হয়ে দাঁড়াবে। এ উৎস থেকে মোমেন ব্যক্তি চিরদিনই উপকৃত হতে সক্ষম।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের অনিবার্যতায় বিশ্বাস রাখা এবং সকল ব্যাপারে এ বিশ্বাসে অবিচল থাকা, ধৈর্য সহিষ্ণুতা এবং তাকওয়া বা আল্লাহভীতির একমাত্র উৎস। দুনিয়া ও আখেরাতের যথাযর্থ মূল্যমান নিরূপণও এর ওপরই নির্ভরশীল। এই মূল্যমান নিরূপণের মানদন্ড যখন নির্ভুলভাবে কাজ করবে তখন যথার্থই দেখা যাবে, গোটা দুনিয়া একটা নগণ্য তুচ্ছ বস্তু। তখন আখেরাত তার আসল রূপ নিয়ে দেখা দেবে। ফলে কোনো বুদ্ধি বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ আখেরাতকে অগ্রগণ্য মনে করে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবে না।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে কোরআনের সম্পর্ক

আল কোরআন মূলত আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও আন্দোলনের দিকনির্দেশক এক মহান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হচ্ছে দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাণ এবং উৎস। এ গ্রন্থ দাওয়াত ও আন্দোলনের ধারক বাহক, প্রহরী ও রক্ষক, ব্যাখ্যাতা ও বিশ্লেষক। এ গ্রন্থ ইসলামী আন্দোলনের গঠনতন্ত্র ও নীতিনির্ধারক। আর সর্বশেষে এ গ্রন্থটিই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের শক্তির উৎস। অনুরূপভাবে ইসলামের আহ্বায়কদের কর্মের উপকরণ, আন্দোলনের পদ্ধতি ও প্রেরণার উৎস।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের ও কোরআনের মাঝে গভীর একটা অপূরণীয় দূরত্ব থেকে যাবে, যদি আমরা এ কথা উপলব্ধি না করি এবং সব সময় আমাদের চেতনায় এ কথা জাগরূক না রাখি যে, কোরআন একটি জীবন্ত জাতিকে সম্বোধন করেছিলো, পৃথিবীতে বাস্তব জাতিসত্তা নিয়ে বিরাজমান একটি জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলেছিলো। তাই এ জাতির জীবনে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলীর মোকাবেলা করা হয় এ

কোরআনের দিক-নির্দেশনা নিয়ে। এ দিক-নির্দেশনা দিয়েই পরে মানবজাতির গোটা পার্থিব জীবন পরিচালিত হয়েছিলো। এ কোরআনকে সম্বল করেই মানুষের মনোজগতে এবং পৃথিবীর একটি ভূখন্ডে এক বিরাট যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো। সে যুদ্ধ বিশ্বে অনেক পরিবর্তন, অনেক আলোড়ন ও অনেক সাড়া জাগিয়েছিলো।

কোরআনের ও আমাদের মাঝে একটি বিরাট অন্তরায় থেকে যাবে যদি আমরা একে নিছক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে তেলাওয়াত ও শ্রবণ করতে থাকি। যদি মনে করি, মানুষ নামে পরিচিত এ জীবের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এবং মুসলমান নামে পরিচিত মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর সাথে কোরআনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের বুঝতে হবে, এর আয়াতগুলো মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর মোকাবেলা করা ও তাদের পথনির্দেশ দেয়ার জন্যই নাযিল হয়েছিলো এবং একসময় তা তাদের যথার্থই পথনির্দেশ দিয়েছিলো। ফলে তা থেকে মানুষের জীবনে সাধারণভাবে এবং মুসলিম জাতির জীবনে বিশেষভাবে এক বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিলো।

বস্তুত কোরআনের অলৌকিকত্ব এখানেই নিহিত। একটি সুনির্দিষ্ট জাতির সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট উপলক্ষে যে কোরআন নাযিল হয়েছিলো এবং ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট যুগে নাযিল হয়ে মুসলিম জাতিকে সাথে নিয়ে এক যুগান্তকারী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ও গোটা মানবজাতির ইতিহাসের ধারা পাল্টে দিয়েছিলো– এটাই হচ্ছে কোরআনের মোজেযা এবং এটাই কোরআনের অলৌকিকত্ব, কিন্তু এ ইতিহাসের ধারা সেই নির্দিষ্ট যুগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে ইতিহাসের ধারা প্রত্যেক যুগের চলমান জীবনধারার পাশাপাশি অবস্থান করা, চলমান জীবনধারার মোকাবেলা করা ও তাকে নির্দেশনা দিয়ে পরিচালনা করতেও সক্ষম। এক্ষেত্রে কোরআনের পথনির্দেশ এতোটাই কার্যকর ও বাস্তবানুগ যে, মনে হয় যেন তা বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জাতির জীবনধারার মোকাবেলা করতে তাৎক্ষণিকভাবেই নাযিল হয়েছে। চারপাশে বিরাজমান জাহেলিয়াতের সাথে ও মানুষের ব্যক্তিসত্তার অভ্যন্তরে বিরাজমান প্রকৃতির সাথে লড়াই করার জন্য তা যেন এইমাত্র অবতীর্ণ হয়েছে! আর আরবের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রান্তরে সেই দিনগুলোতে যে তীব্রতা, তেজস্বিতা ও বাস্তবতার সাথে এ লড়াই পরিচালনা করেছিলো সেই একই তেজস্বিতা ও তীব্রতা নিয়ে এখনো সে লড়াই পরিচালনা করতে সক্ষম।

কোরআন থেকে তার যথার্থ কার্যকর প্রেরণা যদি আমরা অর্জন করতে চাই, কোরআনের মধ্যে যে প্রচন্ড জীবনীশক্তি নিহিত রয়েছে, তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই এবং প্রত্যেক যুগের মুসলিম জাতি ও দলের জন্য এতে যে চালিকাশক্তি লুকিয়ে আছে তা যদি আমরা লাভ করতে চাই, তাহলে কোরআন যে প্রথম মুসলিম

দলটিকে সম্বোধন করেছিলো তার ভাবমূর্তি আমাদের হৃদয়পটে জাগরূক রাখতে হবে। সে দলটি জীবনের বাস্তব অংগনে কিভাবে কর্মরত ছিলো, কিভাবে সে মদীনায় ও গোটা আরব উপদ্বীপের ঘটনাবলীর মোকাবেলা করেছিল, কিভাবে সে তার শত্রু ও মিত্রদের সাথে আচরণ করেছিলো এবং কিভাবে সেই জাতির ইচ্ছা আকাংখার মোকাবেলা করেছিলো, সে ইতিহাস আমাদের জানতে ও মনে রাখতে হবে। কিভাবে কোরআন সে সময় নাযিল হয়ে সেসব ঘটনার মোকাবেলা করেছিলো এবং সে মুসলিম দল ও জাতির প্রতিটি পদক্ষেপকে সেই উত্তপ্ত বিরাট রণাংগনে কিভাবে পরিচালিত করেছিলো, একই সাথে সে তার অন্তরাত্মা ও প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা, মক্কা, মদীনা ও তার আশপাশে ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুদের চক্রান্ত ও বহির্বিশ্বের সকল শত্রুর চক্রান্ত কিভাবে প্রতিহত করেছিলো তাও জানতে হবে।

বস্তুত মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সেই প্রথম ইসলামী সংগঠনের অনু-করণ অনুসরণের মাধ্যমেই জীবন যাপন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। সেটি মানুষেরই সংগঠন ছিলো। সেই সংগঠন কিভাবে যথার্থ মানবীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করেছে, সে সংগঠন তার বাস্তব জীবনে এবং মানবীয় সমস্যাবলীতে কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, তা আমাদের জানতে ও অনুসরণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, কোরআন তার দৈনন্দিন জীবনে যাবতীয় বিষয়ে এবং তার সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কিভাবে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছে। আমাদের দেখতে হবে কিভাবে কোরআন সেই সংগঠনকে হাত ধরে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ অগ্রযাত্রায় সেই সংগঠন কখনো আছাড় খেয়েছে, আবার কখনো উঠে দাঁড়িয়েছে। কখনো একটু বাঁকা পথে, আবার কখনো সোজা পথ ধরে চলেছে। কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, আবার কখনো প্রচন্ড শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। কখনো আঘাত খেয়ে বেদনাহত হয়ে মুষড়ে পড়েছে, আবার পরক্ষণেই ধৈর্য ধরে তা সামাল দিয়েছে। ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। আর এভাবে প্রতিটি স্তরে তার মধ্যে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিরই স্ফুরণ ঘটেছে। মানবীয় দুর্বলতা অথবা সবলতারও প্রকাশ পেয়েছে।

এভাবে সে সংগঠনটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, সে প্রথম সংগঠনটি যে বিষয়ে কোরআনের প্রত্যক্ষ সংলাপ ও সম্বোধনের পাত্র হতো, অনুরূপ বিষয়ে আমরাও কোরআনের প্রত্যক্ষ সংলাপ ও সম্বোধনের পাত্র। মানুষ হিসেবে আমাদের যা কিছু ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য আমরা জানি, চিনি ও প্রত্যক্ষ করি, তা কোরআনের আহ্বান ও নির্দেশ গ্রহণ করতে, মেনে চলতে ও একই জীবন পথে চলার ব্যাপারে তার নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হতে পুরোপুরি সক্ষম।

এভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা কোরআনকে এমন এক জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে দেখতে পাবো, যা প্রথম মুসলিম সংগঠনের জীবনকে যেমন পরিচালনা করেছে, তেমনি আমাদের জীবনকেও পরিচালনা করতে সক্ষম। আমরা অনুভব করতে পারবো, কোরআন আজও যেমন আমাদের সাথে আছে, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। আমরা এও অনুধাবন করবো যে, কোরআন আমাদের সুনির্দিষ্ট বাস্তব সমস্যাবলীর ধরা–ছোঁয়ার বাইরের কোন আবৃত্তিসর্বস্ব বন্দনার শ্লোকমালা নয়, কিংবা তা অতীতে ঘটে যাওয়া এবং মানব জীবনের সাথে সম্পর্কচ্যুত ও প্রভাবহীন কোনো ইতিহাস নয়।

বস্তুত আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান এ প্রাকৃতিক জগতের মতোই কোরআন এক চিরন্তনসত্য। বিশ্ব প্রকৃতি হচ্ছে আল্লাহর দৃশ্যমান গ্রন্থ, আর কোরআন হচ্ছে তার জন্যে আল্লাহর পাঠ্যগ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থ তাদের প্রণেতার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। উভয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মের জন্যই সৃজিত। প্রকৃতি তার সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য সহকারে সচল এবং নিজের জন্য নির্ধারিত কাজে তৎপর রয়েছে। সূর্য তার নির্ধারিত কক্ষে পরিভ্রমণরত এবং নিজস্ব ভূমিকায় কর্মরত। চন্দ্র, পৃথিবী এবং সকল গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্র সৃষ্টির আদি থেকেই আপন দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। আগেও তারা তাদের এ ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে মানুষ আগের মতোই রয়েছে, তাই এ মানুষকে সম্বোধনকারী কোরআনও অপরবর্তিত রয়েছে। মানুষের পরিবেশে ও প্রতিবেশে যতো পরিবর্তনই আসুক না কেন, সে নিজে পরিবেশকে যতোই প্রভাবিত করুক বা পরিবেশ দ্বারা যতোই প্রভাবান্বিত হোক, তার জন্মগত ও প্রকৃতিগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আর কোরআন তাকে তার এই অপরিবর্তনীয় স্বভাব প্রকৃতি সহকারেই সম্বোধন করে। কোরআন তাই তার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে। কেননা, এ জন্যই কোরআন নাযিল করা হয়েছে এবং সে উপযোগী করেই তা রচনা করা হয়েছে। কারণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ কেতাব এবং তার স্বভাব প্রকৃতি মহবিশ্বের প্রকৃতির মতোই চিরস্থায়ী, চিরসচল ও অপরিবর্তনীয়।

সূর্য সম্পর্কে কেউ যদি বলে, এটা একটা প্রাচীন 'রক্ষণশীল' তারকা এবং তার স্থলে একটা নতুন 'প্রগতিশীল' নক্ষত্র প্রয়োজন, অথবা মানুষ একটা প্রাচীন ও রক্ষণশীল প্রাণী এবং তার পরিবর্তে পৃথিবীকে গড়া ও সাজানোর জন্য নতুন একটা 'প্রগতিশীল' সৃষ্টির প্রয়োজন, তবে এ দু'টো কথা যেমন হাস্যকর হবে, তেমনি মানবজাতির প্রতি প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআন সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা হাস্যকর হবে।

মানুষের মূল্যায়নে ইসলামের আপসহীন মানদন্ড

কোরআন করীমের যে অংশ থেকে এখানকার আলোচিত অংশটুকু বাছাই করা হয়েছে, সে অধ্যায়ের শুরুতে রসূল (স.)-কে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ভক্ত অনুগত বান্দাদের সাথে যেন তিনি ধৈর্যের সাথে অবস্থান করেন এবং যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে উদাসীন থাকে, তাদের যেন এড়িয়ে চলেন। এরপর এ উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্যে উদাহরণ হিসেবে দুই ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন ধন সম্পদ ও পদমর্যাদাকে গৌরব ও সম্মানের উপকরণ মনে করে। অপর জন খালেস ঈমানের সম্পদ দ্বারাই নিজেকে গৌরবান্বিত ও ঐশ্বর্যশালী মনে করে এবং আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করে। তারপর উপসংহারে গোটা পার্থিব জীবনের জন্যে একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এ উদাহরণে দেখানো হয়েছে যে, পার্থিব জীবন হচ্ছে সেই ক্ষণস্থায়ী শুকনো তৃণলতার মতো, যা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সর্বশেষে তুলে ধরে চিরস্থায়ী ও শাশ্বত সত্যকে। বলা হয়েছে–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

‘ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি হচ্ছে (তোমাদের) পার্থিব জীবনের কতিপয় (অস্থায়ী) সৌন্দর্য মাত্র, চিরস্থায়ী হচ্ছে (মানুষের) নেক কাজ, (আর তা হচ্ছে) তোমার মালিকের কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে অনেক ভালো, আর কোনো (কল্যাণময়) কিছু কামনা করাতে গেলেও তা হচ্ছে উত্তম।’ (আল কাহফ, ৪৬)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا

‘(হে নবী,) তুমি নিজেকে সদা সেসব মানুষদের সাথে রেখে চলবে, যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের মালিককে ডাকে, তারা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং কখনো এ পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধি কামনা করে না– তাদের কাছ থেকে তোমার (স্নেহের) দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না, কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চলো না, যার অন্তকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করতে শুরু করেছে এবং যার কার্যকলাপ আল্লাহ তায়ালার সীমানা লংঘন করেছে।’ (আল কাহফ, ২৮)

বর্ণিত আছে, কোরায়শ সরদাররা যখন রসূল (স.)-কে অনুরোধ জানালো যে, তিনি যদি চান কোরায়শ সরদাররা ঈমান আনুক, তাহলে তিনি যেন তার কাছ থেকে

বেলাল, সোহায়ব, আম্মার, খাব্বাব ও ইবনে মাসউদের ন্যায় দরিদ্র মুসলমানদের সরিয়ে দেন কিংবা সরদারদের জন্যে পৃথক বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। কেননা ওইসব গরীব মুসলমানদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকে ঘামের গন্ধ আসে, যা কোরায়শ সরদারদের জন্যে বিরক্তিকর।

আরো বর্ণিত আছে, রসূল (স.) ওই সরদারদের ঈমান আনার প্রতি খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তাদের দাবী মেনে নেয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা এ দুটো আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতদ্বয় নাযিল হয়ে প্রকৃত মূল্যবোধ কী, তা চিহ্নিত করে এবং জীবনের নির্ভুল মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করে।

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

'এরপর যার ইচ্ছা হয় সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা হয় কুফুরী করুক।' (আল কাহফ, ২৯)

বস্তুত ইসলাম কাউকে তোষামোদ বা সাধাসাধি করে না, মানুষকে সে আদিম জাহেলিয়াতের মানদন্ডেও বিচার করে না, কিংবা ইসলামের বিপরীত মানদন্ডধারী অন্য কোনো জাহেলিয়াতের মানদন্ডেও সে মানুষকে পরিমাপ করে না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

'(হে নবী,) তুমি নিজেকে সদা সে সব মানুষদের ধৈর্যের সাথে রেখে চলবে, যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের মালিককে ডাকে, তারা একমাত্র তারই সন্তুষ্টি কামনা করে।' (আল কাহফ, ২৮)

'তুমি ধৈর্য ধারণ করো'.....অর্থাৎ ক্লান্ত, বিরক্ত ও অস্থির হয়ো না এবং তাড়াহুড়ো করো না।

কেননা আল্লাহই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এজন্যে সকালে বিকালে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে, তাঁর দিক থেকে কখনো ফিরে দাঁড়ায় না এবং তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া তারা আর কিছুই কামনা করে না। আর তারা যা কামনা করে, তা দুনিয়া পূজারীরা যা কামনা করে তার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর।

তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ করতে বলার অর্থ হলো তাদের সাথে অবস্থান করতে থাকো, তাদের শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা তাদের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও সততা এবং তাদের মতো লোকদের দ্বারাই দাওয়াত সফল হয়। যারা দাওয়াত বিজয়ী হবে মনে করে তা গ্রহণ করে, যারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পাবে মনে করে তা গ্রহণ করে, যারা নিজেদের পার্থিব লোভ ও কামনা বাসনা চরিতার্থ হবে মনে করে তা গ্রহণ করে এবং যারা এ দ্বারা ব্যবসা করে লাভবান হবে মনে করে তা গ্রহণ করে, তাদের দ্বারা দাওয়াত সফল হয় না। দাওয়াত সফল ও বিজয়ী হয় কেবল সে সব নিষ্ঠাবান লোকদের দ্বারা,

যারা খালেস মনে আল্লাহর দিকে রুজু হয়, যারা সম্মান চায় না, পদ চায় না কিংবা পার্থিব লাভ চায় না, তারা চায় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি।

لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

'তোমার চোখ দুটো যেন তাদের দিক থেকে ফিরে না যায় .., (আল কাহফ, ২৮)

অর্থাৎ তুমি এই দরিদ্র নিষ্ঠাবান মোমেনদের প্রতি গুরুত্ব কম দিয়ে ভোগবিলাসী লোকদের ভোগের উপকরণগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ো না। কেননা পার্থিব জীবনের এসব বিলাস ও সাজসজ্জা সেই উচ্চ মার্গে উপনীত হতে পারে না, যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে সকালে বিকালে আল্লাহকে স্মরণকারীদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত।

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চলো না, যার অন্তকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করতে শুরু করেছে এবং যার কার্যকলাপ আল্লাহ তায়ালার সীমানা লংঘন করেছে।' (আল কাহফ, ২৮)

অর্থাৎ এ ধরনের লোকদের অন্যায় দাবী মেনে নিও না, যাদের তাদের মাঝে ও দরিদ্রদের মাঝে পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে। তারা যদি আল্লাহকে স্মরণ করতো, তাহলে তারা তাদের অহংকারকে সংযত করতো, আল্লাহর বড়োত্ব উপলব্ধি করতো যার অধীনে সবাই সমান এবং আকীদা বিশ্বাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করতো, যা গ্রহণ করার পর সবাই ভাই ভাই হয়ে যায়, কিন্তু তারা তা করে না। তারা কেবল নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, নিজেদের জাহেলী প্রবৃত্তির আনুগত্য করে এবং আল্লাহর বান্দাদের নিজেদের জাহেলী মানদন্ডে পরিমাপ ও মূল্যায়ন করে। তাই তারা ও তাদের কথাবার্তা এমন নির্বোধসুলভ, যা অবজ্ঞারই যোগ্য। আর এটা আল্লাহর স্মরণ থেকে তাদের উদাসীন থাকারই শাস্তি।

ইসলাম এসেছে আল্লাহর চোখে তাঁর সকল বান্দাকে সমান করে দিতে। তাই বংশ, পদমর্যাদা ও ধন সম্পদের ভিত্তিতে কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। ধন সম্পদ, পদমর্যাদা, বংশীয় আভিজাত্য ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত আল্লাহর কাছে এ বৈশিষ্ট্যগুলোর অবস্থান কিরূপ, কেবলমাত্র তার ওপর নির্ভরশীল। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কতোখানি আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনে নিবেদিত, তা দ্বারাই নির্ণীত হবে আল্লাহর কাছে তার অবস্থান। আল্লাহমুখী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনে নিবেদিত না হলে ওগুলো নিছক নির্বুদ্ধিতা, বাতিল উপসর্গ ও অর্থহীন ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু নয়।

'তার আনুগত্য করো না, যার মনকে আমি উদাসীন করে দিয়েছি..........।'

মানুষ যখন নিজের দিকে, নিজের সম্পত্তির দিকে, নিজের সন্তানাদির দিকে, নিজের ভোগবিলাস, আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ উল্লাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখনই তার মনকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেন। কেননা তখন আর তার মনে তাঁর জন্যে কোনো স্থান থাকে না। যার মন এসব জিনিসের মধ্যে ডুবে যায় এবং এগুলোকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না হয়ে পারে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তার উদাসীনতা আরো বাড়িয়ে দেন, তাকে আরো শিথিল করে দেন, শেষ পর্যন্ত তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যায় এবং তার মতো অপরাধীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছেন সেই পরিণতির সম্মুখীন হয়।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

'আর বলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য উপস্থিত। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফরী করুক।'

সর্বাত্মক তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা ও আপসহীনতা সহকারে এ ঘোষণা দেয়া উচিত। কেননা সত্য কখনো মাথা নোয়ায় না, আপস করে না। সে তার সোজা পথে নির্ভীক চিত্তে ও জোর কদমে চলে। কাউকে তোয়াজ ও তোষামোদ করে চলে না। যা বলার তা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে। যার ঈমান আনতে ইচ্ছা হয় আনুক, যার কুফরী করতে ইচ্ছা হয় করুক– তার কোনোই পরোয়া নেই। সত্য যার মনকে মুগ্ধ করে না, সে যেখানে ইচ্ছা চলে থাক। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা আকাংখাকে আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুগত করে না, তার সাথে আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের প্রশ্নে কোনো আপস নেই। আল্লাহর প্রতাপ ও পরাক্রমের সামনে যে নিজের অহংকারকে দমন করে না, তার কোনো আকীদা বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই।

আকীদা বিশ্বাস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, তার ব্যাপারে কারো সাথে আপস করা যাবে। এটা আল্লাহর সম্পত্তি। তিনি জগতের কোথাও কারো মুখাপেক্ষী নন। যারা ইসলামী আদর্শকে আন্তরিকভাবে চায় না এবং তা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করে না, তাদের ইসলাম গ্রহণে ইসলাম সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হয় না। যারা আল্লাহভীরু, একনিষ্ঠ মোমেনদের চেয়ে নিজেদের উচ্চতর, শ্রেষ্ঠত্বর ও অভিজাত মনে করে, তাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো কল্যাণ আশা করা যায় না।

দ্বীনের দায়ীদের প্রতি কোরআনের কিছু নির্দেশনা

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ٧ - رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ - اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ - وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۙ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

'(হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার মালিক, যে (আযাবের) ওয়াদা এ (কাফেরদের) সাথে করা হচ্ছে, তা যদি তুমি আমাকে দেখাতেই চাও– (তাহলে) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল (করে এই আযাব প্রত্যক্ষ) করিয়ো না। (হে নবী,) আমি তাদের কাছে যে (আযাবের) ওয়াদা করেছি তা অবশ্যই তোমাকে দেখাতে সক্ষম। (হে নবী, তারা তোমার সাথে) কোনো খারাপ ব্যবহার করলে তুমি এমন পন্থায় তা দূর করার চেষ্টা করো, যা হবে নিতান্ত উত্তম (পন্থা) আমি তো ভালো করেই জানি ওরা তোমার ব্যাপারে কি বলে। (সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হয়ে) তুমি (বরং) বলো, হে আমার মালিক, শয়তানদের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমার পানাহ চাই (আরো বলো, হে আমার মালিক), আমি এ থেকেও তোমার পানাহ চাই যে, শয়তান আমার (ধারে) কাছেও ঘেঁষে না।'(আল মোমেনূন, ৯৩-৯৮)

আলোচ্য আয়াতে মোশরেকদের প্রসঙ্গ রেখে রসূল (স.)-কে কিছু নির্দেশ দান করা হচ্ছে। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন নিজ প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তাঁর আশ্রয় কামনা করেন এবং কাফের মোশরেকদের শাস্তি তাঁর জীবদ্দশায়ই ঘটলে তা থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করেন। এছাড়া তিনি যেন শয়তানের কূমন্ত্রণা থেকেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেন। তাঁর হৃদয় মনে আক্রোশের সৃষ্টি যাতে না হয়, কাফের মোশরেকদের কথাবার্তায় তিনি যাতে মনোক্ষুণ্ন না হন সে দোয়াও তাঁকে করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহদ্রোহী লোকদের ওপর আল্লাহর মর্মান্তিক আযাব ও গযব পতিত হওয়ার এবং ওদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় নিজেকে নিরাপদে রাখার জন্যে আল্লাহর রসূল দোয়া করছেন, কিন্তু এই দোয়া অধিক সতর্কতার উদ্দেশে করা হয়েছে। এর মাঝে পরবর্তী লোকদের জন্যে শিক্ষাও রয়েছে, তারা যেন আল্লাহর শাস্তি, আযাব গযব ও কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে, সব সময়ই সজাগ থাকে এবং সদা তাঁর আশ্রয় কামনা করে।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায়ই যে আল্লাহ তায়ালা বিদ্রোহী লোকদের ব্যাপারে তাঁর কৃত ওয়াদা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম, তা তিনি ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন–

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ

'আমি তাদের যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম.......।' (আল মোমেনূন, ৯৫)

উল্লেখ্য, আল্লাহ তায়ালা তাঁর করা ওয়াদার কিছু কিছু অংশ বদর যুদ্ধে ও মক্কা বিজয়ের সময় রসূল (স.)-কে দেখিয়ে দিয়েছেন।

যেহেতু আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তখন দাওয়াত ও তাবলীগের অন্যতম পদ্ধতি ছিলো অন্যায় অবিচারের জবাব সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে দেয়া, ধৈর্য ধারণ করা এবং গোটা বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়া। তাই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে–

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۖ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

'মন্দের জওয়াবে তাই বললো, যা উত্তম; তারা যা বলে আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত।' (আল মোমেনূন, ৯৬)

সব ধরনের শয়তানী কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনা মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে রসূলের আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনার মাঝে অতিরিক্ত সাবধানতা, আল্লাহর কাছে অতিরিক্ত সহায়তা কামনা এবং উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যগুলো নিহিত রয়েছে। তিনিই হচ্ছেন উম্মতের জন্যে আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি নিজ উম্মতকে সর্ব অবস্থায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনার শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যথায় রসূলকে শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও প্রবঞ্চনাই নয়; বরং এরা যেন তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে না পারে সে দোয়া করার জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের দুঃসময়ে ঈমান ও ত্যাগের মর্যাদা

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۖ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۖ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ع

'তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাও না– অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুর মালিকানা এক আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানে) সংগ্রাম করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী, যারা বিজয় সাধিত হবার পর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করেছে এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন; (মূলত) তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগ জ্ঞাত রয়েছেন।' (আল হাদীদ, ১০)

উল্লেখিত আয়াত দুটির প্রথমটির বক্তব্যই ভিন্ন আংগিকে দ্বিতীয় আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেননা, আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আসলে তাঁরই এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আর মানুষকে যে সম্পদে আল্লাহর প্রতিনিধি করা

হয়েছে, সে সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার আহবান জানাচ্ছেন, তখন তাদের এটা না করার কোনো কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা আগেই বলেছেন, তাদের এ সম্পদে আল্লাহর প্রতিনিধি বানানো হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে, সব সম্পদ আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। এ সব অকাট্য যুক্তির পর কার্পণ্য করার আর কী যুক্তি অবশিষ্ট থাকে?

প্রথম ঈমান আনয়নকারী আনসার ও মোহাজেররা আল্লাহর পথে তাদের সাধ্যানুযায়ী জান ও মালের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আর সেটা করেছেন চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং নিদারুণ দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, মক্কা বিজয় ও হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে। ইসলাম যখন চরম অসহায় অবস্থায় ছিলো, চারদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিলো এবং তার সমর্থকের সংখ্যা ছিলো নিতান্তই মুষ্টিমেয়। পরবর্তীতে হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয় দ্বারা প্রভূত শক্তি সম্মান লাভ করেছিলো, কিন্তু তার আগে ইসলামের চরম দুর্দিনে তারা আল্লাহর পথে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। অথচ এ দানের বিনিময়ে তারা কোনো পার্থিব পুরস্কার বা প্রতিদান পাওয়ারও আশা করতেন না। আর পরবর্তীকালের বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কাছে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে বাহবা কুড়াতেও চাইতেন না। তাদের ত্যাগ, কোরবানী ও দান ছিলো সম্পূর্ণ নির্ভেজাল, খালেস ও একনিষ্ঠ। এ দান ও কোরবানীতে তারা উদ্বুদ্ধ হতেন শুধু আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান লাভের আশায় এবং যে আদর্শকে তারা নিজেদের জীবন ও যাবতীয় সহায় সম্পদের চেয়ে বড় মনে করে গ্রহণ করেছিলেন, তার মর্যাদা রক্ষার অদম্য বাসনায়। তবে তারা যে সম্পদ ব্যয় করতেন, তা পরিমাণের দিক থেকে বিজয় পরবর্তীকালের মুসলমানদের চেয়ে কম ছিলো। পরবর্তীদের কেউ কেউ ঠিক সেই পরিমাণ দান করতো, যা পূর্ববর্তীরা দান করেছেন বলে শুনতো বা জানতো। এ পর্যায়েই কোরআনের আয়াত নাযিল হলো এবং সত্যের দাঁড়িপাল্লায় মেপে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলমানদের দানের সঠিক মূল্য নিরূপণ করলো। এ আয়াতের পরবর্তী অংশে জানিয়ে দেয়া হলো, দানের পরিমাণটাই আসল বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং আসল বিবেচ্য বিষয় হলো দানকারীর ঈমান, যা তাকে দানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ، اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا

‘তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানে) সংগ্রাম করেছে;

তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী, যারা বিজয় সাধিত হবার পর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করেছে এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছে।।' (আল হাদীদ, ১০)

ইসলাম যখন শত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু ছিলো, তার সমর্থকরা যখন ছিলো সংখ্যালঘু এবং কোনো লাভ, সুখ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হতো না, তখন যে ব্যক্তি ইসলামের জন্যে দান করেছে ও লড়াই করেছে, সে ওই ব্যক্তির সমপর্যায়ের নয়, যে ইসলামের জন্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশ, বিপুলসংখ্যক সমর্থক এবং সাফল্য ও বিজয় নাগালের মধ্যে থাকা অবস্থায় দান এবং লড়াই করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক ছিলো সরাসরি আল্লাহর সাথে, তাঁর প্রতি তার ভরসা ও আনুগত্য ছিলো সন্দেহাতীতভাবে আন্তরিক ও নির্ভেজাল এবং সকল প্রকারের বাহ্যিক উপায় উপকরণ থেকে সে ছিলো অনেক দূরে। ইসলামের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও আস্থা থেকে সে যে শক্তি সঞ্চয় করতো, সেই শক্তি ছাড়া সত্য ও কল্যাণের পথে লড়াইতে তার আর কোনো সাহায্যকারী বা প্রেরণাদাতা ছিলো না। আর শেষোক্ত ব্যক্তি যদিও নিষ্কলুষ নিয়তের অধিকারী হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তীদের ন্যায় আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে, তাহলেও ন্যায়ের পথে সংগ্রাম সাধনা চালাতে তার কিছু না কিছু সমর্থক ও সাহায্যকারী জুটে যাওয়া একেবারে দুর্লভ নয়।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার খালেদ ইবনে ওলীদ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফের মধ্যে কিঞ্চিত কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। খালেদ আবদুর রহমানকে বললেন, 'বুঝেছি, তোমরা আমাদের কিছু দিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছো বলে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ফলাচ্ছ।' হযরত আনাস (রা.) বলেন, শুনতে পেয়েছি, একপর্যায়ে এই বাকবিতন্ডার খবর রসূল (স.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন, আমার সাথীদের ব্যাপারটা তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। সেই আল্লাহর কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি ওহুদ পর্বত পরিমাণ সম্পদও আল্লাহর পথে দান করো, তবু তারা যে সব কাজ করেছে, তার সমান মর্যাদায় তোমরা কখনো পৌঁছতে পারবে না।'

সহীহ বোখারীতে এক হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, 'তোমরা আমার সাথীদের গালি দিও না। আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পর্বত সমান স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবু তাদের সমান– এমনকি তাদের অর্ধেক মর্যাদাও পাবে না।'

উভয় শ্রেণীর সাহাবীদের প্রকৃত মান আল্লাহর মানদণ্ডে কিরূপ, তা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর পুনরায় উভয় শ্রেণীকে উত্তম প্রতিদানের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

'সকলকেই আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' (আল হাদীদ, ১০)

কেননা, সকলেই সাধ্যমত সৎকাজে ব্রতী ছিলেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে মান মর্যাদার যতো ব্যবধানই থাক না কেন। আর যেহেতু তাদের মান সম্পর্কে এবং তাদের কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সংকল্প সক্রিয় ছিলো, তার সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অবহিত, তাই পরস্পরের মানগত পার্থক্য ও সবার জন্যে উত্তম প্রতিদানের বিষয়টি আল্লাহর গুণের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ع

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত।' (আল হাদীদ, ১০)

এ কথা দ্বারা মনকে সজাগ সচেতন করা হয়েছে এবং বাহ্যিক কার্যকলাপের পেছনে মনের যে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কেননা, এ উদ্দেশ্য তথা নিয়তের ওপরই কাজের মূল্য ও মান নির্ভরশীল এবং দাঁড়িপাল্লায় নিয়তই অগ্রগণ্য।

কঠোর সংগ্রামের প্রস্তুতি

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا

'(মনে রেখো,) অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী (ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী সদৃশ্য) কিছু রাখতে যাচ্ছি।' (সূরা আল মোযযাম্মেল, আয়াত ৫)

আলোচ্য আয়াতে যে গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান, সুগভীর ও মহান বাণীর কথা বলা হয়েছে, সেই বাণী কোরআন এবং কোরআন সংক্রান্ত অন্যান্য দায়দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও কোরআন তার আংগিক ও ভাষাগত কাঠামোর দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রাল, সহজবোধ্য এবং উচ্চারণে তা একেবারেই হালকা, কিন্তু সত্যের দাঁড়িপাল্লায় তা খুবই ভারী এবং মানুষের মন-মগযে প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়েও তা গুরুভার। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا لا

'অবশ্যই আমি (কোরআনের এ) আমানত (এক সময়) আসমানসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা সবাই একে বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো, এতে সন্দেহ নেই, সে (মানুষ) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ।' (সূরা আল আহযাব, আয়াত ৭২)

এ থেকে স্বভাবতই বুঝা যায়, যে হৃদয়ের ওপর আল্লাহ তায়ালা কোরআন নাযিল করেছেন, তা পর্বতের চেয়েও শক্ত ও মযবুত।

আল্লাহর এই জ্যোতির্ময় ওহী ও অদৃশ্য জগতের জ্ঞান অর্জন করা খুবই কঠিন, তাই এ কাজের যোগ্যতা অর্জনে দীর্ঘ প্রস্তুতি ও অনুশীলনের প্রয়োজন। মহাবিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাবলী ধারণ করাও খুবই কঠিন ব্যাপার এবং এ কাজও দীর্ঘ প্রস্তুতিসাপেক্ষ। আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের সাথে এবং সৃষ্টি জগতের জীব ও জড়ের প্রাণশক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনও কঠিন কাজ। আর এ কাজের জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি আবশ্যক। কোনো রকমের সংকোচ ও দোদুল্যমানতা ছাড়া এবং হাজারো রকমের বাধা বিঘ্ন ও প্রলোভন উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে, একাগ্রচিত্তে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং তা দীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব নয়।

সকল মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রাত জেগে নামায পড়া, নিত্যদিনের খুঁটিনাটি ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং তাঁর আলোকে আলোকিত হওয়া, আল্লাহর সাথে নিভৃতে ও নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া, সমগ্র প্রকৃতি যখন নিঝুম নিস্তব্ধ, তখন 'তারতীলের' সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা, যাতে মনে হয় কোরআন বুঝি এখনই ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল হচ্ছে এবং আশপাশের প্রকৃতিতে যেন তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে কোরআন অধ্যয়নের সুফলগুলো আহরণ করা, এ সব কাজই হচ্ছে আল্লাহর এই দুর্বহ ও গুরুগম্ভীর বাণী গ্রহণের প্রস্তুতি ও অনুশীলন।

এ প্রস্তুতি এবং কঠিন ও প্রাণান্তকর সাধনা প্রত্যেক নবীর এবং প্রত্যেক প্রজন্মের ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যেই অপরিহার্য। তাদের কঠিন সাধনার পথে চলার জন্যে এটা প্রয়োজনীয় মনোবল যোগায়, শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে তাদের রক্ষা করে এবং অন্ধকারে পথ হারানোর ঝুঁকি থেকে তাদের নিরাপত্তা দেয়।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيلًا ۝

'নিশ্চয়ই রাতের বিছানা ত্যাগ আত্মসংযমের জন্যে বেশী কার্যকর (পন্থা, তাছাড়া কোরআনের) যথার্থ পাঠেরও (এসময়) সুবিধা থাকে বেশী।' (আল মোযযাম্মেল, ৬)

'নাশেআতুল্লাইল' অর্থ হচ্ছে রাতের শেষাংশে জাগ্রত হওয়া। মোজাহেদের মতে, আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, রাত্রের এই অংশে ঘুম থেকে জেগে এবাদত করা শরীরের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর এবং অধিকতর স্থায়ী কল্যাণের নিশ্চয়তাদায়ক। কেননা সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ঘুমের প্রবল আহবান ও বিছানার দুর্নিবার আকর্ষণ

উপেক্ষা করে আল্লাহর এবাদাত করা নিসন্দেহে কঠোরতর দৈহিক সাধনা। শুধু তাই নয়, এটা আত্মার আধিপত্যের ঘোষণা, আল্লাহর আহবানে সাড়াদান এবং আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তার ত্যাগ স্বীকারের শামিল। এজন্যে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে, 'এটা (কোরআন) তেলাওয়াতের জন্যে অধিকতর উপযোগী সময়।'

কেননা গভীর রাতের যেকের বড়ই মযাদার, নামায খুবই একাগ্রতা সৃষ্টিকারী এবং মোনাজাত হৃদয়ে খুবই স্বচ্ছতা আনয়নকারী। গভীর রজনী মানুষের হৃদয়ে প্রেম, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য এনে দেয়। দিনের বেলার নামায বা যেকেরে তা নাও পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হৃদয়ের স্রষ্টা, তাই হৃদয়ের প্রবেশদ্বার ও তার সংযোগকাল তিনিই ভালো চেনেন, তিনিই ভালো জানেন হৃদয়ে কি প্রবেশ করে ও তার ওপর কোন জিনিসের কেমন প্রভাব হয়। কোন কোন সময়ে হৃদয় কিছু গ্রহণের জন্যে অধিকতর প্রস্তুত বা যোগ্য হয় এবং কোন জিনিস হৃদয়কে অধিকতর আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা মোহাম্মদ (স.)-কে এই গুরুভার বাণী গ্রহণের যোগ্য বানানোর উদ্দেশে এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় বিরাট কষ্টকর সাধনা ও সংগ্রামের উপযুক্ত বানানোর উদেশে তাঁর জন্যে রাত জেগে এবাদাত করার কর্মসূচী মনোনীত করেছেন। কেননা রাত জাগা এ ব্যাপারে অধিকতর উপকারী। তাছাড়া দিনের বেলায় যেহেতু তাঁর অনেক কাজ ও ব্যস্ততা রয়েছে এবং তাতে অনেক সময়, শ্রম ও মনোযোগ খাটাতে হয়, তাই এ কাজে রাতের এ অংশ বেছে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

'(কেননা) দিনের বেলায় তোমার থাকে প্রচুর কর্মব্যস্ততা।' (আল মোযযাম্মেল, ৭)

কাজেই দিনের সময় এসব তৎপরতায় ব্যয় করা আর রাত্রিকাল আল্লাহর জন্যে তথা নামায ও যেকেরের কাজে ব্যয় করা উচিত।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

'তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো।' (আল মোযযাম্মেল, ৮)

আল্লাহর যেকের কেবল একশ দানা বা হাজার দানা তাসবীহ গণনা করা, মুখে আল্লাহর নাম জপ করার নামই নয়। যেকের হচ্ছে সদা সচেতন হৃদয় দিয়ে স্মরণ করা এবং একই সাথে জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর নাম জপ করা বা কোরআন তেলাওয়াত করা। অথবা নামায় পড়া ও নামাযে কোরআন পড়া। আর 'তাবাত্তুল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং এবাদাত ও যেকের দ্বারা তাঁর

দিকে সর্বতোভাবে মনোযোগী হওয়া। যাবতীয় পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে সব আবেগ অনুভুতি নিয়ে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার (তাবাত্তুল) কথা উল্লেখের পর পরই জানানো হয়েছে যে, বাস্তবিকপক্ষেও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ এমন নেই, যার দিকে মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

'আল্লাহ তায়ালাই তো পূর্ব পশ্চিমের একক মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো।' (আল মোযযাম্মেল, ৯)

বস্তুত তিনি যখন পূর্ব ও পশ্চিম সর্বদিকের প্রভু, একক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ হলো, এ বিশ্ব জগতের একমাত্র সত্যের দিকে মনোনিবেশ করা, আর তার ওপর নির্ভর করার অর্থ বিশ্ব জগতের একমাত্র শক্তির ওপর নির্ভর করা।

বস্তুত একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসেরই প্রত্যক্ষ ও স্বতস্ফূর্ত ফল। তাঁর পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু হওয়ার অর্থ সমগ্র মহাবিশ্বের প্রভু হওয়া। রসূল (স.)-কে তাঁর দুর্বহ দায়িত্ব বহন করার জন্যে রাত্রি জাগরণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতে করে বুঝা যায়, শুরু থেকেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া। কেননা একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই তিনি এ ভারী দায়িত্ব বহন করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার শক্তি ও পাথেয় যোগাড় করতে পারেন।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে সর্বাত্মক ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জাতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত যে উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অপবাদ, অবরোধ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন তিনি হয়ে আসছেন, তার জন্যে সবরের উপদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে আরো বলেছেন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের যাতে আমি উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি সে জন্যে তাঁর ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াও, একটু সময় দাও, অপেক্ষা করো। কেননা আমার কাছে তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

'এ (নির্বোধ) লোকেরা (তোমার সম্পর্কে) যেসব কথাবার্তা বলে তাতে (কান না দিয়ে বরং) তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সম্মানজনকভাবে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে এসো।' (আল মোযযাম্মেল, ১০)

সূরার প্রথমাংশ নবুওতের সূচনাকালে নাযিল হয়েছে এ বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার এ আটটি আয়াত একটু বিলম্বে প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার পর্ব শুরু হওয়ার পর নাযিল হয়ে থাকতে পারে। এ পর্বে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, তার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং রসূল (স.) ও মোমেনদের ওপর যুলুম নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু অপর বর্ণনা শুদ্ধ হয়ে থাকলে সূরার প্রথম রুকুর পুরোটাই রসূল (স.) মোশরেকদের অত্যাচার ও বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার পর নাযিল হয়ে থাকবে।

যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাতের বেলা নামায ও যেকেরের আদেশ দেয়ার পরই সবরের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ দুটো কাজ প্রায়ই এক সাথে করতে নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, যাতে দাওয়াতের দীর্ঘ কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মনোবল বহাল থাকে। এ কষ্টকর পথের মাঝে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইসলামের পথ রোধকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই– এ উভয় লড়াই একাকার হয়ে গেছে। এ দুটোই কঠিন লড়াই। আর যেহেতু ধৈর্যের আদেশ অনেক সময় ক্রোধ ও আক্রোশ বৃদ্ধি করে, তাই তার পরেই আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পূর্ণ বর্জন করার। কেননা বর্জনে আর কোনো ক্রোধ ও আক্রোশ থাকে না। মক্কার প্রথম দিককার দাওয়াতের কর্মসূচী এভাবেই প্রণয়ন করা হয়েছিলো। সাধারণত কেবলমাত্র হৃদয় ও বিবেককেই আবেদন জানানো হতো এবং আবেদনটা হতো নিরেট উপদেশ ও পথনির্দেশনামূলক।

চরম ঔদ্ধত্য সহকারে দাওয়াতের বিরোধিতা ও রসূলকে মিথ্যাবাদী ঠাওরানোর মতো আচরণের পর পুরোপুরি বর্জন করা যেকেরের পর ধৈর্যেরও দাবী জানায়। ধৈর্যের উপদেশ আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল নবীকেই একাধিকাবার দিয়েছেন। সাধারণ মোমেনদেরও দিয়েছেন। বস্তুত ধৈর্য ছাড়া আর যাই করা যাক, দাওয়াতের কাজ করা যায় না। সবরই এ কাজের ঢাল ও অস্ত্র। ধৈর্যই এ কাজের পাথেয়। ধৈর্যই দাওয়াতী কাজের কর্মীর আশ্রয়স্থল।

ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে আসলে এক সর্বাত্মক জেহাদ। এখানে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হয়। প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা, অসৎ কামনা-বাসনা, বিপথগামিতা, অবাধ্যতা, হতাশা, দুর্বলতা ও একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। আবার দাওয়াতের শত্রুদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়। লড়াই করতে হয় তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাদের উপায় উপকরণের বিরুদ্ধে এবং তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে। আবার সাধারণ মানুষের সাথেও এক ধরনের লড়াই চলতে থাকে।

কেননা তারা এ দাওয়াতের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে চা য়না, তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। নানা রকমের ওযর আপত্তি তুলে তার বিরোধিতা করে, তারা কোনো অবস্থার ওপরই স্থিতিশীল থাকে না। দাওয়াতদাতার এ সব পরিস্থিতিতেই ধৈর্য ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আর যেকের প্রায় ক্ষেত্রেই ধৈর্যের সহযোগী ও সহায়ক। আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড হুমকি দিয়ে বলেন–

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

'সহায় সম্পদের অধিকারী এই মিথ্যাবাদীদের (সাথে ফয়সালার) ব্যাপারটা তুমি আমার ওপরই ছেড়ে দাও এবং কিছুদিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো,।' (আল মোযযাম্মেল, ১১)

ভাববার বিষয়, মহাশক্তিধর মহাপরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা এ হুমকি দিচ্ছেন ইসলামের শত্রুকে, যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। আর হুমকিদাতা হচ্ছেন তিনি, যিনি তাদের এবং এই প্রকান্ড বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাও শুধুমাত্র একটি 'কুন্' (হও) শব্দ দ্বারা, এর বেশী নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমাকে ছেড়ে দাও, ওদের আমিই দেখে নেবো। এ দাওয়াত তো আমারই দাওয়াত। তোমার তো এটা পৌছানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ওরা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছে এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে তো করতে দাও। ওদের তুমি ত্যাগ করো। ওদের কিভাবে জব্দ ও শায়েস্তা করতে হয়, তা আমি দেখবো। সে দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। তাদের চিন্তা তোমার করার দরকার নেই। তুমি শান্ত ও স্থির থাকো।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালা যখন এ সকল নগণ্য ও দুর্বল সৃষ্টিকে হুমকি দেন, তাদের শায়েস্তা করার চরমপত্র দেন, তখন বুঝতে হবে, তাদের মহাদুর্যোগ ও সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। তারা যতো বড়ো বিত্তশালী ও প্রতাপশালীই হোক না কেন, তাদের রক্ষা করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই। বলা হয়েছে, 'তাদের সামান্য সময় দাও।'

গোটা পার্থিব জীবন পরিমাণ সময়ও যদি তাদের দেয়া হয়, তাও সামান্য। কারণ দুনিয়ার জীবন আল্লাহর হিসাবে একদিন বা তারও কম সময়ের সমান। এমনকি কেয়ামতের দিন খোদ মানুষের কাছেও দুনিয়ার জীবনকে এক ঘন্টার মতো মনে হবে। আর তারা যদি পৃথিবীর গোটা জীবনেও কোনো শাস্তি বা প্রতিশোধের সম্মুখীন না হয়, তবে পরবর্তী জীবনে কঠোরতর শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত। এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۙ

' নিশ্চয়ই আমার কাছে এ পাপীদের (পাকড়াও করার) জন্যে শেকল আছে, আছে (আযাব দেয়ার জন্যে) জ্বলন্ত আগুন!' (আল মোযযাম্মেল, ১২)

বস্তুত যারা বিপুল সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েও সেই সম্পদের কদর করেনি, শোকর করেনি, এ সব কষ্টদায়ক আযাবই তাদের জন্যে উপযুক্ত। অতএব, হে মোহাম্মদ! তুমি সবর করো, ধৈর্য ধারণ করো। এদের উপযুক্ত শাস্তি আমার কাছে রয়েছে। তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে, কয়েদখানায় আবদ্ধ হবে, গলায় কাঁটা ফুটে যাওয়া খাদ্য গ্রহণ করবে এবং নানা রকম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

মানুষের সঠিক মূল্যায়ন

যে ঘটনার কারণে সূরা 'আবাসা' নাযিল হয়েছিলো তা অবশ্যই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব যতোই বুঝা যাক না কেন, তার থেকেও অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে ঘটনাটি। এ উপদেশ নিশ্চিত একটি মোজেযা। এ উপদেশবাণী এবং এগুলোর মাধ্যমে যে আসল সত্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আর এগুলো দ্বারা তিনি সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, তা সম্ভবত ইসলামের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা, কিন্তু একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রত্যক্ষ মন্তব্যের মাধ্যমে এ উপদেশগুলো দেয়া হয়েছে। কোরআনে আল্লাহর পেশকৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এটা এক বিশেষ প্রক্রিয়া। এ ঘটনার মাধ্যমে ইসলামের এক মৌলিক এবং স্থায়ী নীতি তুলে ধরা হয়েছে।

সত্য বলতে কি, যে মূলনীতিটি এখানে পেশ করা হয়েছে এবং সমাজজীবনে তার যে প্রতিফলন ঘটে তাই হচ্ছে বাস্তব ইসলাম। জীবনের এ বাস্তব দিকটি সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে যতোগুলো আসমানী কেতাব এসেছে, সবগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো এটিই এবং এ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই ছিলো সেগুলোর মূল কাজ। যদিও আজ সেগুলো মূল অবস্থায় না থাকার কারণে বাস্তব জীবন সম্পর্কিত কথা সেখানে তেমন বেশী কিছু পাওয়া যায় না।

এ সত্য আজ অবিমিশ্র নেই। সংমিশ্রণ-দুষ্ট হওয়ায় বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়েছে এবং বিষয়টি আজ এ কারণে খুব সহজ সরলও নেই। প্রশ্ন হলো, এসব ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি একটি জনপদ বা এক জনগোষ্ঠীর সাথে কিভাবে ব্যবহার করা হবে। এ ঘটনার ভিত্তিতে কোরআনের যে মন্তব্য আমাদের সামনে আছে তা-ই হচ্ছে সূরাটির মূল তাৎপর্য, যা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এটাই সূরার তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী আলোচ্য বিষয়। মানুষ কিভাবে জীবনের সকল বিষয়কে মূল্যায়ন করে, সে সম্পর্কে এখানে বিশদ আলোচনা এসেছে। আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কোত্থেকে মানুষ তাদের আসল মূল্যবোধ লাভ করে এবং এ মূল্যায়নের মাপকাঠিই বা কী? সূরাটির শুরুতে আল্লাহর যে নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানানো, মানুষ যেন পৃথিবীর জীবনে তার যাবতীয় কাজ ও ব্যবহার আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে পরিমাপ করে।

এ নির্দেশগুলো তো সরাসরি আসমান থেকে নাযিল হয়েছে যার মধ্যে পার্থিব কোনো জিনিসের বা কোনো জায়গার স্থানীয় প্রভাব এবং স্বার্থ বিজড়িত নেই, কোনো

সংকীর্ণ গন্ডি বা কারো কোনো সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণার দখলও সেখানে নেই। এ নির্দেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই কঠোর। নিজ মান সম্ভ্রম, মূল্যবোধ ও জীবন যাপন করা অবশ্যই বড়ো কঠিন। এরপর মানবতার অবমাননা ও অবমূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম তার বক্তব্য নিয়ে হাযির হয়েছে। বলা হয়েছে–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

'অবশ্যই তোমাদের মধ্যে সে-ই সব থেকে বেশী সম্মানী যে আল্লাহর কাছে সব থেকে বেশী পরহেযগার।' (আল হুজুরাত, ১৩)

মানুষের জীবনে সাধারণভাবে যেসব জিনিস গুরুত্বপূর্ণ এবং যে মাপকাঠি দিয়ে মানুষ এবং মানুষের মান মর্যাদাকে মাপা হয়, সে বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চেতনার মধ্যে এক দায়িত্ববোধ কাজ করে। এটা পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই সেই ধ্যান ধারণার ওপর কঠিন আঘাত হেনে এ বস্তুবাদী মূল্যবোধ বদলে দেয়া হচ্ছে এবং তাতে নতুন চেতনা সংযোজন করা হচ্ছে। এটা সরাসরি আকাশ থেকে তাদের জানানো হচ্ছে। মহান আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় মর্যাদার একমাত্র মান হিসেবে এ তাকওয়া-পরহেযগারীই একমাত্র স্বীকৃত।

এরপর অবস্থার প্রেক্ষিতে জীবনের সঠিক মূল্যবোধকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্যে তাতে ওই তীব্র সতর্কবাণী আসছে। আসছে মূল্যায়নের মানদন্ড, এখানে অন্য কোনো মূল্য নেই। একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহর নিক্তিতে যার মূল্য আছে তাই হচ্ছে আসল মূল্য। মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য হচ্ছে, মানুষ দুনিয়াবী দৃষ্টিতে যে জিনিসটাকে মূল্যবান বলে গণ্য করে, তা প্রত্যাখ্যান করা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানুষের মান মর্যাদা সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে, যে সকল জিনিস দিয়ে মানুষের মর্যাদা পরিমাপ করা হয় এবং স্বীকৃতি দেয়া হয়, মহান আল্লাহর কাছে তার এক কানাকড়ি মূল্যও নেই। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মর্যাদা যেভাবে দিচ্ছেন সেটাই হচ্ছে প্রকৃত মর্যাদা।

একবার তাকিয়ে দেখুন দৃশ্যের দিকে। আসছে সেই দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তিটি। কে সে? ইবনে উম্মে মাকতুম। আসছে কার কাছে? স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে। দৃশ্যটি ছিলো এমন, রসূলুল্লাহ (স.) কোরায়শদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথায় ব্যস্ত। ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের সাথে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কথা বলছেন আল্লাহর রসূল (স.)। বড় আশা তাঁর মনে, তারা ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কায় ইসলামের যে দুর্দিন চলছে, যে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা তাঁর ও মুসলমানদের করতে হচ্ছে তার অবসান ঘটবে।

ওই দলটিই তাদের ধন-সম্পদ, সামাজিক দাপট ও শক্তি-ক্ষমতা নিয়ে তাঁর পথের কাঁটা হয়ে রয়েছে। প্রবল বাধা সৃষ্টি করে তারা জনগণকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে রেখেছে। এভাবে তারা এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিলো, যাতে করে

শেষ পর্যন্ত মক্কায় ইসলামের প্রসার থেমে যায় এবং কেউ প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে না পারে। মক্কার বাইরেও যাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে না পারে তার জন্যে এসব ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সতর্ক করে দিয়েছিলো। এ জন্যে তারা সর্বপ্রথম তাদের গোত্রীয় সংহতিকে কাজে লাগিয়েছে। কারণ আরবে গোত্রীয় বন্ধন ছিলো খুবই মযবুত। ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক, স্বগোত্রীয় হলেই যে কোনো মূল্যে এবং সর্বাবস্থায় তাকে সমর্থন দিতে হবে– এটা ছিলো তৎকালীন জাহেলিয়াতের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য।

এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তিটির আগমন ঘটছে, আর তিনি ওই দলটিকে কিভাবে দ্বীনের পথে আনা যায় যায় সে ব্যাপারে আলোচনায় ব্যস্ত। এ উদ্যোগ ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে নয়, নয় কেনো ব্যক্তিগত উপকারের জন্যে, কেবলাত্র ইসলামের জন্যে এবং ইসলামের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির খাতিরেই এ প্রচেষ্টা। একমাত্র এ অনুভূতিই তাঁর মধ্যে কাজ করছিলো যে, ওরা ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কায় বিরাজমান ইসলামের কঠিন বিরোধিতা ও ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর যে নির্যাতন চলছিলো তা বন্ধ হয়ে যাবে। মক্কার বাইরে আশপাশে যে সকল গোত্র আছে তাদের অপতৎপরতাও এদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে থেমে যেতে বাধ্য হবে। এমনই এক কঠিন মুহূর্তে এ ব্যক্তিটি এসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যে কী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছেন এটা তার মোটেই অজানা নয়।

এমতাবস্থায় মাঝপথে তাঁর কথা কেটে দেয়া ও তাঁর কথার গুরুত্ব হালকা করে দেয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর খারাপ লেগেছে এবং খারাপ লাগাটা তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠেছে, যা ওই অন্ধ ব্যক্তিটি দেখতে পায়নি, কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখ বেজার হয়ে গেছে এবং তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ওই দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তি থেকে, যে এমন এক জরুরী বিষয়ে আলোচনার ধারাটা কেটে দিয়েছে, যে আলোচনার মাধ্যমে তিনি আশা করেছিলেন যে, মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকেরা দ্বীন গ্রহণ করবে ও ইসলামের সাহায্যে হাত বাড়াবে। এখানে তাঁর বেজার হওয়াটা দাওয়াতী কাজে তাঁর একনিষ্ঠতার পরিচয়ই বহন করছিলো। তাদের সাথে আলোচনায় এই যে মহব্বত ও আন্তরিকতা, সে তো ইসলামের জন্যেই। তাঁর উৎকণ্ঠা ও একাগ্রতা একমাত্র ইসলামের প্রসারের জন্যেই।

তারপরও মহানবী (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে তিরস্কার করছেন। যাকে কোরআনে পাকের অন্য স্থানে মহান চরিত্রের অধিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাঁর নিকটতম বন্ধু বলা হয়েছে। তাঁকে এভাবে ধমক দেয়ার কারণ হচ্ছে, যে বিষয়ে তাঁর ব্যবহারকে আপত্তিকর বলা হয়েছে, সে বিষয়টি দ্বীন ইসলামের ওই

মৌলিক জিনিসগুলোর অন্যতম, যেগুলোর ওপর ইসলামের গোটা প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। যে ভাষায় কোরআনের মধ্যে এ তিরস্কার এসেছে, তাও এমন এক স্বতন্ত্র ভাষা, যা মানুষের তৈরী কোনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো না। সাধারণভাবে লেখ্য ভাষায়, তা যে কোনো ভাষারই হোক, তার নিজস্ব একটি পদ্ধতি, একটি প্রকাশভংগি থাকে, যাতে কোনো না কোনো ব্যক্তি বা জাতির বাকরীতির অনুকরণ দেখা যায়। এ ধরনের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করলে কোরআনে বর্ণিত এ বিশেষ প্রকাশভংগির সাবলীলতা এবং হৃদয়ের ওপর তার প্রভাব বিস্তারকারী ভাবগাম্ভীর্য মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে। কতো মর্মস্পর্শীভাবে ছোট ছোট বাক্যাংশের মাধ্যমে কথাগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে–

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۙ – اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ؕ

'সে (নবী) ভ্রূকুঞ্চিত করলো, (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, কারণ, তার সামনে অন্ধ ব্যক্তিটি এসে হাযির হলো!' (আবাসা, ১-২)

কথাটি এমনই অসন্তোষজনক ও অপ্রিয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও পরম বন্ধুকে সরাসরি ওই কঠিন কথা বলা পছন্দ করেননি; বরং নামপুরুষ বা তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে বলা পদ্ধতিতে বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এতে একদিকে যেমন ওই ব্যবহারের প্রতি ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সরাসরি সম্বোধন করে তিরস্কার করার কারণে যে বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারতো, সেটাও এড়ানো সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে নবী করীম (স.)-এর মর্যাদা, তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও সম্মান ওই অপ্রিয় কথাটি উল্লেখ করার কারণে কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ন হয়নি।

এভাবে যে ব্যবহার কঠিন তিরস্কার ও অসন্তোষ ছিলো তা প্রকাশ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এ জন্যে পরক্ষণে সরাসরি অত্যন্ত হালকাভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ۙ – اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ؕ

'তুমি কি জানতে– হয়তো সে-ই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতো, (কিংবা) সে এটা স্মরণ করতো, তা তার জন্যে হয়তো উপকারীও (প্রমাণিত) হতো।' (আবাসা, ৩-৪)

তোমার কি জানা আছে, যখন এ মহাকল্যাণ সংঘটিত হবে তখন হয় তো সে অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তিটিই পবিত্রতা অর্জন করবে। আগ্রহ নিয়ে এ অন্ধ ব্যক্তিটি তোমার কাছে কিছু কল্যাণ লাভের আশায় এবং তার অন্তরকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশে ছুটে এসেছে। যার ফলে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং সে শিক্ষা তার কাজ লাগবে। তুমি জানো, এ হৃদয়টি, দরিদ্র বেচারার অন্তরটি আল্লাহর নূরের আলোকে আলোকিত হয়ে যাবে এবং ঊর্ধ্বলোকের নূরের সাথে সংযোগলাভে ধন্য হবে। হেদায়াত কবুল করার জন্যে যে অন্তর এভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তাকে দেখে আরও বহু অন্তর

হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হয়। এ আন্তরিক মহব্বত ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনাই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যা আল্লাহর পাল্লায় ভীষণ ভারী হয়ে ওঠে।

পরবর্তী কথায় তিরস্কার আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আরও কঠোর হয়ে আসছে কথার সুর। সে সুরে তিরস্কার কিছুটা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়েছে। বলা হচ্ছে–

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ فَأَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۭ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ۭ وَأَمَّا مَنْ جَاۤءَكَ يَسْعٰى ۙ وَهُوَ يَخْشٰى ۙ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ

'(অপরদিকে) যে (হেদায়াতের প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখালো, তুমি তার প্রতিই (বেশী) মনোযোগ প্রদান করলে! (অথচ) তোমার ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, তুমি তাকে পরিচ্ছন্ন করে দেবে; যে ব্যক্তিটি (পরিশুদ্ধির জন্যে) তোমার কাছে দৌড়ে আসলো, যে ব্যক্তিটি আল্লাহকে ভয় করলো, তুমি তার থেকেই বিরক্ত হলে!' (আবাসা, ৫-১০)

অর্থাৎ তোমার থেকে, তোমার দেখানো জীবন পথ থেকে, তোমার কাছে হেদায়াত ও কল্যাণের যে ব্যবস্থা আছে, যে সত্যের আলো ও পবিত্রতা আছে, তা থেকে যে হঠকারী ব্যক্তিরা মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং দুনিয়ার লোভ লালসায় মজে থাকা যেসব মানুষ সত্যের প্রতি উদাসীন ভাব প্রকাশ করলো, তাদের জন্যেই তুমি ব্যস্ত হয়ে ওই গরীব বেচারার প্রতি উদাসীনতা দেখালে! তোমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে রইলো দুনিয়াপাগল লোকদের জন্যে? তোমার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা জারি রইলো কেবল তাদের হেদায়াত করার জন্যে?

তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে ওই অন্ধ ব্যক্তিটি থেকে, তাও আবার এমন লোকদের জন্যে, যারা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তোমার কি আসে যায় যদি তারা পবিত্র না-ই হয়? তারা যদি পাপ পংকিলতায় ডুবে থাকে, যদি জীবনভরে অপবিত্র থাকে, তাতে তোমার ক্ষতি কী? তোমাকে তো তাদের অপরাধের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, বা তোমার কাছে তাদের ব্যাপারে কোনো কৈফিয়তও তলব করা হবে না। তারা দ্বীন গ্রহণ করলে তুমি যে কোনো বাড়তি সাহায্য পাবে এমনও তো নয়। কেয়ামতের দিন তাদের মোকদ্দমা নিয়ে তুমি আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তাও তো নয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি আগ্রহভরে তোমার কাছে ছুটে এলো, এলো স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে। যে ব্যক্তি মনে প্রাণে অন্যায়-অপবিত্রতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে, তুমি তার থেকেই গাফেল হয়ে গেলে! যে ব্যক্তি সঠিক পথপ্রাপ্তির উদ্দেশে এসেছে, তার প্রতি উদাসীনতা দেখানোর কারণেই ঘটনাটি এখানে সাংঘাতিকভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

এরপর আরও তীব্র হচ্ছে তিরস্কারের সুর। এমনকি শেষ পর্যন্ত চরম ধমকের সুরে বলা হয়েছে, তুমি কি ভেবেছো, ওই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারণে ইসলামের ইযযত বাড়বে, তাই না? না, কিছুতেই তা হবে না। এভাবে সম্বোধন করে এ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝার জন্যে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তারপর এ দাওয়াতের মূল তাৎপর্য, এর মূল্যমান এবং এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে, ইসলাম কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নয়, এ এক মহান দাওয়াত। কেউ সমর্থন করুক আর না করুক, ইসলাম আপসহীনভাবে নিজ পথে চলবে। যে ইসলাম গ্রহণ করবে একমাত্র তার জন্যেই ইসলাম চিন্তা ভাবনার পথ খুলে রাখবে। যে এর স্বাদ গ্রহণ করতে চাইবে একমাত্র সে-ই এর উপকারলাভে ধন্য হবে– সমাজে তার মর্যাদা বা গুরুত্ব যাই-ই হোক না কেন। এরশাদ হচ্ছে–

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ج فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۘ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ
بِأَيْدِىْ سَفَرَةٍ ۙ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ؕ

'কখনোই (এমনটি উচিত) নয়! (কোরআন) হচ্ছে একটি উপদেশ, যে চাইবে সে-ই এটিকে স্মরণ করবে। যা সম্মানিত পুস্তকসমূহে (সংরক্ষিত) আছে, উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র এটি সংরক্ষিত থাকে মর্যাদাবান লোকদের হাতে।' (আবাসা, ১১-১৬)

মর্যাদাবান এ কেতাব সকল বিবেচনায় নির্ভুল, এর পাতাগুলো পবিত্র এবং সম্মানিত। এ মহান কেতাব সেই নিবেদিতপ্রাণ নেতৃস্থানীয় বার্তাবাহক ফেরেশতাদের মাধ্যমে রসূলদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে, পৌঁছানো হয়েছে নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। এ কারণে সেই রসূলরাও সম্মানিত। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে সঠিক পথের খোঁজে যারা হাতড়ে মরেছে, তাদের কাছেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো প্রয়োজন, যেন তারা এর থেকে জীবনের অমানিশায় সঠিক পথের সন্ধান পায়। সুতরাং এর থেকে সে–ই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে, যে এর মর্যাদা বুঝবে এবং এর মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ করতে চাইবে।

এটিই আসল মানদণ্ড, এটা আল্লাহর নিজস্ব পরিমাপ যন্ত্র। এ পাল্লা দ্বারা সকল কাজ ও ব্যবহারের মূল্যায়ন করা যায় এবং সমস্ত মানুষকে এ দিয়ে পরীক্ষা করা যায়। এ কথাই এখানে আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং এ মাপকাঠিতেই সব রকমের পরিবেশ পরিস্থিতিতে যে কোনো জিনিস বিচার বিশ্লেষণ করা যায়।

এখন প্রশ্ন আসে, কোথায় এবং কখন এ ঘটনা ঘটেছিলো? ঘটনাস্থল ছিলো মক্কা নগরী। যেখানে ইসলামের দাওয়াত সকল দিক থেকে বাধা বিপত্তি, প্রতিরোধ ও

ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছিলো। মুসলমানদের অবস্থা ছিলো অতি করুণ। সংখ্যায় তারা ছিলো নগণ্য। এ সময়ে মক্কার গোত্রপতিদের একটি দলকে খাতির করা এবং তাদের মন জয় করার চেষ্টা করাটা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে ছিলো না। একটু গভীরভাবে ভাবলে এটা বুঝা যায়, ওই দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তির প্রতি সাময়িক অমনোযোগিতাও কোনো স্বার্থের কারণে ছিলো না।

কোনো ব্যক্তি বিশেষকে অবহেলা বা অবজ্ঞার যা-ই এখানে ঘটেছে, তা ছিলো একমাত্র দাওয়াতী কাজের প্রচার প্রসারের উদ্দেশে। এ মুল্যবোধের ভিত্তিতেই মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পরিমাপ করেন, তার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা কতোটুকু আছে বা আদৌ আছে কি না তা পরখ করেন। এ মূল্যবোধকে জীবনের কোনো পর্যায়ে বা কোনো অবস্থাতে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। কারণ এর ওপরই ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা এবং মানবমন্ডলীর জন্যে ইসলামের কল্যাণকামিতা নির্ভর করছে। এ মূল্যবোধের ওপরই এর মর্যাদা, এর শক্তি এবং সকল দিক ও বিভাগ থেকে এর প্রতি সমর্থন এবং বাস্তব সাহায্য নির্ভর করে।

সমাপ্ত

أكاديمية القرآن لندن

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

Al Quran Academy London